৬ ২৮

(প্রথম সংস্করণ নেই)

- প্রথম সংস্করণের Photocopy-তে ২০-২৮ পৃষ্ঠা নেই
- ১৬০০০-এর কাছের সংস্করণটি brittle হয়ে আছে

কবিতা

নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা   আশ্বিন ১৩৫০   এই সংখ্যা আট আনা

পত্রগুচ্ছ—রবীন্দ্রনাথ

কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
প্রতিমা ঠাকুর
গিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়
প্রমোদ মুখোপাধ্যায়
মুকুলচন্দ্র চক্রবর্তী
দিলীপ দাশগুপ্ত
সুকান্ত ভট্টাচার্য
বিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কমল বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ সরকার
প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
পরিতোষ ধর

গোবিন্দ চক্রবর্তী
সুরেশচন্দ্র সরকার
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
অশোকবিজয় রাহা
মণীন্দ্র রায়
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য
নরেশ গুহ
সুধীরকুমার চৌধুরী
বিমলচন্দ্র ঘোষ
প্রতিভা বসু
হরপ্রসাদ মিত্র
অমল ঘোষ
বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু

আলোচনা

রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নরেশ গুহ

সমালোচনা

সমর সেন, জ্যোতির্ময় রায়

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু

কলিকাতা   কবিতাভবন

[illegible]

গোবিন্দ চক্রবর্তীর
কবিতার [illegible] নেই (৫০-৫১)
এই কবিতাটি নেওয়া হবে
অশোক মিত্রের 'কবিতা' থেকে
কবিতা [illegible] বইতে

দোকান রবিবার বন্ধ থাকে এবং অন্যান্য দিন সকাল স্ট্যাণ্ডার্ড আটটা হইতে রাত্রি আটটা ও বৃহস্পতিবার বেলা ২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ কলকাতা, কবিতা ভবন থেকে বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক প্রকাশিত,
ও ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, কলকাতা থেকে
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

কবিতা

নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৫০ ক্রমিক সংখ্যা ৩৮

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ও বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত]

১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে গেল চিঠি লেখার পরে আজ Time and Tide কাগজে সার নর্মান এঞ্জেলের লেখা প্রবন্ধ থেকে দুই এক জায়গা তর্জমা করে দিই।

গত সপ্তাহে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স বলেছেন, যে-সকল দেশ উপলব্ধি করেছে তাদের রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্য আজ বিপদগ্রস্ত তাদের স্বাধীনতারক্ষার জন্য আমরা যে প্রস্তুত এ আমরা কাজে ও কথায় সুস্পষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমরা পোলাণ্ডের পক্ষ নিতে প্রতিশ্রুত। অন্যের স্বাধীনতা রক্ষার সমর্থন যদি না করি তাহলে মূলেই স্বাতন্ত্র্যনীতিকে বঞ্চনা করা হয় এবং সেই সঙ্গেই বঞ্চিত হয় নিজেদের স্বাধীনতা।

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের এই উক্তিকে সাধুবাদ দিয়ে সার নর্মান বলচেন, এই স্বাতন্ত্র্যনীতি যেমন আক্রান্ত হয়েছে পোলাণ্ডে তেমনি হয়েছিল মাঞ্চুরিয়া, এবিসীনিয়া, চীন, স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়ায়। কিন্তু এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ব্রিটেন অত্যাচারিতকে রক্ষা করার দায়িত্ব কাজে ও কথায় অস্বীকার করেছে।

সার নর্মানের সমস্ত আলোচনাটা পড়ে দেখো। এর থেকে দেখা যাবে ইংরেজের বড়ো এবং ছোটোর মধ্যে উঁচু নিচুতে কত তফাৎ। এই ছোটো যখন বড়ো আসনে ব'সে দেশকে চালিত করে তখন শুধু যে দেশের গৌরব নষ্ট হয় তা নয়, দেশের প্রকৃত স্বার্থেও আঘাত লাগে।

সার নর্মানের লেখার একটা জায়গা পড়ে শঙ্কিত হলুম। তিনি বলচেন এমন কথা এদিকে ওদিকে একটু আধটু শোনা যাচ্ছে যে,

যেহেতু জাপান জর্মানি সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়েছে, আমাদের উচিত এখনি জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে চীনকে ঠেলে দেওয়া। যদি এমন কাজ করি তাহলে তো আমরা মরেছি। তিনি বলচেন, Now to sacrifice China to Japan would be to revert to appeasement in its most evil form. And we are in danger of doing it from sheer moral obtuseness.

আমরা এই কথা বলি, জাপান সম্বন্ধে নিরাপদ মৈত্রীস্থাপনার ইচ্ছা যদি ইংলণ্ডের কোনো সম্প্রদায়ের মনে জাগে তাহলে বুঝব দুর্বল হয়ে গেছে ইংলণ্ডের আত্মসম্মানবোধ। ইতি ২৮।১।৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan"

Santiniketan, Bengal

অমিয়,

তোমার ঘুম কবিতাটি খুব ভাল লাগল। কেবল প্রশ্ন মনে জাগে যখন অনাদি সৃষ্টির ঘোলা ঘুম ভাঙবে, তখন থাকবে কী—প্রলয় কি শুভ্র শূন্যতা—ভালোমন্দহারা নিঃশব্দ একটা অনন্ত না, যার কোথাও কোনো জবাবদিহি নেই। সুস্বপ্ন দুঃস্বপ্নের নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন নিয়ে মহা নিদ্রা—তারা আশা দেখায়, কিন্তু কতক্ষণের জন্যে?—যুগে যুগে নিঃশেষ পালা শেষ করে মিলিয়ে যাচ্ছে চিরসত্যের মুখোষপরা ক্ষণিকের নাট্য লীলা—কত গেল তলিয়ে এই ঘুমের তলায়, তাদের নাম জানিনে ধাম জানিনে—অথচ অমরতার ফাঁকি উপাধি ছড়াছড়ি যাচ্ছে লোকালয়ে লোকালয়ে, ইতিহাসের পাতায় পাতায়, যে পাতা কীট কাটচে নিমেষে নিমেষে। কেউ বা মানুষ খুন করা অমর, কেউ বা ছড়া বানানো অমর—কোনো রূপসী মুগ্ধ মনের বিহ্বলতার অমরী, অকূল ঘুমের তরঙ্গদোলায় দুলতে দুলতে জাগচেন মহাকবি ভাসমান ফেনাগুলোর দিকে তাকিয়ে।

তোমাকে বর্তমানের নিষ্ঠুর অট্টহাস্য নিয়ে আরো লেখবার ইচ্ছে ছিল। হয়তো লিখব—আমার গল্পটা নিয়ে ব্যস্ত আছি। ইতি ৬।১০।৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম। সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলি। এখন আমরা যাকে সামান্য বলি মানুষের মধ্যে চিরকালই তা আছে। এখন তাকে জীবনের অন্য অঙ্গ থেকে আমরা পৃথক করে বিশেষ নাম দিয়ে বিশেষভাবে তার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি। তার কারণ, বর্তমান কালে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ নিজের কাজে খাটাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে; এতে করে তার খুবই সুবিধা হচ্ছে। তাই আজকাল এই সুবিধার চর্চাটা মানুষের অন্য সমস্ত প্রয়াসের তুলনায় বড় হয়ে উঠল। কিন্তু মানুষ যখনি হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভেঙেছে, লোহার শলা দিয়ে মাটি খুঁড়েচে, তাঁত বসিয়ে কাপড় বুনেছে, তখনি সে সুবিধা-ঘটাবার বুদ্ধিকে জাগিয়েছে। তাতে সে জয়ী হয়েছে। কিন্তু কখনো সে আপন হাতিয়ারকে নিয়ে গান গায় নি। তলোয়ার নিয়ে গেয়েছে, হাতিয়ার বলে নয়, তাতে বধ করবার সুবিধা হয় বলে নয়—তার সঙ্গে বীরত্ব প্রকাশের প্রসঙ্গ আছে বলে'। এই বীরত্ব প্রকাশটার একটা চরম মূল্য আছে, কোনো একটা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়মাত্র বলে' নয়। এর থেকে বুঝতে হবে, মানুষের চেষ্টা যেখানে চরমকে, ultimate-কে স্পর্শ করেছে, সেইখানেই তার গান জেগেছে। একটা সুন্দর ঘট ব্যবহারযোগ্যতার মূল্যে মূল্যবান নয়, সে অমূল্য বলেই মূল্যবান, সে সুষমার গৌরবে প্রয়োজনের দরদস্তরকে পেরিয়ে গেছে। এইজন্যে Grecian urn-এর উপর কবিতা লেখা চলেছে কিন্তু Grecian হাতুড়ির উপর চলে নি। Efficiency যতই বিস্ময়জনক হোক কোনোদিন মানুষের মনে সুর জাগায় নি; implements মানুষকে সম্পদশালী করেছে কিন্তু inspire

করে নি। যেখানে কোনো উৎকর্ষ, perfection, আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত, অর্থাৎ যেখানে সে অসীমে পৌঁছিয়েছে সেইখানেই সে মানুষকে কবি করেছে, রূপকার করেছে। প্রেয়সীর হাতের কাছে মানুষ সম্পূর্ণ হার মান্‌তে রাজি কিন্তু কারিগরের হাতিয়ারের কাছে নয়। আজকালকার দিনে সুবিধার বিশ্বজোড়া হাটে মানুষ বড় বড় হাতিয়ার সব তৈরি করচে, প্লেটোর আমলে এস্কিলসের আমলে তা ছিল না, সেই অভাববশত মনুষ্যত্ব কিছুমাত্র খাটো ছিল না। বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারের যোগে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বড় ও সংখ্যায় বহুল হয়েছে, অর্থাৎ মানুষ হয়েচে giant, কিন্তু স্বয়ং মানুষ তাতে বড় হয়নি। মানুষের personality-র মহত্ত্বর চেয়ে তার সাংসারিক সুবিধা সাধনের সুযোগ বড় নয়। এই জন্যেই কলকারখানা নিয়ে কোনো আধুনিক দান্তে Vita Nuova লিখ্‌চে না—কারণ ওতে নূতন থাকতে পারে কিন্তু Vita নেই। মানুষ যেদিন প্রথম আগুন জ্বালিয়েছিল সেদিন স্তবগান করেছিল; আগুনে তার রান্নার সুবিধে হয়েছিল বলে নয়, আগুনের নিজের মধ্যেই একটি চরম রহস্য আছে বলে। মানুষের কুড়ালের মধ্যে কোদালের মধ্যে সেই চরম রহস্য নেই। বিজ্ঞান যেখানে পরমাণুর পরমতত্ত্বের সামনে আমাদের বিস্মিত মনকে দাঁড় করায় সেখানে চরমকে দেখি—আমি সেই চরমের বন্দনা করেছি। কিন্তু বাষ্পের যোগে যেখানে রেলগাড়ি চলে, সেখানে clever-কে দেখি perfect-কে দেখিনে, সেখানে Vulcan-কে দেখি Apollo-কে দেখিনে। সেখানে কারখানাঘরে প্রবেশ করি, সৃষ্টির রহস্যমন্দিরে নয়। সেখানে কুশ্রীতার লজ্জা নেই, সেখানে অসম্পূর্ণতা নগ্ন। সেখানে মাংসপেশী ফুলে উঠেছে কিন্তু লাবণ্য কোথায়? সেখানে স্থূলকে দেখি অনির্ব্বচনীয়কে দেখিনে ত। তাই বাহবা দিই, কিন্তু সে বাহবায় ছন্দ আসে না। আজকের কালের বিরাট কারখানা-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জগৎসুদ্ধ লোক ভয়ে বিস্ময়ে লোভে সমস্বরে বাহবা দিল, কিন্তু জানু নত হল না, প্রণাম করলে না কেননা এ তো মন্দির নয়। পুরাতন দেবমন্দির মানুষ ভেঙে দিচ্চে, কিন্তু নূতন দেবমন্দির এখনো তো গড়া হ'ল না, তাই বলেই কি পূজার অর্ঘ্য নিয়ে যেতে হবে তার হাটের আড়ৎঘরে? ইতি ২৮ মার্চ্চ ১৯২৫

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা
আশ্বিন, ১৩৫০

২২

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

এ মেলে তোমার আর একখানি চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। বোধ হয় শুনে থাকবে আমরা দলবল নিয়ে সিংহল যাচ্চি। অর্থসংগ্রহের এই পন্থা অত্যন্ত ক্লান্তিকর, সব সময়ে সন্তোষজনক হয় না। কিন্তু অনুশীলনের দিক থেকে এর মূল্য আছে। সিংহলবাসীরা উৎসুক হয়ে আছে তারা আর্টের এমন একটা আদর্শ পাবে, যেটা তাদের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নতুন পথ করে দেবে। বোম্বাইয়ে আমরা কিছু অর্থ পেয়েছিলুম কিন্তু উপকার করেছি তার চেয়ে বেশি। এই কাজটাকে বোধ হয় বিশ্বভারতীর একটা প্রধান কাজের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। আজকালকার দিনে সবচেয়ে তারস্বর পলিটিক্সের; তার কাছে যখন আমাদের গান নিয়ে নাচ নিয়ে দাঁড়াই তখন সভাসুদ্ধ লোক অবজ্ঞা করে আমাদের তাড়িয়ে যে দেয় না এইটেতে বুঝতে পারি বধিরের কানেও মন্ত্র প্রবেশ করে। আজকাল বাংলা দেশ থেকে নাচ গানের ও ছবির ঢেউ সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়চে এর প্রথম প্রবর্তনা এইখান থেকেই, সে কথা স্বীকার করতে হবে। হৈমন্তী নাচে বিশেষ একটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেচে। ওর মধ্যে সত্যিকার আর্টিস্ট আছে সে জেগে উঠেচে—এই নিয়ে সে খুব আনন্দ পেয়েছে। আমরা চেষ্টা করব ওকে এই পথে যথাসম্ভব এগিয়ে দিতে।

••• আজকাল আমার নীরব হবার সময় এসেছে। এখন আমার গোধূলির কাল। এখন আমার দূরকালের স্মৃতিপটে নানা রং ভেসে উঠ্‌চে, কিন্তু গানের সময় শেষ হয়ে এলো। যে সব কথা বলবার ছিল তাদের অজস্র বলতে পেরেচি জীবনের বসন্তকালে প্রথম উপলব্ধির আনন্দে—প্রজাপতি যেমন ডানা নিয়ে গুটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে চিত্তভাবও তেমনি আপন নানা বর্ণ বিচিত্র ভাষা সঙ্গে নিয়েই প্রকাশ পেয়েছিল। আজ নূতন প্রসারিত সেই সহজচঞ্চল ভাষা নেই—নিজের পুরোনো লেখা—অন্তত ইংরেজি লেখা—সম্পূর্ণ অন্য জন্মের বলে বোধ হয়, এখন আর সে আপন ইন্দ্রজাল নিয়ে ধরা দেয় না। অতএব আজ আমার হয়ে বলবার ভার তোমাদেরই পরে, তোমাদের কণ্ঠস্বরে বাধা নেই, ব'লে তাই আনন্দ পাবে—

আমার হাতে যা এতদিনে ম্লান হয়ে গেছে তোমার হাতে আবার তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ইতি ২৯ এপ্রেল ১৯৩৪

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

প্রখর রৌদ্র, শরীর মন ক্লান্ত। কিছুদিন হোলো Aldous Huxley-র নতুন বইখানি প'ড়ে মন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল—আধুনিক যুগের চিত্তবিকৃতির ব্যঙ্গ মানুষের পূজার ঘরে যেরকম কুৎসিত উৎসাহের সঙ্গে কালাপাহাড়ি আরম্ভ করেছিল তাতে ঘৃণা ধরিয়ে দিয়েছিল, ঐ বইটিতে নিত্যকালের হাওয়ায় মানুষের শাশ্বত সাধনার বাণীর স্পর্শ পাওয়া গেল।

আমার জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুত গতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হোলো। একদিকে কী অমানুষিক স্পর্দ্ধা, আর একদিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা। মনুষ্যত্বের দোহাই দেবার কোনো বড়ো আদালত কোথাও দেখতে পাই নে। জগৎ জোড়া গুন্ডার তাড়নায় একপক্ষে অভ্রভেদী স্পর্দ্ধা অন্যপক্ষে ভূলুণ্ঠিত সেলাম—কী অসহ্য কুশ্রী। ধ্বংসমহাসাগরের মুখের এই ভাঁটার টান একদিন হয়তো থমকে যাবে একদিন হয়তো উল্টো স্রোতের জোয়ার কল্লোলিত হয়ে উঠবে—সেই শুভ লক্ষণ দেখে যেতে পারবো কিনা কে জানে। আমাদের কালের প্রথম যুগে যে সমস্ত শ্রদ্ধার দান অযাচিত দাক্ষিণ্যে আমাদের দ্বারে এসেছিল, আজকের দিন অট্টহাস্যে তাদের নামিয়ে ধূলোয় গুঁড়িয়ে দিয়ে চলেচে, সেই সঙ্গে তাদের নিত্যতার সম্বন্ধে মানুষের এতকালের বিশ্বাস একটা শ্বাসরোধকর আঁধির মধ্যে উড়িয়ে দিয়ে গেল। এর নিষ্ঠুর পরিণাম আজ তো দেখচ পৃথিবীর তিন মহাদেশে—এই বিশ্বব্যাপী আশঙ্কার মধ্যে আমরা আছি ক্লীব নিষ্ক্রিয়ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে—এমন অপমান আর কিছু হতে পারে না—মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মবৎসরে। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ

বৃষ্টি

অমিয় চক্রবর্তী

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি নামে।
শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার।
লুটায় পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী;
আকাশে বিদ্যুৎজলা বর্শা হানে
ইন্দ্রমেঘ;
কালো দিন গলির রাস্তায়।
কেঁদেও পাবে না তাকে অজস্র বর্ষার জলধারে।

নিবিষ্ট ক্লান্তির স্বর ঝরঝর বুকে
অবারিত।
চকিত গলির প্রান্তে লাল আভা দুরন্ত সিঁদুরে
পরায় মুহূর্ত টীপ,
নিভে যায় চোখে;
দুলায়ে নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল বোবা রেখা।
বিরামস্তম্ভিত লগ্ন ভেঙে
আবার ঘনায় জল।
বলে নাম, বলে নাম, অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া
খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।
মত্ত দিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম ঝঙ্কার
অবিরত,
সেই সৃষ্টিক্ষণ
স্রোতঃস্বনা
মৃত্তিকার সত্তা স্মৃতিহীনা
প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায়,
এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে।
ভেসে মুছে ধুয়ে ঢাকা সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টিলোক।
কী বিহ্বল মাটি গাছ, দাঁড়ানো মানুষ দরজায়
গুহার আঁধারে চিত্র, ঝড়ে উতরোল
বারে-বারে পাওয়া, হাওয়া, হারানো নিরন্ত ফিরে ফিরে
ঘনমেঘলীন
কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে॥

চক্রকরোটি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সায়াহ্নের স্তব্ধতায় আমি রিক্ত, উদ্দাম তবুও।
মনে মনে কথা বলি : ব্যর্থতার, গৌরবের গান।
অশরীরী ছায়া যত ভিড় করে জানায় বেদনা।
কৈশোরের স্মৃতি নিয়ে ভারগ্রস্ত। জয়-অপমান
কতবার কৃষ্ণ ক্ষত সর্ব-অঙ্গে এঁকে দিয়ে গেছে
বিষাক্ত ক্লেদাক্ত ছবি, চেতনায়-অবচেতনায়—
হে প্রদীপ্ত সূর্য তুমি এ-সন্ধ্যার সুবর্ণে উজ্জ্বল,
দিনের কবরে কিন্তু শুনি শুধু মৃত্যুর আহ্বান।

এখানে ফুটেছে ফুল গন্ধে বর্ণে রঙীন আলোতে
ঊর্ধ্বে আকাশ আছে নীল স্তব্ধ সমুদ্রের মতো
আমার কামনা দিয়ে আমিই কি রাঙাবো তাদের ?
সন্ধ্যার নদীর তীরে অন্ধকার আসন্ন, উদ্যত ;
শবভুক্ শৃগালেরা অট্টহেসে ঘুরে চলে গেল
ক্লান্ত পাখী নেবে এলো—অরণ্যের অন্ধকার নীড় ;
নিশ্চেতন হিমরাত, অস্থিসার স্বপ্ন এলোমেলো—
রাত্রির সন্ন্যাসী জাগে : হাতে পাত্র চক্রকরোটির।

তোমাকে চিনেছি আমি ; আজ নয়, আগামী কালের।
শতাব্দীর সিঁড়ি বেয়ে ধাপে-ধাপে এসেছো এখানে
সর্বাঙ্গে সহস্র ক্ষত, রক্তাক্ত স্বেদাক্ত দেহ, মুখে
স্মিত হাসি। সুন্দর নিষ্ঠুর তুমি, জন্মমৃত্যুঞ্জয়।

বর্ষণশেষে

প্রতিমা ঠাকুর

বর্ষণশেষে আকাশ ধূসর
তরল ধারার টলটলে আভা,
গড়িয়ে পড়ছে ধানি-রঙা গাছপালা ঢেকে,
ইন্দ্রধনুর পালে বাতাস মারছে মৃদু দোল।
সোনালী চুমুক্ নিঃশেষ করে
ঝিমিয়ে পড়ল শ্যামলী গ্রাম,
দিনান্তের অবকাশে প্রাণের আবেগ
উঠল মেতে—
ঝিরঝিরে হাওয়ার ইসারায়।
ঘন নীল ছায়াপটের কোলে
    ছুটে চলা দু'জোড়া চরণ
মেঘের কানা থেকে উপচে পড়া রোশনায়ে
চিকিয়ে ওঠে তাদের কালো দেহ।
    ঘরে ফেরার কাকলি ছিল স্বরে
    চোখের কোনে ছিল
    বাসনার অনাবৃত বাহু।
মেঘের ফেরির মতই ভাসিয়েছে ভরা পাল,
    জোনাকীর ফুলকী ওড়া বাতি ওরা—
        চলতি পথের যেন আলো।

বৃষ্টির উৎসব

রাখাল তালুকদার

ঘনমেঘ-ঘেরাটোপ আকাশ নিশ্চল।
বাতাস শ্বসিছে ক্ষুব্ধশ্বাস ;
কোন্ দূর নদীপারে ছায়াঘেরা বনে।
আজ শুধু বৃষ্টির উৎসব।
বাতাসে ভাসিছে ঘ্রাণ—
বৃষ্টিভেজা সুবাস মদির ;
সবুজ ওড়নাখানি ভিজে গেছে,
দেখা যায়,
বৃষ্টিধোয়া বনানীর বুক।
বাতাসে ভাসিছে ঘ্রাণ—
ছেড়ে দেওয়া চুলের সুবাস ;
সিক্ত অঙ্গ লাবণ্য উচ্ছল।
বৃষ্টির উৎসব দিনে আকাশ মেদুর,
সোঁদালি আঘ্রাণ
অফুরন্ত সবুজ বনের।
বাতাসে জেগেছে নিবিড়তা,
আদিগন্ত বনানীর দীপ্তিহীন স্নিগ্ধ কালোরূপ।
অবশ বিবশ বেলা,
তবু কই অবসর ?
বৃষ্টির উৎসবে আজ
কোনো গান গাওয়া হয় নাই।
বৃষ্টির উৎসবে মনে পড়ে :
সে তো আসে নাই।

বনবাস

গিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়

আজো যেন মাঝে মাঝে শুনি কোলাহল
কৈশোরের তীর হতে। যে-দিবসগুলি
পশ্চাতে চলিয়া গেছে আকাশ আকুলি'
মিছিলে, নিশানে, রঙে তাহাদের দল
আজো যেন ডাক দেয় যে পথে এখন
গম্ভীর দিবসগুলি চলে যায় ধীরে
বাঁকাচোরা ঢালু পথে পাঁকের গভীরে,
যে-পথে নিঃশ্বাস বন্ধ, অন্ধ দু'নয়ন।

তখন পৃথিবী ছিল প্রবালের দ্বীপ,
দিন ছিল গন্ধমোতি, রাত ছিল নীলা,
স্বপন যে ফুলঝুরি ; দুরাশার মেলা
স্ফটিকের ঝাড়ে ঝাড়ে সাত-রঙা দীপ।
সে সব হয়েছে শেষ, ফিরিবে না আর,
যায় সে যুবক আজ, বনে বাস তার।

দুই তীর

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

এখনো রয়েছে হেথা দিনান্তের স্তব্ধ ব্যাকুলতা
ঝরে পড়া চম্পকের সকরুণ অন্তিম নিশ্বাসে,
ওপারের আনন্দের কোলাহলে এপারের কথা
ডুবে গেছে। বিষণ্ণতা জেগে আছে শিশিরার্দ্র ঘাসে।
সেথায় নামিল বুঝি গাছেদের শিরায় শিরায়
একটি সৌখীন প্রাত সমস্ত সম্পদ লয়ে সাথে,
চৈতালির ক্লান্ত রাতে আমাদের পাত্র রিক্ত হায়
চঞ্চল মোহময়ী সেথা বিলাসের লীলা-পদ্ম হাতে।

হতাশ হোয়ো না, বন্ধু, হৃদয়ের শ্লথ বীণাতারে,
লাগিবে পাবের ঢেউ, আরবার জাগিবে মূর্ছনা,
ফিরে পাওয়া জীবনের একটানা নব অভিসারে
ফুলে ফুলে রূপায়িত বনানীর বিস্মৃতি বাসনা।
এপারে আমরা বাঁচি জোয়ারের দিন গুণে গুণে
ওপারে নিশ্চিন্ত বেলা সোনালী স্বপন যায় বুনে।

পরিচয়

মুকুলচন্দ্র চক্রবর্তী

হিমানী রাত্রির সাথে আজ মোর হ'ল পরিচয় ;
আজ বুঝি ব্যর্থ হয় আমাদের আজন্ম সঞ্চয়,
আজ বুঝি ব্যর্থ হয় আমাদের অমৃত সন্ধান—
ঝিল্লীবিদ্ধ নীল পক্ষে বলাকার সৌর অভিযান।
স্তিমিত মুহূর্তে শুনি মানুষের মৃত্যু-অঙ্গীকার,
পিঙ্গল শঙ্কায় রুদ্ধ জীবনের আকাশ-বিহার ;
নীল পদ্মবনে আজ মস্তকরী করে বিচরণ ;
বৃথা প্রজাপতি-মন সুন্দরের করে অন্বেষণ।

মানুষের অপমান, অমৃতের অধিকারে ঘৃণা
এ উদ্ধত অহংকার বিদ্রোহী যৌবন সহিবে না ;
শুনেছে সে উন্মুখর উন্মাদের উন্মাদনা-গান,
ঈশানের পুঞ্জমেঘ দিল তারে পথের সন্ধান ;
পিঞ্জরিত বিহঙ্গের চোখে জ্বলে সুদূরের তারা,
জানি আজ জয়ী হবে আকাশের দুর্মর ইশারা।

জন্মান্তর

দিলীপ দাশগুপ্ত

চলো সেইখানে।
যেখানে খ্যাতনাম্নী হয়নি তোমাদের চটুলতা
মদির হয়নি বাতাস, আর ঘ্রাণে
আসে না রেঁস্তোরার রুচিবিলাস।
আসামের প্রান্তরে শীতের কুয়াশায়
তুষার জমল যে শোণিতে
এস, সেখানে নীড় বাঁধি।
এস, জন্মান্তরের সূত্ররেখায়, বর্ণে আর গন্ধে
উজ্জয়িনীর বর্ণবিলাসিনীদের চোখের রঙে
তির্যকরেখা বিস্তার করি।
দেখছো না ম্লান আকাশে অশ্বখুরচিহ্নের দায়ভাগ ;
সেখানেই আমার আর তোমার আত্মার যোগাযোগ।

অবৈধ

সুকান্ত ভট্টাচার্য

আজ মনে হয় বসন্ত আমার জীবনে এসেছিলো।
উত্তর মহাসাগরের কূলে,
আমার স্বপ্নের ফুলে
তা'রা কথা কয়েছিল
অস্পষ্ট পুরোনো ভাষায়।

অস্ফুট স্বপ্নের ফুল
অসহ্য সূর্যের তাপে
অনিবার্য ঝরেছিল,
মরেছিলো নিষ্ঠুর প্রগল্‌ভ হতাশায়।

শব্দ থামে নাকো তার, নিস্তরঙ্গ কৌতুক-প্রবাহ ;
সময়ের কৃষ্ণ-স্রোত—নির্মোহ স্তব্ধতা রোধিয়াছে,
জানি না অন্তরে মোর কোন স্বপ্ন আছে
নগ্ন কামনা-পরিবাহ,
ভাসায়ে আমারে নেয়—চির-অজ্ঞাত বিস্ময়ের কাছে।

জন্মান্তর

রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একমাত্র লৌহদ্বার আবদ্ধ ঘরের, খুলে গিয়েছিলো :
ঘুম থেকে জেগে-ওঠা পাখি এক, ডানা দিয়ে জড়ালো আকাশ :
প্রদীপ জ্বলে না তবু, যেন কার পদধূলি শিখাহীন আলো :
কোরক বৃন্তে-ডালি—তাই ঘিরে ছয় ঋতু, ঘোরে বারো মাস···
আকাশের নীল মেশে পাখির পাখায়···অতল পেয়েছে নিম্ন তল···
রজনী উতল।

এক সূর্য কেন্দ্র করে ঘোরে বুঝি অনেক ভুবন :
প্রিজ্‌মের কাচ দিয়ে আলো আসে, সাত রঙ ধরা পড়ে যায় :
ঢেউ-কথা এলোমেলো···একই ইচ্ছা কক্ষ ক'রে ঘোরে দুটি মন :
বাধা পাওয়া অনুভূতি···ভাষা তাই মুক্তা ছড়ায় :
অনেক মুকুতা চাই···ডুবুরিরা ডুবে গেল···আলোড়নে দোলে নীল জল
রজনী উতল।

আকাশের যত নীল জড়ালো যে পাখির ডানায় :
প্রদীপ জ্বলে না তবু যেন কার পদধ্বনি শিখাহীন আলো :
ডুবুরির বাধা পড়ে মুক্তা খোঁজায় :
নিমীলিত চোখে কার, অপলক চোখ দিয়ে কে যেন তাকালো।
মুহূর্ত শতাব্দী হবে—তবু চোখে পরিবে না পল,
রজনী উতল।

চক্রে

রবীন্দ্রনাথ সরকার

পল্লীর দিগন্তে এসে হানা দিলো দুর্ভিক্ষ করাল :

এখন বসন্ত হেথা ; যাযাবর মানস-মরাল
ফাল্গুনের নিস্তরঙ্গ শীর্ণ গাঙে উড়ে এসে পড়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে,
তাদের ঝংকারে রাত্রি গুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে জমাট শবের ফাঁকে-ফাঁকে ;
গ্রামের আকাশে তবু গৃধিনী ও শকুনিরা ; তৃপ্ত কাক করে কলরব,
শ্মশানে জীবিত প্রেত ফেলে রেখে চ'লে যায় অদগ্ধ ও অর্দ্ধদগ্ধ শব।

কোথায় বেধেছে যুদ্ধ—খাদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি ? পৃথিবীর খাদ্যের ভাঁড়ারে
কারা চাবি দিয়ে দিলো ? কিংবা ক্লান্ত রিক্ত মাটি সুকৃপণ হারে
শস্য দেয়, তাই যুদ্ধ ? এখানে তো স্নিগ্ধ শ্যাম ঘাসে
চষা ক্ষেতে বন্যা এলো। আগাছাতে সবুজের স্বপ্ন ছেয়ে আসে।
বীজ ধান হাবাতের খোরাকিতে শেষ। ধান ষোলো টাকা মন—
মিথ্যা হ'লো মাটির উর্বর অঙ্গীকার। কোথা বীজ—কে করে বপন ?

কেন কান্না ? করুণ ক্রন্দনে বায়ু ভারাক্রান্ত ক'রে কোন ফল ?
যাহারা এনেছে যুদ্ধ ওরাই তো যুগে যুগে মানুষেরে পরায় শৃঙ্খল।
কার যুদ্ধ ? তোমাদের ! ইংরেজ, জর্মান, রাশিয়ান,
ভারতীয়—মিথ্যা ভেদ। পৃথিবীর মাটির সন্তান,
তুমি বুঝি রক্তহীন অনাহারে ? তবু অবশিষ্ট বিন্দুগুলি
মুক্তি-প্রতিজ্ঞায় ঢালো, যাক ভিজে পৃথিবীর ধূলি।

শস্যের ভাঁড়ার ফেলো কেটে ;
জনতায় জনে-জনে পুঁজি শস্য লও সব বেঁটে :
লাঙলের ফাল ভাঙো—কাল চাষ—আজ ওটা হোক হাতিয়ার,
উত্তমর্ণ জীবনের সুকঠিন দাবী মেনে আপনারে কর না স্বীকার ?

হঠাৎ চমকে ওঠে হাওয়া
সেদিন আর নেই—
নেই আর সূর্য-বিকীরণ :
আমার জীবনে তাই ব্যর্থ হ'লো বাসন্তী-বরণ।
শুনিনি স্বপ্নের ডাক :
থেকেছি আশ্চর্য নির্বাক—
বিন্যস্ত করেছি প্রাণ বুভুক্ষার হাতে।

সহসা একদিন
আমার দরজায় নেমে এ'লো
নিঃশব্দে উড়ন্ত পৃথিবীরা।
সেই দিন বসন্তের পাখী
নিঃসংগ একাকী
উড়ে গেলো, যেখানে দিগন্ত বনান্বিত।
আজ মনে হয়—
হেমন্তের পড়ন্ত রোদ্দুরে,
কী করে সম্ভব হ'লো
আমার রক্তকে ভালোবাসা।
সূর্যের কুয়াশা
এখনো কাটেনি,
ঘোচেনি অকাল দুর্ভাবনা,
মুহূর্তের সোনা
এখনো সভয়ে ক্ষয় হয়—
এরই মধ্যে হেমন্তের পড়ন্ত রোদ্দুর
কঠিন কাস্তেতে দেয় সুর ;
অন্যমনে এ কী দুর্ঘটনা—
হেমন্তেই বসন্তের প্রস্তাব রটনা।

গোধূলি

বিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিলাসী শরৎ। রূপালি আলোর সজ্জলতা
গোধূলিতে লীন। শিশিরসিক্ত পর্ণবন ?
অস্তরবির রঙিন ছটায় সন্ধ্যামায়া।
উর্মিল নীল নভে কি হৃদয়-উন্মীলন ?
তাই কি নীলিমনয়ন ছড়াল স্বপনছায়া ?
কৃষ্ণসারিকা মদিরহাওয়ায় স্বপ্নাহতা।

স্বপ্নশৈলে ফুটেছে রজনীগন্ধা শত ?
হৃদয়ে রঙিন কোন অলকার মিনার কায়া ?
তাই কি চেয়েছ স্বচ্ছহাসির-আমন্ত্রণ ?
যদিচ শারদ শিশির শুকাবে, সিক্ত হাওয়া ;
উত্তরে মেঘ ছড়াবে একদা শ্বেত চরণ।

স্বর্ণ মারীচ। মায়ারণ জানি শরাহত।

তথাপি মানস বলাকামুখর এ মরলোকে।
নীলনভপটে মেঘচিত্রিত আলিম্পন।
শার গোধূলির কী ছায়া ভ্রমরকৃষ্ণ চোখে ?
সঞ্জীবনীর মন্ত্রে হৃদয় উজ্জীবন ?

আমি চাই

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

কামনার বিলাসিতা কী যে মোর জানি নাকো আমি ;—
উত্তপ্ত গ্রীষ্মের রাত্রি, অন্ধকারে নীরব নিরন্ত ;
বহু-কণ্ঠ ব্যঞ্জনায় মুখরিত সামুদ্রিক বায়ু ;
নিষ্পেষিত জীবনের ক্ষীয়মাণ স্বল্প পরমায়ু ;
নব-কিশলয় সমাগত
চৈত্র শেষে ঝরা-পত্র দলে ;
মৌন মূক বনস্থলী।
আমি চাই,—কী যে চাই জানে অন্তর্যামী।

ইতিহাস

প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শিশির, প্রাতা আর গাঁয়ের ঘনিষ্ঠতার ছাপ আমাকে ঘিরে,—
হে সহরবাসী বিশিষ্ট,—
তোমাদের ভিড়ে আমি কোথায় দাঁড়াই ?
তোমাদের ব্যাঙ্কে টাকা, চোখে ভ্রূকুটী,—
হে দিবাধামবাসী পৌরজন,
মহাকাল হয়েছে তোমার চারণ, আর ইতিহাস ;
আমার গাঁয়ের মৌসুমী ফুলের গন্ধ তোমার মস্‌লিন-স্বপ্ন ছিঁড়ে দেবে।
তাজমহলের কীর্ত্তিতে তোমার প্রতীক,
শতাব্দীর-ইতিহাস-মদির-করা হেলেন-ক্লিওপেট্রার প্রেমে
উচ্চ-মর্ম্মরিত তোমার স্বরূপ।
আজকের পৃথিবীর জনপদে সাগরে মানুষের মনে দেখি
প্রেতচ্ছায়ানির্মূল জলাভূমির ভারি শ্বাসের মতো সীমাহীন নিঃসহায়তা
সঞ্চারিত হয়েছে,—
রক্তাক্ত শিশিরের ধোঁয়ায় অনাগত কালের আচ্ছাদনী-রচনা দেখি,—
এও তোমারি কীর্ত্তি, এও তোমারি আচ্ছাদনী-রচনা-চেষ্টা ;
আজকের গোধূলিনিবিড় জগতের অপমান, মৃত্যু, ক্লান্তি-রসে তোমারি
জারক তৈরি হয়,
কাল প্রভাতে বহু-বিস্তীর্ণ কবরশালায় দাঁড়িয়ে নতুন সূর্য্যের সঙ্গে তুমি তা
পান করবে, আমি জানি।

—কিন্তু আমি কি জানি ? আমি কি জানি ?
হয়তো এর মধ্যে নতুন হাওয়া বইবে, নতুন হাওয়া জাগ্‌বে অনেক
মহাসাগর থেকে,—

হয়তো, হয়তো ;—
তোমার পালক-খচা সোনার শাল সেই বাতাসে ঝ'রে প'ড়ে যাবে,
তোমার পনিরে পোকা ঢুক্‌বে, চশ্‌মার পাওয়ার হঠাৎ নিভে যাবে,—
তোমার ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে কাউণ্টারে অনেক দূর থেকে হাতুড়ির ঘা
এসে লাগ্‌বে,—
তোমার সুধা তৈরি থাক্‌বে অসম্পূর্ণ,—যথেষ্ট রক্ত মিল্‌বে না,—
হয়তো, হয়তো ;—
মাটির মধ্যে এম্‌নি কি গুঞ্জন শুনি, পথ চলি যখন,—
মাটি হয়েছে বিদ্যুৎগর্ভ,—কী যেন শুনি, পথ চলি যখন,—
কোথায় যেন কিসের আয়োজন সম্পূর্ণ হ'য়ে এলো, এ-কথা যেন কে বল্‌লো,—
আমি পথ চলি আর শুনি।

শেষ দেখা

পরিতোষ ধর

তাকে দেখেছিলেম।
নির্ঝরিণীর চলোর্মিতে ক্রন্দসীর প্রতিচ্ছবি,
সূর্যকরোজ্জল প্রভাতে পাইনের স্নিগ্ধ হাওয়ায়
শিশিরে-ভেজা ঘাসের পরে তার পদলেখা ;—
সেদিন তাকে দেখেছিলেম—
প্রথম দেখা
শাড়ীতে তার ইন্দ্রধনুর খেলা,
সচকিত কনীনিকার সঞ্চালনে বিদ্যুতের স্ফুরণ,—
যৌবনের প্রাচুর্য প্রকটিত দেহের ভঙ্গিমায় ;
সেদিন তাকে দেখেছিলেম
কামনার চোখে।
কণ্ঠে তার দূরাগত কিঙ্কিণীর নিক্কণ,
মিষ্টি হাসির ঝিলিক তার চোখে—
গতিতে তার পলাতকা খঞ্জনীর চঞ্চলতা।
'স্প্রেড ঈগলে'র ধারে, শিলং পাহাড়ে,
সেই বুঝি প্রথম দেখা !

তারপরে দেখেছিলাম তাকে
পুরীর সমুদ্র-বেলায় ;—
দেখেছিলেম চোখে তার খণ্ডিতার দৃষ্টি
অঙ্গে নবোঢ়ার লাবণি,
অধরে বিষণ্ণ হাসি
সেদিন ব্যথা পেয়েছিলেম—ব্যথা দিয়েছিলেম—
সেই শেষ দেখা।

ঝাঁকতালীয়

সুরেশচন্দ্র সরকার

শীতের রাত। ঘাট থেকে ফিরছি ক'জন,
হিম-স্পর্শ পাথুরে গলিপথে অসাড় খালি পায়
গরম কম্বলের স্বপ্ন ছাখে ঘুম-কাতুরে ক্লান্ত মন।

তীক্ষ্ণ বাতাস শুক্‌নো ; বৃষ্টির ঋতু এখনো অনেক দূরে।
তবুও, বাঁয়ে, সুরকিপটিতে মোড় নিতে, খট্ খটে পোড়ো ইটখোলায়
আশ্চর্যরকম সরু সুরে হঠাৎ একটা ব্যাং উঠলো ডেকে।
সুনসান রাতদুপুরে শক্ত মাটির জঠর থেকে
ঐ করুণ ক্রিক্ ক্রিক্ ডাক এতো কাছে শোনালো
যে, মনে হ'লো
অকালে জাগা অবোধ প্রাণটি আমারি মাথার 'খুলির মধ্যে বসে' ডাকলো।

ছোটো ছোটো অপুষ্ট হাত-পা বুক-পেটের 'পরে কুঁকড়ে রাখা,—
পাটকিলে বোঝাই ছেঁড়া কানিতে ঢাকা,
শীতের স্বচ্ছ জলে, আমারি হাত থেকে,
একটু আগেই তো, অস্পষ্টতর হ'তে-হ'তে সে তলালো।
জরায়ুর অন্ধকারে তার অন্তিম ডাক কে শুনেছিলো
অমানবিক, অদ্ভুত কচি গলায় ?
মনে হ'লো,
তার সে নির্মনন অপুষ্ট কান্না এখনই ছাড়া পেলো
রাত্রির শূন্যতায়,
খরস্রোত গঙ্গার হা-হা হাওয়ায়,
এই ঘুমন্ত সুরকিপটির বিষণ্ণ ইঁটখোলায়।

কতোকাল

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পায়ে-চলা পথ ধ'রে কতোকাল চলে সৈনিকেরা·····

যৌবন-মেদুর নারী, কতোকাল আর কতোকাল
বোবা চোখে চেয়ে র'বে ? কতোকাল আর কতোকাল ?
দীঘির সবুজ জলে নেমে আসে দীঘল ছায়ারা,
বোবা চোখ নেমে আসে, নেমে আসে সূর্যের শোণিত,
তারপর মৃত্যু—সন্ধ্যা : সময়ের প্রেতের ইসারা।
বোবা নারী, কতোকাল ?

কতোকাল বস্তির শ্মশানে
ঈশ্বরের সৈনিকেরা দলে-দলে স্বপ্নের মতন
সঙিনে প্রণয় হানে, ঘরে-ঘরে নামায় মড়ক ?
নারী আর তাড়ি আর ঈশ্বরের ঈপ্সিত দূতেরা
বানায় স্বর্গের সিঁড়ি রাবণের আন্তরিকতায়
অন্তরীক্ষে, হে ঈশ্বর! তারো পরে অহিংস প্রণয়ী
বাড়ায় যন্ত্রের হাত—উপবাসী প্রেমের নিঃশ্বাস
হৃদয়ে প্রশ্বাস নেয় : নীল রং কাঁপে ধমনীতে।
হে সার্বজনীন নারী, বিদূষক পুরুষের কাছে
আর কতোকাল চাও ধন, মান, জীবন, যৌবন ?
নগরের অলিগলি পার হ'য়ে হৃদয়ের মোড়ে
কেন আর হাত পাতা ? শারীরিক কুবেরের দল
মেদবৃদ্ধি, রক্তচাপে, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আর
যেখানে অশ্রান্ত ভোগে—কেন তবু সেখানে তোমার,
অজন্তার অশ্লীল পটুতা ? রক্তহীন চোখে মুখে
প্রেম আর মৃত্যু আর কাঞ্চন-কৌলীন্য, কতোকাল ?
ক্রমে এই হাঁটা-পথে নেশাতুর হাজারো পায়ের
পদক্ষেপে মৃত্যু নামে ; অন্ধকার হামাগুড়ি দেয়।

৪ বোবা চোখ, তাড়ি আর সাবলীল কুবেরের দল
নীল, নীল ঢেউ তুলে অন্ধকারে হামাগুড়ি দেয়।
দীঘির সবুজ জলে ছায়া ফেলে বস্তি আর গ্রাম
নগরের মুখ চেয়ে অন্ধকারে হামাগুড়ি দেয়,
কতোকাল ?
কতোকাল এইসব মৃত সৈনিকেরা
সূর্যাস্ত দেখেছে আর সূর্যোদয় দেখেনি, ঈশ্বর ?

সমুদ্র-স্বপ্ন

অশোকবিজয় রাহা

হঠাৎ সমুদ্র থেকে লাফ দিয়ে ওঠে এক চাঁদ,
'কী আশ্চর্য্য ! দেখো দেখো !'
(সুজাতার দু'চোখে বিস্ময় !)
'এমন প্রকাণ্ড চাঁদ দেখেছ কখনো ?'
(সুজাতার দু'চোখের তারা
কী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে !)
'এমন প্রকাণ্ড চাঁদ ?—না তো !'
(হঠাৎ চাঁদের দিকে গলুই ফেরাই।)

সত্যিই সেদিন
সমুদ্রে চাঁদের স্বপ্ন, সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে চাঁদ,
চাঁদের চেয়েও বড়ো আরেক বিস্ময়
ছিল তা'র দু'টি চোখে
আমি তা' দেখেছি !
সেদিনের রূপালি জ্যোৎস্নায়
ছিপছিপ দাঁড় ফেলে-ফেলে
জলের ঝালর ছিঁড়ে-ছিঁড়ে
চ'লে গেছি বহু দূরে—সুজাতা জানেনি কিছু তার !

সুজাতার চোখে ছিল চাঁদ,
আমারো দু'চোখে ছিল আরো এক স্বপ্নজাল-ফাঁদ,
দু'জন দু'খানে বন্দী !
সে-সমুদ্র, সেই চাঁদ কত দূরে চ'লে গেছে আজ !
একবার গলুই ফেরাই,
নিরেট চাঁদের মুখে চাই,
কী ঠাণ্ডা পাথর চাঁদ ! বরফের মতো সাদা মুখ :
এ-চাঁদের মুখে চেয়ে সমুদ্র পাথর হ'য়ে গেছে !

দাঁড় হাতে চুপ ক'রে থাকি,
(সমুদ্র পাহাড়, চাঁদ স্থির হ'য়ে আছে
পাথরে খোদাই,
দেহের শিরায়
রক্তে ঝিঁঝিঁ ডাকে !)

হঠাৎ একটু দূরে ও-দিকের খাড়ির কিনারে
যেখানে সমুদ্র-জলে ডুবে আছে পাহাড়ের লেজ—
কা'রা হাসে ?
(কা'রা যেন আসে,)
ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয় কথা,
একটু পরেই
ডানা-মেলা সাদা হাঁস—ছুটে আসে ছোটো সে শাম্পান !

'দেখো দেখো, কী সুন্দর চাঁদ !
এমন প্রকাণ্ড চাঁদ দেখেছ কখনো ?'
তরল রূপালি কণ্ঠে সুর বাজে জলের মতন—
ডানা-মেলা সাদা হাঁস তীরবেগে উড়ে যায় দূরে !
দাঁড় হাতে চুপ করে থাকি
নিরেট চাঁদের মুখোমুখি
ঈশ্বরের মতো বোবা।

আশা

মণীন্দ্র রায়

(শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-কে)

দেখেছি চূড়ায়
দেহকে শীতল রেখে বিদগ্ধ অন্তর
সূর্য্যের সমগ্র তাপ উগ্রমনে মস্তিষ্কে ঘুরায়।
পাহাড়তলীতে রহে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীরা বর্ব্বর।
ভাষাহীন কণ্ঠ বুঝি পাথরে ঘুমায়।
ভাঙে না ক্ষণিকহাতে ব্যবধান দুস্তর, দুস্তর!
এ সমাধি-হাড় হতে যদি কোনোদিন
প্রেমের ঐশ্বর্য্যে শোধে ঋণ,
আমার গ্রামের পথে নামহারা রাখালের গানে
এ-জীবন বিচ্ছুরিত হবে নব আশার সম্মানে :
খনির বিবিধ স্তরে ক্রমান্ধ আঁধার
সেইদিন পাবে জানি পরিষ্কার আলোর আহার।
বিতৃষ্ণার গ্লানি ছেড়ে তাই
পাড়ভাঙা নদীতীরে ঘুরেছি একাই।
সায়াহ্নসমীরে দোলে শূন্যতরী ঢেউয়ের ভাষায় :
মাঝিহীন যাত্রীহীন আমন্ত্রিত খেয়া তার কী দেবে উত্তর ?
চেয়ে থাকি স্পন্দমান অজ্ঞাত আশায়।—
চূড়ার তুষারগলা প্লাবনে পাহাড়তলী করে যে উর্ব্বর,
হৃদয়ের অবরুদ্ধ সম্পদের খনি
ফিরে পায় আলোর ধমনী,
করে যে রাখাল তার বাঁশরীর সুর খুঁজে পায়,
এ-তরীর পারাপারে দুই তীর র'বে না দুস্তর।—
পল্লীর তুলসীমঞ্চে জ্বলে দীপ বুঝি সে আশায়॥

রজনীগন্ধা

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নাম দিলে আমার রজনীগন্ধা
তার অর্থ তুমি জান আর আমি জানি
আর জানেন অন্তর্য্যামী ভগবান।
(ভগবান আছেন নাকি ?)

বাগানে আমার কেয়ারী করে'
অনেক আশায় লাগালেম রজনীগন্ধা
তোমার আদরের ফুল রজনীগন্ধা।
ফুল ফোটে তার সময় হলেই
কিন্তু তোমার সময় আর হ'ল না।
বছরের পর বছর কাটে নিষ্ফল আশায়
ঘনিয়ে আসে জীবনের গোধূলি
হয়ত দেখা হবে না আর জীবনে
নয়ত দেখাতেই হবে চির বিরহের সূত্রপাত।
কত দূর হলো নিকট
কত বিরহের অবসান হ'ল মিলনে ;
কত দীপ জ্বল্‌ল দীপাধারে
ধূপের গন্ধে আচ্ছন্ন হ'ল তনু মন,
বিহ্বল রজনীর মোহে
সন্ধ্যাও হ'ল উৎসব-মুখরা,
কিন্তু দীপ নিভালে তুমি আচম্বিতে
সে দীপ আর জ্বল্‌ল না জীবনে
দশাহীন দীপে ছায়া পড়ে তোমার
তোমার বিলীয়মান মূর্ত্তির রূপশ্রী ;
নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার অন্ধকারে
আকাশে জ্বলে শুকতারা
তারি পাশে তোমার মুখখানি

সুন্দর মুখ আজ মলিন কেন ?
ও কি উৎসব-শেষের স্মৃতিছায়া ?
তবু কেমন করে ভুলে আছ তোমার
রজনীগন্ধারে ?

অশ্রু-সজল চোখের সামনে আমার
ধীরে ধীরে এগিয়ে আস তুমি
সেই তুমি—আমার একান্ত তুমি
নিতান্ত কাছে তুমি অচঞ্চলা,
হাত বাড়িয়ে নাগাল পাই না তোমার
দূরের বন্ধু সরে যাও তুমি দূরে,
ব্যগ্র বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনের বাইরে—
কবে তোমার সময় হবে বন্ধু ?
কবে খুলবে তোমার নাগপাশের বন্ধন,
রুদ্ধ গৃহের বাতায়ন খুলে
কবে তুমি ফিরে চাইবে তোমার
আঙিনায় ফোটা রজনীগন্ধার পানে ?
সে ত ফুটে আছে তোমার হাতের কাছে
আনমনে তুলে নেবে না তোমার অলকে ?
শুনবে না তার
একটি সন্ধ্যারও আকুল প্রার্থনা ?
কেন তবে নাম দিয়েছিলে তার
রজনীগন্ধা ?

সারনাথ

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

(দিনেশ দাস-কে)

সম্মুখে অনতিদূর
কোন এক ভাঙা স্তূপ—
কী জানি কেমন রূপ
টাঙায় যেতে-যেতে চিন্তা-স্রোত
সহসা ব্যাহত হল ;

বর্ষায় এলোমেলো
দূর এত কাছে এল
নির্বাক নিশ্চল ইট-পথ-ঘাট ;
কোথা ইতিহাস !
এক জোড়া রাজহাঁস
মনে পড়ে আজ
মনে হয় যেন চিরন্তন,—
স্তূপ থেকে সারনাথ স্তূপের ওপর।

স্বপ্ন-মৃগয়া

নরেশ গুহ

ভীরু মেয়ে, ভীরু মেয়ে—
তোমার সোনালি চুলের গুচ্ছে
লুকিয়েছিলেম
মৃদুকরুণার সুরভি স্বপন
কৈশোর প্রেম।
সাহারার পথে যেন রেলগাড়ি
চলে সারি সারি যাত্রীসময়,—
মনে ভেবে দেখ তোমার সে নয়
আমারো সে নয়।
এলো আর গেলো প্রভাতী শিশির
তন্দ্রায় ম্লান গভীর নিশির ;
হোল না তো পরিচয়—
মৃত্যুর মতো নিথর তব হৃদয়।
পদতলময় ঘাসের সবুজ,—গহ্বর নয়—
—সোনালি সময়—
তবু ভীরু মনে কী আঁধার ভয়
তবু আঁখিতারা ভয়তন্ময়,
স্তব্ধ নিষেধ তনু-মনময়
উত্তাল তব তনু-মনময়।

বিচারক

সুধীরকুমার চৌধুরী

আঁধার খুঁজে বেড়ায় ও যে জানি গো তাহা,
নিজের থেকে পালিয়ে ফিরে, বেচারি, আহা,
কোথায় যাবে, কোথায় গেলে নিজের চোখে
পড়িবে না সে, কে ব'লে দেবে সে-কথা ওকে!

নিজের মাঝে গোপন কে যে দণ্ডধারী
সে শুধু দেখে ভ্রূকুটি-ভরা নয়ন তারি,
পাছে কি শোনে, সে-ভয়ে থাকে দুকান পেতে,
চরণ ফেলে কত যে দ্বিধা-সংশয়েতে!

ত্রুটিরে কারো কখনো ক্ষমা করেনি সে যে,
সবারে সাজা ফিরেছে দিয়ে অমিত-তেজে,
সকল কথা সকলকারই তুলাতে মেপে
পাল্টা কথা বলেছে সে যে জীবন ব্যেপে।

পাওনা হতে বেশী সে কিছু দেয়নি কা'রে,
উপোস ক'রে দিয়েছে ফিরে যারে যা যারে,
নিজের যাহা পাওনা তাহা ফিরিয়ে নিতে
কাহারও প্রতি মমতা কভু ভাবেনি চিতে।

নিজের সাথে আজিকে বোঝাপড়ার পালা
হ'ল যে সুরু, তোমার গাঁথা বরণ-মালা
দোলাবে সে যে আপন বুকে সাধ্য কোথা?
বিচারি' শুধু দেখিছে নিজ অযোগ্যতা।

খুসি যে তুমি হও সে তব নিকটে গেলে
বোঝে সে তবু বাইরে ফেরে তোমারে ফেলে,
খুসির কণা নিজেরে দিতে বাধে যে কিসে,
কি-জানি নিজ পাওনা হতে পায় বেশী সে!

এ-যে গোলকধাঁধা, ইহার থেকে
বাহির ক'রে কেউ কি তারে নেবে না ডেকে?

বলিবে না কি প্রেমের খেলা জমে না যে রে।
নির্ব্বিচারে দিয়ে না দিলে, না নিলে কেড়ে?

প্রেমেতে দেনা-পাওনা কিছু তফাৎ না যে,
একের তাড়া অপরে বহে নিজের মাঝে।
দিয়েই পাওয়া যায় রে, দেওয়া হয় রে পেলে,
পাওনা-দেনা আপনা হতে সেথায় মেলে।

আঁধার খুঁজে বেড়ায় ও যে সত্য কথা,
বিদায় নিতে দেখেছে কত তৎপরতা?
ফিরায়ে তারে চাহ ত বসি' বিচারাসনে
প্রচার কর তোমার দাবী দৃঢ়-ভাষণে।

কবিত্বং দুর্লভং লোকে

বিমলচন্দ্র ঘোষ

কবিতা পরমশিল্প জীবনের শিখা,
অতিস্নিগ্ধ প্রজ্ঞার দেউল—
আত্মাই ঈশ্বর!
দুর্লভ মানবজন্ম হিরণ্ময় দীপ
এ সুন্দরী পৃথিবীতে।
হে বাঙ্ময় সৌন্দর্য্যদেবতা,
অতি লঘু রেখাঙ্কিত
অনবদ্য রূপায়িত
অতি-স্নিগ্ধ তুমি
ভোরের শিশির,
বিরহিণী কুমারীর নীরবিত অশ্রুফুলদলে—
অতীন্দ্রিয় সুরভি সঞ্চার
অলিপ্ত প্রশান্তি তুমি বিশ্বকামনার।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৫০

প্রাণরশ্মি আলিম্পনে
উদ্বোধনে উজ্জীবন
তন্ময় গম্ভীর শান্ত উচ্ছল চঞ্চল
জীবন্ময় জ্যোতির অঞ্চল ?
হে কবিতা হে সবিতা,
স্বাদশাত্মা সুন্দর ঈশ্বর
হে অদ্বৈত রূপসিন্ধু লাবণ্য-কল্লোল
মধুর্বায়ু মধুরাত্রা হে মধু-হিল্লোল,
আমায় তোমার কবি করো
কবি করো জন্ম জন্মান্তর !
মুখর নদীর জলে গাছের ছায়ায়
পতঙ্গের বিচিত্র পাখায়
চাঁদের রাকায়,
সরল উদার মুগ্ধ প্রেমিকের চোখে
রোমাঞ্চিত চেয়ে-থাকা প্রাণের আলোকে
স্থূলে সূক্ষ্মে সুরে-সুরে বুদ্বুদে বিদ্যুতে
ছন্দে ছন্দে প্রাণস্পন্দে
আমায় তোমার কবি করো।

হে কবিতা হে ঈশ্বর
বাঙ্ময় সুন্দর,
আমায় তোমার কবি করো।

উদ্বেলিত অসংযত অতলান্ত সমুদ্রের মত
এ-জীবন উত্তেজিত।
দুর্দম কালের ঘেরে
আসে পাশে ফেরে
মেরুদণ্ডী ভগ্নদূত কর্কশ চিৎকারে।
মৃৎমলিন পৃথিবীতে রক্তনদী বয়
কদাকার ভয়

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৫০

রূঢ়শব্দ ব্যোমযানে
সংস্কৃতির প্রশান্তির করে মুণ্ডপাত,
বর্ব্বরের জঘন্য করাত
সমানে দুধার কাটে
নিরীহের নির্জ্জীবের হৃদ্‌পিণ্ড ফাটে ;
আর্ত্তনাদে হাসে কাঁদে
উন্মাদ সভ্যতা
আকাশ ফাটায় উচ্চে ঘৃণ্য দাম্ভিকতা।

হে ঈশ্বর, হে কবিতা,
আমায় তোমার কবি করো—
কবি করো নির্ভীক দুর্জয় !
চক্ষু বুঝি অন্ধ হল নরকাগ্নি ধূমে
চিররাত্রি নামে বুঝি
পার্থিব জাগরণে ঘুমে ;
ছিন্নকণ্ঠ ভারতীর শোণিতাক্ত সুপর্ণ মরাল
হেয়তম আত্মঘাত বাসনা করাল
ক্রোধে দুঃখে উচ্ছ্বাসে উত্তাপে
আতঙ্কে বিদ্রূপে অভিশাপে
বিষণ্ণ করেছ এ-যৌবন
অলস বলিষ্ঠ বাহু বহ্নিরিক্ত মন।
হে কবিতা, হে দুর্জ্জয়
তবু মনে রেখো না সংশয়
আমার মৃত্যুকে আমি করি নাকো ভয়
দৈনন্দিন মৃত্যু দেখে দেখে
প্রলয় সহজ হয়ে এল
দুঃসময়ে শ্রেষ্ঠ বর প্রার্থনা কেবল
প্রতিভামণ্ডিত বীর্য্যে জাগুক পৌরুষ মহাবল।

বিষয়ে সা
কোনো কোনো

মৃত মুখ

প্রতিভা বসু

মধ্যরাতে, অন্ধকারে
হঠাৎ কি ঘুম ভেঙে গেলো?
মনে হ'লো বাতাসে ভূতের ঘ্রাণ,—
কারা অশরীরী
মশারির আশে-পাশে,
যেন ভেসে আসে
নিশিগন্ধা পরীদের শব্দহীন স্বর।

মনে হ'লো, কী-যে মনে হ'লো—
নীলাম্বরী শাড়ি পরা কত মৃত মেয়ে
যেন দেখিলাম।
যেন কার নাম
ডেকে ডেকে কেঁদে মরে লক্ষ্য-হারা হাওয়া,
কোন দূর শতাব্দীর প্রান্ত থেকে আজিকার [illegible] আকাশে
কার মৃত মুখশ্রীর স্মৃতিটুকু ফিরে যেন আসে বারে-বারে,
মধ্যরাতে, ঘুম-ভাঙা অন্ধকারে।

বিবর্ণ

হরপ্রসাদ মিত্র

কতো উজ্জ্বল প্রহর
কতো নিদ্রিত সমাধি
মাথার উপর দুর্বিনীত আকাশ
পায়ের নীচে দুঃসাহসী পথ।
জাগরণ হিংস্র হয়, তবু ঘুম কী ঘোর বধির।
শোণিতাক্ত তৃণাসনে বুদ্ধ, যীশু নিঃস্পন্দ স্থবির।
[illegible]

তারপর চক্রাবর্তে ঘোরে ফেরে
কতো ক্লান্ত স্মৃতি।
মৃত কিশোরীর মুখ,
হাসি-কান্না, ভীতি।
সনাতন দুর্বিপাকে, অভ্যস্ত আরামে
পুরানো জুতোর মতো দিন যায়
—স্বাস্থ্যে ও ব্যারামে।

অমল ঘোষ

সংসার সোনার খাঁচা
মরা-বাঁচা অদৃষ্টের গুণ
প্রাণ-বৃন্ত কালের টাইফুন।
অদৃষ্ট সোনালী তরী বোনে
মরুপ্রান্তরপারে ঝিকিমিকি মেঘের গহনে।
ঘুমে ঢুলে আসে চোখ;
অসংখ্য লোক,
কোথা থেকে সর্পিত গতি,
স্বপ্নের খণ্ডিত স্মৃতি।
তারপর
বেচাকেনা মন্থর,
হিম শিহর,
ঘুমায় সহর।
ভুলো-বুনো চাঁদ ওঠে
মেঘশিশি ঘিরে।
ঘুমায় আহত পাখী
আমি রই চেয়ে
রাতের বাদুড়।
ঝরন্ত নীল বনে ঝলমল স্বর্ণ পাকুড়।

মূল্যহীনা

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমারীর মনের মন্দির
স্তব্ধ সুগম্ভীর ;
অবরুদ্ধ দ্বার,
মায়াময় আলো-অন্ধকারে
নিদ্রামগ্ন রাজকন্যা-মন।
দেহের দেহলি 'পরে আল্পনা আঁকে
নবীন যৌবন।
কত ভক্ত মুগ্ধ আশা, ব্যর্থ পূজা-উপচার নিয়ে
এলো, ফিরে গেলো বার-বার।
রুদ্ধ দ্বার, তবু রুদ্ধ দ্বার।

তুমি এসেছিলে হে রাজকুমার কবে,
কোন প্রভাতের শঙ্খঘণ্টা রবে,
জন-সঙ্কুল মন-অরণ্য দ্রুতপদে হয়ে পার।
কেঁপেছে তোমার আঘাতে হৃদয়-দ্বার।
সন্ধানী তব তীক্ষ্ণ চোখের তলে
আমার দেহের রূপ কি উঠিলো জ্ব'লে
নয়নে স্বচ্ছ মনেরে মিলাতে বুঝি,
নিজেরে খুঁজিতে হে রাজকুমার! আমাকে পেলে কি খুঁজি?
তোমার মন্ত্রস্বরে
দেবতার গান ধ্বনিল আমার অচেতন অন্তরে।
তোমার মনের দর্পণ মাঝে আপনারে চিনি লয়ে
দেবীর মতন গৌরবে আমি মালা হাতে দেখি চেয়ে
মন্দিরে আজ আকাশের ছায়া; ভক্ত কোথাও নাই,
রাজার কুমার চ'লে গেছে ভেঙে দুয়ারের বাধাটাই।
কেন এসেছিলে, মন-জাগানিয়া! প্রেম কি কেবলি ছল?
শুধুই তোমার জ্ঞানের তৃষ্ণা, শুধু কি কৌতূহল?
এখন নিজেরে বিলায়ে দেব কি সংসারে ধূলি-মাঝে
তব অর্চনা বিহনে আমার মূল্য কোথায় আছে?

আশ্বিন

বুদ্ধদেব বসু

নিরন্নের হাহাকারে, ক্ষুধিতের দীর্ঘশ্বাসে, তীক্ষ্ণ আর্তস্বরে
কশাহত দিবা-রাত্রি ; রাজপথে অবারিত ধূলিশয্যা-পরে
মুমূর্ষু মাতার বক্ষে মৃত শিশু, নগরের জঘন্য জঞ্জাল!
করুণার অসহ্য উচ্ছ্বাস হেনে দলে-দলে জীবন্ত কঙ্কাল
কলঙ্কিত করে প্রতি মুহূর্তেরে, নিয়ে আসে বিদীর্ণ বাংলার
ইতিহাসরথচক্রপিষ্ট মূর্তি। . . .
এই সব শীর্ণ শুষ্ক হাড়,
আত্মঘাতী এই যে নিঃসীম ধৈর্য, এর পরে আরো দিতে হবে ?
কোথায় জমেছে পাপ রক্তলিপ্ত লুব্ধতার উন্মত্ত তাণ্ডবে—
যার কিছু নেই, তারি রিক্ততার শেষ শ্বেত রক্তবিন্দু দিয়ে
সেই ঋণ শুধিতে হবে কি ? বুভুক্ষার কারাগারে বন্দিনী এ
শ্যামস্বর্ণশস্যশীর্ষতরঙ্গিত গঙ্গাভূমি, বিশ্বের লজ্জা সে!—
তবু কি বিশ্বের দাবি তারি 'পরে ? আপনার সর্বশেষ সর্বনাশে
নরহন্তা সভ্যতার নরকের সিংহদ্বারে এঁটে দিলো খিল।
এরি মধ্যে এলে তুমি, হে আশ্বিন, শুচিস্মিত সোনালি-সুনীল।

কাঠখোদাই : শম্ভু সাহা

আলোচনা

সুহৃদ্বরেষু

'মিড-ভিক্‌টোরীয় যুগবতী (-র্ত্তী)' সম্বন্ধে আমার মত সবিনয়ে জানাচ্ছি।—যদি 'যুগ' এর অর্থ কাল বা আমল ধরা হয়, তবে 'যুগবর্ত্তী' ব্যাকরণসম্মত হলেও সহজে মানে করা যায় না, কিন্তু 'যুগবতী'র মানে স্পষ্ট। তথাপি মনে করি কবি ইচ্ছা ক'রেই 'যুগবতী' লিখেছেন। তিনি 'যুগ' শব্দটি নিয়ে শ্লেষ বা pun করেছেন। আপাত অর্থ—কাল, কিন্তু শ্লিষ্ট অর্থ—জোয়াল। দ্বিতীয় অর্থেই '-বতী' লাগিয়েছেন, 'মিড-ভিক্‌টোরীয় যুগবতী' = bearing mid-Victorian yoke।

'গোরু' সর্বলিঙ্গ, কিন্তু সাধারণত ষাঁড়কে গোরু বলে না, গাই আর বলদই গোরু। নপুংসক প্রাণীতে স্ত্রীত্ব আরোপ poetic license-এর বহির্ভূত নয়। ক্লীববেশধারী অর্জুনের নাম 'বৃহন্নলা' স্ত্রীলিঙ্গ।

ভবদীয়

রাজশেখর বসু

"বিশ্বভারতী" থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্যের স্বরূপ" বইয়ের শেষ বাক্যে একটী শব্দ আছে তা নিয়ে মতভেদ আর বিতণ্ডা মাসিক পত্রিকায় দেখা দিয়েছে। শব্দটী "যুগবতী", না "যুগবর্ত্তী"? এ সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করা হ'য়েছে।

আমার মনে হয়, "যুগবর্ত্তী"-ই সঙ্গত পাঠ। "যুগবর্ত্তী"-ক বাক্যের মধ্যে অবস্থিত "গোরু" শব্দের বিশেষণ রূপে ধ'রলে অর্থ বেশ পরিষ্কার হয়। ব্যাকরণ, অর্থাৎ ভাষার অবশ্য-রক্ষণীয় নিয়ম অনুসারেই হয়। একটু শ্লেষও এতে থাকে,—মিড্-ভিক্টোরীয় সাহিত্যশকটের যুগ যার কাঁধে আছে, এই ইঙ্গিতটুকু পাওয়া যায়, আর তার সঙ্গে "গাড়োয়ানের মোচড় খেয়ে খেয়ে গ্রন্থি-শিথিল ল্যাজওয়ালা" গোরুরই মিল হয়। "যুগবতী" পাঠের কোনও সঙ্গত অর্থ পাই না। শ্লেষ বা অন্যবিধ অলঙ্কারও পাই না। "গোরু" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ দুইয়েই পাওয়া যায়—এখানে "গোরু" কিন্তু গাড়ীটানা গোরু,—বাঙালাদেশে গাভীতে কখনও গাড়ী টানে না (যদিও ছেলেভুলানো ছড়ার "হট্ট-মালার দেশে" এই অঘটন নাকি ঘ'টে থাকে; আবার সে-দেশে, অর্থাৎ ছড়ার দেশে, ভাই-ও "গুণবতী ভাই" হ'য়ে থাকে)। আমার মনে হয়, প্রথম যখন এই প্রবন্ধ ছাপা হ'য়েছিল, তখন ছাপাখানার ভূতের উপদ্রবে "যুগবর্ত্তী"-র রেফ স'রে গিয়েছিল; এখন "যুগবতী" পাঠ সমর্থন করবার চেষ্টা দেখে, বটতলার ছাপা "সবল কাবল ভূবি ভূষি সে কাবল"-এর ব্যাখ্যার দ্বারা রোমাঞ্চ পুলক ও [illegible] অবস্থা মনে হয়। ইতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

গত সংখ্যায় ছন্দালোচনায় রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর একটি কবিতার চরণ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন সে সম্বন্ধে একটু আপত্তি জানাচ্ছি। 'আলা' শব্দটিকে সুচারু মিল ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্যেই ওখানে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা—এতে সন্দেহের অবকাশ র'য়েছে। ঐ কবিতার যে পরিবেশ তার সঙ্গে আমাদের দেশীয় রূপকথারাজ্যের ঐ ঘরোয়া শব্দটির আশ্চর্য্য স্বপ্নালু সঙ্গতি থাকেনি কি? 'আলো' কথাটি বড়োই তীব্রতাব্যঞ্জক। 'আলা'র mellowness ওতে খুঁজে পাইনে।

ইতি

নরেশ গুহ

সমালোচনা

The Well of the People

by Bharati Sarabhai (Visva-Bharati)

ভারতীয় যখন ইংরাজীতে সাহিত্যচর্চা করেন তখন তার স্থান নির্ণয় করার মত অপ্রীতিকর কাজ নেই। এ-রকম সাহিত্য আলোচনা করার সময় আমরা দোটানায় পড়ি; মুক্তকণ্ঠ প্রশংসার প্রবৃত্তি ও সাহস থাকে না। কোনো জায়গায় সত্যকার ক্ষমতার পরিচয় পেলে সে সাফল্যের সঙ্গে যে ভাষায় লেখা সে ভাষার সমভাবাপন্ন অংশের তুলনার প্রবৃত্তি হওয়াই স্বভাবিক। যে জিনিষ মাতৃভাষায় দাঁড়িয়ে যেত, তুলনামূলক সমালোচনার ফলে তার সম্বন্ধে মোহ হয় না। মনে মনে বলি, বন্যেরা বনে সুন্দর। শ্রীমতী সরাভাই গান্ধিবাদী, অথচ নাটকটি ইংরাজীতে লেখা। এ-ধরনের অসামঞ্জস্য ভারতীয় জীবনে ও সাহিত্যে যত কম হয় ততই ভালো। যে মনোভাব বাঙালী উনবিংশ শতাব্দীতে কাটিয়ে এসেছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তার পুনরাবির্ভাব জাতীয় জীবনের পক্ষে শুভ নয়।

নাটকটি আঙ্গিকের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য নয়, এবং ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন যে তিনি সাধারণ নাটক লেখার প্রয়াস করেননি তাঁর মনে People's theatre গোছের ধারণা ছিল। কোন people, প্রশ্নটা অবশ্যম্ভাবী, কারণ নাটকটি ইংরিজিতে লেখা।

[illegible] বিদেশী ভাষার ওপরে লেখিকার দখল আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং, অন্তত কয়েকটি জায়গায়, তিনি আধুনিক কোনো কাে

ইংরেজ কবির ভাষা এবং ঢং আমাদের মনে করিয়ে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্য আমাদের খোঁচা দেয়, সহজ স্বাভাবিকতার মহিমা থেকে নাটকটি বঞ্চিত। যে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ মহিলাকে লেখিকা যুগযুগান্তের অমর ভারতের প্রতীক হিসাবে দেখিয়েছেন তার মুমূর্ষার সময় চেতনের (একটি চরিত্র) চিন্তধারা যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে, তা ইউরোপীয়র মুখে মানায়, তার সঙ্গে ভারতীয় অভিজ্ঞতার বিশেষ কোনো সংশ্রব নেই। চেতনের ব্যর্থতাবোধের বর্ণনা আরো বিচিত্র ঠেকে যখন মনে আনি যে সে চরকা ও পল্লীসংগঠনের ভক্ত।

যাই হোক, নবভারতের প্রাণশক্তি লেখিকা যে মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। জনসাধারণের সঙ্গে নাড়ীর যোগ সহজে আসে না, তবু নাড়ীর সন্ধান প্রশংসনীয়।

সমর সেন

মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী—শিবরাম চক্রবর্তী। সমবায় পাবলিশার্স। দাম দু' টাকা।

বাঙলা সাহিত্যে প্রবন্ধের দিকটা ক্রমেই বিশেষ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। প্রবন্ধ বলতে এক্ষেত্রে আমি রসোত্তীর্ণ রচনার কথাই বলছি, নিছক তথ্য এবং তত্ত্বভারাক্রান্ত আলোচনার কথা নয়। পাণ্ডিত্যের বিষয়-বস্তুকেও সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করে তার সরস অভিব্যক্তি। আলোচ্য বইখানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ না হলেও পাণ্ডিত্যের বিষয়বস্তুরই ওপর রচিত পনেরটি প্রবন্ধের একটি সংগ্রহ; কিন্তু লেখক পাণ্ডিত্য ফলাতে প্রয়াস পাননি কোথাও, এবং প্রতিটি রচনাই সাহিত্যিক সরসতায় উজ্জ্বল এ-কথা সুরুতেই বিনা দ্বিধায় স্বীকার ক'রে নিতে হয়।

শিবরামবাবু সুবিখ্যাত সাহিত্যিক—হাসির গল্প, ছোটদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ নানাদিক দিয়েই তাঁর লেখনী সার্থকরূপে সচল। প্রবন্ধরচনায় খ্যাতি তিনি অনেক পূর্ব্বেই অর্জ্জন করেছেন—১৯২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'আজ ও আগামী কাল' পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিলো। অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে এ-বইয়ে সে প্রবন্ধগুলোও পরিমার্জ্জিত আকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর অধিকাংশ প্রবন্ধই বিতর্কমূলক—তাই আলোচ্য বিষয় পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দ্বন্দ্বযুদ্ধে শুধু এক পক্ষের অসিচালনার ছবি দেখতে হ'লে সেটা পুরো উপভোগ্য হয় না। বড় জোর না-হয় প্রতিপক্ষের অসির ডগা কতবার বার চমক মেরে গেল চোখের উপর দিয়ে, তা-ও এ-পক্ষ যখন যেটুকু দেখাচ্ছেন—এ থেকে একের ভঙ্গীকৌশল ও সাবলীলতার আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু শক্তিমত্তার বিচার চলে না।

প্রতিটি রচনায় বক্তব্যের চেয়ে বলার ভঙ্গীটাই হয়ে উঠেছে বড়—কি তিনি বলছেন তার চেয়ে পাঠকের নজর কেড়ে নেয় কি ভাবে বলছেন সেইটে। সাহিত্যের মূল্যবিচারও নির্ভর করছে তারই ওপর। এ-দিক থেকে স্বীকার করতে হয় সরস ক'রে বলার ক্ষমতা শিবরামবাবুর আশ্চর্য্যরকম আয়ত্তে। তা ছাড়া পরিহাসের সুরে খুব সারবান কথা যুক্তিসহ অনায়াসেই (?) তিনি ব'লে যেতে পারেন। অনায়াসে কথাটা অকুণ্ঠিত ভাবে বলতে মন বাধা পায় শুধু তাঁর কষ্টকল্পিত punning-এর জন্যে। স্থানে-স্থানে সমশব্দী কথার এই খেলা প্রশংসনীয় প্রয়োগে সার্থক, কিন্তু তার বাহুল্য ও বাড়াবাড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচনার গাম্ভীর্য্যকে করে হালকা, হালকাকে ক'রে তোলে হাস্যকর। শিবরামবাবুর ভাষা ও বাচনভঙ্গীর ওপর প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রভাবটাও উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধগুলোর রচনায় মননশীলতার দিকটা তত বড় হয়ে দেখা দেয়নি এবং যুক্তির চেয়ে যৌবনোচিত ঔদ্ধত্যের প্রকাশটাই বেশি। লেখক আগাগোড়া সাম্যবাদের সমর্থনে বক্তব্যের অবতারণা করেছেন—প্রয়াস প্রশংসনীয় কিন্তু বক্তব্য যতটা মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে, ততটা মননশীল হয়নি—এমনকি প্রতিপক্ষের যে-সব যুক্তির উল্লেখ আছে তাতেও চিন্তাশীলতার আমন্ত্রণ নেই। লেখক তাঁর নিজ আদর্শের যুক্তিশৃঙ্খলার সম্মান রাখতে পারেন নি এমন নজিরও আছে—যেমন বুদ্ধ এবং লেনিনের মধ্যবর্ত্তী শত শত বৎসরের ইতিহাসকে অস্বীকার ক'রে দু'য়ের মধ্যে তুলনা টেনে তিনি লেনিনকে বলেছেন বড়ো। মানুষের বড়ত্ব ছোটত্ব, মহামানব বা 'সম্পূর্ণ মানুষ' সম্পর্কেও তাঁর ধারণাটা তেমন পরিচ্ছন্ন ব'লে মনে হলো না—অবিশ্যি সেটা নজীর টেনে আলোচনা করার মতো পরিসর এ-ক্ষেত্রে আমি পাচ্ছিনে। রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন তিনি সম্পূর্ণমানুষ। তাঁর দেওয়া সম্পূর্ণমানুষের সংজ্ঞা নিয়েও আলোচনা আমি করবো না—আমি এটুকু শুধু উল্লেখ করতে চাই যে সাম্যবাদের অপরিসীম উর্ব্বর জমি পেলেই সবাই রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠবে না, উঠতে পারে না। 'ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্ততা' প্রবন্ধে শিবারামবাবু লিখেছেন, 'এখন রবীন্দ্রনাথের মতো এক আধ জন মানুষের মধ্যে স্বজনীশক্তির যে অপূর্ব্ব লীলা দেখে আমরা মুহ্যমান হয়ে পড়েছি সেই সৃজনী-শক্তি (creative force) তখন সমস্ত মানুষের মধ্যে মুক্ত হবে'—অর্থাৎ অবস্থাবিপর্য্যয়ে এখন আটক প'ড়ে আছে। এ ধারণা নিয়েই তিনি 'সুপারম্যানিয়া'-তে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে ছোট বেলায় চা-বাগানে বিক্রি করলে চা-পাতার চয়নিকা করেই নাকি তাঁর দিন কাটতো। চা-বাগানের মতো হীন পরিবেশ থেকেও প্রতিভার উদ্ভব এবং প্রকাশ হয়েছে তার একাধিক উদাহরণ লেখকেরও অজানিত নয় নিশ্চয়ই। 'রবীন্দ্রনাথের মতই সম্পূর্ণতার অধিকারী এখন সাত কোটি মানুষ আজ অপ্রকাশিত হয়ে রয়েছে' বটে, কিন্তু প্রকাশ হলেই কেউ তারা আর রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠবে না—সৃজনীপ্রতিভার মূল

উপাদানটা রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থার দান নয়। দুঃখের সঙ্গে আর-একটা কথারও উল্লেখ করতে হয়—'কবি-জয়ন্তী' প্রবন্ধে বা প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন তাতে শ্রদ্ধার অভাবটা রীতিমতো পীড়া দেয়। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। মান রেখেও সত্যভাষণ সম্ভব। মানিলোকের মান রাখতে না পারাটা এক রকমের অক্ষমতা।

প্রবন্ধগুলো সবই সাংবাদিক চালে লেখা, তাই সময়ের সঙ্গে তার রূপ-রস অনেকটাই ফিকে হ'য়ে গেছে—তা ছাড়া ধর্ম্ম ও ভগবান নিয়ে পরিহাস ও ব্যঙ্গোক্তিটা কেমন যেন একটা অতি সহজ ব্যাপার ব'লে মনে হয়,—আজকের দিনে মনে আর তেমন দাগ কাটে না। তবু বইখানা প'ড়ে মন রীতিমতো উৎসাহী হ'য়ে ওঠে শিবরামবাবুকে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফিরে পেতে, এবং প্রবন্ধ লেখা তিনি পরিত্যাগ করেছেন ব'লে একটা নালিশ জাগে। ব্যক্তিক নিবন্ধই হোক বা বিতর্কমূলক প্রবন্ধই হোক, প্রবন্ধ তাঁর লেখা উচিত বাংলা সাহিত্যের স্বার্থে।

জ্যোতির্ম্ময় রায়

সম্পাদকীয়

'বিশ্বভারতী পত্রিকা'

'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি হাতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ হ'লো। এই সর্ব্যাপী কৃষ্ণপক্ষের মধ্যে অকস্মাৎ এমন একটি সুদৃশ্য, সুস্পৃশ্য, সুপাঠ্য সাময়িকপত্র আশাতীত সৌভাগ্য ব'লে বোধ হয়। এটা লক্ষ্য করবার যে প্রথম বর্ষের 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সঙ্গে শুধু নামটুকু ছাড়া আর-কিছুতেই এর মিল নেই। ছিলো মাসিক, হ'লো ত্রৈমাসিক; সম্পাদনাভার গ্রহণ করলেন শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কার্যালয়ও শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় বদলি হ'লো। আকারও ভিন্ন, প্রচ্ছদপট নতুন ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। যে-অ্যান্টিক কাগজের কথা আমরা প্রায় ভুলেই গেছি, সেই অ্যান্টিকেই ঝরঝরে ছাপা। হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতেও সুখ।

এর পরে শুধু এটুকু বলতে বাকি থাকে যে ঐ অতি শুভ্র অ্যান্টিক কাগজ মূল্যবান ও উপভোগ্য রচনা দিয়েই কালো করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্ত্তী ও প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ। বাঙালি সংস্কৃত কবিদের রচনাবলীর যে-বিবরণ সুনীতিবাবু লিখেছেন, তা বিবরণের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে, তাতে লেগেছে রসোপভোগের স্পর্শ। এই বাঙালি-সংস্কৃত কবিতাগুলির বাংলা-ভাষায় পদ্যানুবাদ হ'লে আমাদের সাহিত্য-উপভোগের আর একটি রাস্তা খুলে যেতে পারে। অমিয়বাবু ইকবাল সম্বন্ধে লিখেছেন, তাতে ইকবালের পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গে লেখকের দেশপ্রেমের বেদনার পরিচয় পাই, প্রচ্ছন্ন ব'লেই তীব্র। প্রবোধবাবু অশোক-যুগের আলোয় আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে যে-ভাবে প্রকাশ করেছেন, সেটি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। উৎকর্ষের এই আদর্শ যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহ'লে বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র গৌরবময় আসন নিশ্চিত।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্বভারতীর 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে' আরো দুটি বই প্রকাশিত হ'লো: অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার'। অবনীন্দ্রনাথের স্নিগ্ধ বঙ্কিত ভাষায় প্রাগিংরেজ বাংলার হৃদয়ের আর্দ্রতাটুকুই যেন ধরা পড়েছে, পড়তে-পড়তে আমাদেরও মন ভিজে ওঠে। অনেকগুলি আলপনার প্রতিলিপি আছে, এবং অনেক ব্রতসম্পর্কিত ছড়াও উদ্ধৃত হয়েছে যা আজকাল আমাদের মনে ক্ষীণস্মৃতিরেখায় বিলীনপ্রায়।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে যাঁরা অল্প কথায় জানতে চান শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুস্তিকাটি তাঁদের পক্ষে লোভনীয়। জগদীশচন্দ্রের নিজের রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতিসহযোগে বইটিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে অতি সাধারণ পাঠকও এই মহৎ বিজ্ঞানীর সাধনা বিষয়ে কিছু ধারণা করতে পারেন।

পুনর্মুদ্রণ

'মানসী'র আরো একটি সংস্করণ হ'লো। এর পরিশিষ্টে 'নিষ্ফল উপহার' কবিতার পাঠান্তর ও মেঘদূত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কবির একটি পত্র সংযোজিত হয়েছে। ('মেঘদূত' বলতে কালিদাসের কাব্য এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুই-ই বোঝাচ্ছে।) এই পত্রটি 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়েছিলো কিন্তু এ-পর্যন্ত অন্য কোথাও পুনর্মুদ্রিত হয়নি। 'মানসী'র এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের ও 'রচনাবলী'-সংস্করণের ভূমিকাও পাওয়া যাবে।

'সহজ পাঠ' তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের পুনর্মুদ্রণ হ'লো। চতুর্থ ভাগটি পূর্বপ্রকাশিত 'পাঠপ্রচয়ে'রই নতুন সংস্করণ। এতে কবির 'উড়োজাহাজ' ব'লে একটি কবিতা দেয়া হয়েছে, যা ১৩৩৮-এ 'সন্দেশে' বেরিয়েছিলো, তার পর কোনো গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়নি। কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত ক'রে দিই, আজকালকার দিনে তার নতুন মানে বেরোবে:

যত হও নাকো বড়ো,
দাঁত করো কড়োমড়ো,
তবু ভয়ে তোর
লাগিবে না ঘোর
হব নাকো জড়োসড়ো।

গ্রাহক নম্বর

আমাদের গ্রাহকদের বিশেষভাবে এই অনুরোধ জানাই যে তাঁরা যেন চিঠিপত্রে ও মনি-অর্ডারের কুপনে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করতে না ভোলেন। এই সামান্য নিয়মটি সকলে রক্ষা করেন না ব'লে আমাদের বিস্তর অসুবিধে ভোগ করতে হয়, এবং গ্রাহকদের পক্ষেও এটা ক্ষতির কারণ হ'তে পারে। যাঁরা নতুন গ্রাহক হয়েছেন তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক মনি-অর্ডর কুপনে **নতুন গ্রাহক** এই কথাটি উল্লেখ করবেন।

'কবিতা'র শারদীয় সংখ্যা

'কবিতা'র আগামী শারদীয় সংখ্যা পূজার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যার নগদ মূল্য এক টাকা।

ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর 'বৃষ্টি' কবিতায় একটি ছাপার ভুল র'য়ে গেছে। ২৮ লাইনে 'দাঁড়ানো মানুষ দরজায়'-এর বদলে 'দাঁড়ালো মানুষ দরজায়' পড়তে হবে।

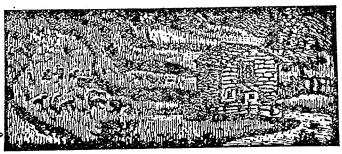

কাঠখোদাই: রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কবিতা

নবম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা   কার্তিক, ১৩৫০   ক্রমিক সংখ্যা ৩৯

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ও বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত]

২৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

…আমি কবি, এইটেই হোলো আমার প্রথম এবং শেষ কথা—আর যেসব আমার কাঁধে ভর করেছে সে গুলো বাহ্য। বটগাছে বাঁদর লাফায়, পাখী বাসা বাঁধে, কিন্তু বটগাছটা তাদের বাদ দিয়েই। আমি গল্প লিখে থাকি—তার সদ্য প্রমাণ চার অধ্যায়। কিন্তু যখন কবিতা নিয়ে পড়ি তখন মনে হয় ওগুলো পরগাছা, শিকড় নেই অন্তরে। সন্দেহ হয় ওদের ধ্রুবত্ব সম্বন্ধে। ওদের হাঁকডাক বেশি, কিন্তু সাঁচ্চাই? চার অধ্যায়ের যে দিকটা আমাদের পাঠককে ভোলায় সে ওর কবিতা অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি জাদু, সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিষটা পায় সেটা ঠিক খাঁটি গল্পের বাহন নয়। অন্তু আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা—নবেলের নির্জ্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয়তো দেরি হবে। যোগাযোগটা ওর চেয়ে গল্পের এলেকায় টেঁকসই হবার কথা—যদিও তার মধ্যে কবির কলম শিল্পকাজ চালায় নি তা বলতে পারিনে। কেননা কবি যদি ত্রিসীমানায় থাকে তাকে চাপা দেওয়া অসম্ভব। তোমার সাহিত্যিক বন্ধুরা নিশ্চয় তর্জ্জমাটা দেখেচেন, বিশুদ্ধ সাহিত্যের তরফ থেকে তাঁরা কী বিচার করেন জানতে ইচ্ছে করি। সাহিত্যের বাইরেও এর মধ্যে তাঁদের ঔৎসুক্যের কারণ আছে,—সে হচ্চে আধুনিক বাংলায় বৈপ্লবিক মনস্তত্ত্বের এক টুকরো ছবি। এ ঔৎসুক্য ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। অন্তত কবির তরফে এটাতে আমার নিজের কোনো দরদ নেই—আমার দরদ হচ্ছে এলা অন্তুর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী। যে ভাষায় তার বেদনা ফুটে উঠেছে সে ভাষা কোনোমতেই রূপান্তরিত করা যায় না। সুতরাং বাঙালী পাঠক এর থেকে যা পাবে

ইংরেজি পাঠক কোনোমতেই তা পেতে পারে না। এমন ফল আছে রস বাদ দিয়েও যার শাঁস থাকে, তা নিয়ে ব্যবসা চালানো যায়—কিন্তু আমের রস যে পেল না আঁঠি নিয়ে সে কী বিচার করবে আন্দাজ করা শক্ত নয়। এই সব কথা যখন চিন্তা করি তখন মনে সংশয় হয়। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ এই ওখানকার সমজদারদের মত নিয়ে যদি বোঝো এটা কেবলমাত্র চলনসইয়ের চেয়ে বেশি নয়, অথবা তার চেয়েও কম তাহ'লে ছাপতে দিয়ো না। এ ক্ষেত্রে পাব্লিশরদের মতের দাম অর্থের দাম দিয়ে। তারা জানে এটা যাকে বলে সেন্সেশনাল, এক দফা বিক্রি হবে—লোকে দুই পক্ষ থেকে গোলমাল করবে, মুনফার দিক থেকে এর সার্থকতা আছে। কিন্তু সেই বিচারটা অশ্রদ্ধেয়।···

কাল বর্ষশেষ—পর্শু নববর্ষ। আমার আশীর্বাদ নিয়ো। ইতি ২৯ চৈত্র ১৩৪১

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের খবর পেয়েছ কিনা জানিনে। গল্পটাকে নাচে গানে গেঁথে নাট্যমঞ্চের উপরে প্রকাশ করা হয়েছে। এই পালাটা নিয়ে আমরা জয়যাত্রায় বেরিয়েছিলেম। কলকাতা পাটনা এলাহাবাদ দিল্লি মিরাট লাহোর এই কয় জায়গায় আসর জমিয়েছিলুম। সকল জায়গা থেকেই প্রভূত প্রশংসা পেয়ে এসেছি। যদি প্রত্যক্ষ দেখতে তাহলে বুঝতে গানে নাচে বর্ণচ্ছটার সমবায়ে সমস্তটার ভিতর দিয়ে অপরূপ সৌন্দর্য্যের কী রকম উৎকর্ষ অভিব্যক্ত হয়েছিল। পাশ্চাত্য দর্শকরা বারবার করে বলেছে এ জিনিষটা য়ুরোপে নিয়ে যাওয়া উচিত। লোকের মনোরঞ্জনের উদ্দেশে রঙ্গভূমির ভূমিকায় এই আমার শেষ প্রয়াস। কোনো একটি অনামা বন্ধু আমাদের ঋণমোচনের জন্য আমাকে এককালীন ষাট হাজার টাকা দান করে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।······ বিশ্বভারতীর অর্থাভাব দূর করবার জন্যে দুর্ব্বল জীর্ণ

শরীরকে ক্লান্তির চরম সীমায় নিয়ে চলেছিলুম। শ্রদ্ধাবিহীনের দ্বারে ব্যর্থ ভিক্ষাপাত্র বহনের দুঃখ ও অসম্মান প্রত্যহ অসহ্য হয়ে উঠেছিল।······এমন সময়ে অকস্মাৎ এই অপ্রত্যাশিত অনুকম্পা আমাকে বিস্মিত করেছে।······ আমি বেঁচে থাকি, আমি আরাম পাই এই অকৃত্রিম দরদ দেশের কোনো একটিমাত্র জায়গাতেও থাকতে পারে এমন প্রত্যাশার লেশমাত্রও আমার মনে ছিল না। অথচ যাঁরা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমার কর্ম্মক্ষেত্রের সুদূর প্রান্তেও পা বাড়ান নি তাঁরা নিজেদের কীর্ত্তি এবং স্বার্থের জন্য আমার নামের সংশ্রব প্রার্থনা করতে কোনো সঙ্কোচ বোধ করেন না, অর্থাৎ তাঁরা আমার ভার বাড়িয়েই থাকেন, ভার লেশমাত্র কমাবার জন্যে লেশমাত্র ইচ্ছা দেখান না।··· জীবনযাত্রার সুদীর্ঘ পথের শেষে আমার প্রদেশের বাইরে থেকে এই যে ভালোবাসার প্রমাণ পেয়েছি এর চেয়ে বড়ো পুরস্কার আমি আর কিছু পাইনি। যে ছুটি আজ আমার অত্যন্ত আবশ্যক ছিল সেই ছুটির এত বড়ো দাম এক মুহূর্তে যিনি শোধ করে দিয়েছেন তাঁর উদ্দেশে রইল আমার জীবনের শেষ নমস্কার।

নেভিনসনের বইখানি পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এখনকার অনেক আধুনিক লেখকদের মধ্যে ওঁকেই দেখেছি যিনি একান্তভাবে মডার্ন্ নন, যিনি সকল কালের। ওঁর রচনার মধ্যে লেখনীর নৈপুণ্য নয় চরিত্রের মহিমা প্রকাশ পায় তাতে ভারি আনন্দ দেয়। যে স্বচ্ছ বাতাসে আলোক বাধা পায় না, আবিল হয় না, ওঁর লেখার চারদিকে সেই বায়ুমণ্ডল আছে।

···যদি যথোচিত সঙ্গতি থাকত তাহলে একবার য়ুরোপ ঘুরে আসতুম। অশুভগ্রহের যে রকম সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে আশঙ্কা হচ্চে য়ুরোপে হয়ত বা যুগান্তর আসন্ন—পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই ক্ষত আহত দশার পূর্ব্বে একবার দেখে আসতে পারলে হ'ত ভালো। ওদের ইতিহাসের স্তরে স্তরে অনেকদিন অনেক পাপ জমে এসেছে, কোন রক্তস্নানে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে জানিনে।

আজকাল লিখতে ক্লান্তি ও অনিচ্ছা বোধ হয়। আমার ইস্কুল পালানে ছেলেবেলা আজ আবার আমার ঘাড়ে চেপেছে। সেই আমার পলাতকা মন এতদিন তোমাকে চিঠিপত্র লেখে নি। অনেক দিন পরে আজ অপরাহ্ণকালে কলম নিয়ে বসেছি। কিছুকাল থেকে লিখব লিখব করছিলুম—না লিখে

ফেলতে পারলে ভিতরে ছুটি পাওয়া যায় না।—তাই এই চিঠিখানা—এখন কলম বন্ধ করি। ইতি ৬।৪।৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিখানা সমাধা করার পরেই মনটা আমার লজ্জা বোধ করচে। জীবনের খাতায় আদায়ের কোঠায় আমার কম জমা হয় নি, অথচ অনাদায়ের শূন্যগুলোর পরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভাগ্যের কৃপণতার পরে অভিমান করার মতো দীনতা আর কিছু হতে পারে না। পাওনার হিসেব নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করতে থাকা আত্মাবমাননা। সম্প্রতি আমার শরীর নিরতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়েচে বলেই এই অসন্তোষ অস্বাস্থ্যে ভর দিয়ে হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে শরীর ভালো ছিল তখন জীবনের সমস্ত গ্লানির উপরে আমার মন সম্পূর্ণ জয়ী হয়ে সুগভীর শান্তিতে পূর্ণ হয়েছিল, তখন বাইরের সমস্ত প্রতিকূলতা আমার কাছে অবাস্তব প্রতিপন্ন হওয়াতে আমার যাত্রাপথের শেষ অংশটা খুব স্নিগ্ধ হয়ে এসেছিল। এ কথাটা পরিষ্কার বুঝেছিলুম আয়ুর স্রোতে সত্য মিথ্যা দুইই প্রচুর পরিমাণে মিশিয়ে থাকে, কিন্তু গঙ্গার ধারা আপনার পাঁকের অংশটাকে সহজে গৌণ করতে পেরেছে বলেই সে শুচি, তেমনি যা অবাস্তব তাকে গ্রহণ করেও সর্ব্বান্তঃকরণে অস্বীকার করতে পারাই মনের স্বাস্থ্য এবং সম্মান রক্ষার অত্যাবশ্যক। আজ তোমাকে চিঠি লেখার পরেই দেখতে পেলুম, মনের তলায় যে পাঁকের পলি পড়ে নাড়া খেলেই হঠাৎ সমস্ত স্রোতটাকেই সে ঘুলিয়ে ফেলে। চরিত্রের এই অসম্ভ্রমের থেকে নিষ্কৃতি চাই—নালিশের ধুলো-ওড়া বাতাসের ঊর্ধ্বে যেখানে শুদ্ধ নির্ম্মল শান্তি সেখানে ডানায় ভর করে পৌঁছতে পারলে ক্ষীণতা থেকে ইতরতা থেকে রক্ষা পাব। বাইরের আদালত থেকে আমার সব নালিশ উঠিয়ে নিলুম। উপরের আদালতে জীবনের মামলায় জিৎ হবেই এই দৃঢ় প্রত্যাশার উপরে জীবনের পরিণামে যেন অবিচলিত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি। কিছুকাল পূর্ব্বে আমার লেখার ইংরাজী অনুবাদ প্রভৃতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলে তখন তার ধাক্কা আমার মনকে লাগেনি—আমি স্পষ্ট অনুভব করেছিলুম উপস্থিত কালের দেনা পাওনার তর্ক অশ্রদ্ধেয়—হিসাব যখন নিকাশ হবে তখন সে হবে আমার অগোচরেই—তার ফলাফল আমার অতীত—এবং

উপস্থিত কাল যে ফল নিয়ে আমার সম্মুখে ধরে তার পরিমাণ ও মূল্য নিয়ে হর্ষশোক ছেলেমানুষী। কাজের আনন্দটাই থাক্ আমার, তার বেশি আর যা কিছু দিয়ে নিজের নামটাকে ফুলিয়ে তুলতে ব্যস্ত হই তার প্রতি যেন সম্পূর্ণ বিমুখ হতে পারি এই আমার কামনা। নামের মোহ জড়িয়ে আছে মনকে কুয়াযার মতো, লোকমুখের বাক্যের কুয়াষা—ছিন্ন হয়ে যাক্ সে—নির্ম্মল আলোর মধ্যে মুক্তি পাক অন্তরাত্মা। ইতি ৭।৪।৩৬

রবীন্দ্রনাথ

পত্রখণ্ড

(ক)

দক্ষিণ ফ্রান্স Cap Martin
Alpes Maritimes

য়ুরোপে ঘুরে বেড়াচ্চি, অক্টোবরে আমেরিকায় পাড়ি দেব। Mary Pickford-এর বিষয়ে Daily News-এ আমার যে interview বেরিয়েছিল সে সম্বন্ধে Statesman, Englishman আমাকে গাল দিয়ে প্রবন্ধ লিখেচে তোমার চিঠিতে জানতে পারলুম। ভারতবর্ষ থেকে তোমরা একটা কথা ঠিক বুঝতে পার না যে ঐ সব কাগজের অস্তিত্ব সমস্ত পৃথিবীর কাছে কতই অকিঞ্চিৎকর। ভারতবর্ষের মশার ডাক যেমন এখান থেকে একেবারেই শোনা যায় না ঐ সব কাগজের গুঞ্জনধ্বনিও তেমনি। মেরি পিক্‌ফোর্ড সম্বন্ধে আমার মন্তব্য নিয়ে এখানকার লোকে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা করেনি, বরঞ্চ প্রশংশা করেছিল। ইতি ২৮ অগস্ট ১৯২০

(খ)

স্পেঙর ও ফর্স্টরের দুটি চটি বই পড়লুম। আমার নিজের মত এই যে আমরা অর্থনীতি বা ধর্মনীতিতে যে দলেরই লোক হই আমাদের সেই দলাদলি যে সাহিত্যকে বিশেষ ছাঁদে গড়ে তুলবেই এমন কোনো কথা নেই। রসের দিক থেকে মানুষের ভালো মন্দ লাগা কোনো মতকে মানতে বাধ্য নয়। আমার মনটা হয়তো সোশিয়ালিষ্ট, আমার কর্মক্ষেত্রে তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে, কিন্তু উর্বশী কবিতাকে সে স্পর্শও করে না। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র। মার্কসিজ্‌মের ছোঁয়াচ যদি

কারো কবিতায় লাগে, অর্থাৎ কাব্যের জাত রেখে লাগে, তাহলে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে তাহলে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়? কেমিষ্ট্রির ল্যাবরেটরি যদি ভালোয় ভালোয় জুড়তে পার রান্নাঘরে, তবে সায়ান্সের জয়জয়কার করব কিন্তু নাই যদি পারো তাহলে হারজিতের তর্ক তুলব না, ভোজনটার ব্যাঘাত না হলেই হোলো। ১৯৩৮

(গ)

Aldous Huxley-র নতুন বইখানি পড়ে আমার এত আনন্দ হোলো। তার ভাষায় তার ইঙ্গিতে কোথাও বড়োকে বিদ্রূপ করা হয় নি। এই বড়োই তো চিরকালের বড়ো, আমরা তো একেই মেনে এসেছি—মহৎকে মহৎ বলতে সুন্দরকে সুন্দর মানতে আমাদের তো আনন্দ হয়েছে—ভালোকে নিয়ে বেঁকিয়ে কথা বলতে আমাদের যে লজ্জা বোধ হয়।……আধুনিক পরিবেষ্টনের চিত্তবিকৃতি থেকে আমাকে যেন চিরপুরাতন সঞ্জীবনী হাওয়ায় জাগিয়ে তুললে—দেহে শক্তি থাকলে দুরূহ সাধনায় বেরিয়ে পড়তুম—মন বেরিয়েছে। ইতি জুন ১৯৩৮

বন্ধু

বুদ্ধদেব বসু

ভাই শমী,

আজ কি তোমার মনে পড়ে
যেদিন আমার ঘরে শশাঙ্কশেখর
প্রথম উদিত হ'লো।
লম্বা মাথা, গর্তে-বসা চোখ,
হলদে গায়ের রং।
চেহারাটা চীনেম্যান-ঘেঁষা,
অতএব বাঙালির চোখে হাস্যকর।
কথা তার ব'লে দেয় সে যে পূর্বদেশী,
আমরা বাঙাল যারা আমাদের কানে
সেটা অতি লজ্জাকর ঠেকে।

মনে আছে, হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে
দাঁড়িয়ে আমার কাছে, মাথা নিচু, হাত জোড় ক'রে
বলেছিলো,
'আপনাকে চোখে দেখা অনেকদিনের
আকাঙ্ক্ষা আমার।
সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে ব'লে
এসেছি চাটগাঁ থেকে—'
আরো কিছু বলতো হয়তো,
কিন্তু হঠাৎ
তাকিয়ে ঘরের চারদিকে
থতমত খেয়ে থেমে গেলো।
ঘর ভরা লোক ছিলো, বন্ধু ও বন্ধুনি
খ্যাতনামা-নাম্নীদের ভিড়ে
অতি-অলংকৃত ধনীগৃহিণীর মতো
আমার ড্রয়িংরুম।
তুমি ছিলে, রাজনৈতিক,
সাহিত্যিক, সাঙ্গীতিক, চিত্রী, ফিল্ম-স্টার,
সব ছিলো। সেই সে স্বয়ম্ভূ পাল
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 'ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া' আখ্যা দিয়ে
হৈ-চৈ তুলেছিলো সাহিত্যজগতে
উনিশ শো পঁয়তিরিশ সনে,
সে-ও ছিলো, তার
রং-মাখা সুন্দরী পত্নীকে নিয়ে!
শশাঙ্ককে দেখে
উঠলো ঘরের মধ্যে অস্ফুট টিটকিরি,
চোখে চাওয়া, মুখ টেপাটিপি।
বেচারা দাঁড়িয়ে রইলো অপ্রস্তুত আগন্তুক,
লম্বা, রোগা, ফ্যাকাশে-হলদে।
আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেম,
মহিলারা ছুঁচোলো সূক্ষ্ম ঠোঁটে
ছোট্ট রুমাল ঠেশে
অতি কষ্টে হাসি চাপছেন।
তুমি আছো ঊর্ধ্বচোখে কড়িকাঠহীন
কংক্রীটের সীলিঙে তাকিয়ে
কেউ তাকে বসতে বললে না,
কারো সঙ্গে পরিচিত হ'লো না সে;

শুধু চুপ ক'রে
খাপছাড়া, ভ্যাবাচ্যাকা দাঁড়িয়ে রইলো।
তাড়াতাড়ি চুপি-চুপি বললেম তাকে,
'এখন ব্যস্ত আছি বড়ো,
আসবেন পরশু সকালে
দশটার আগে।'
যেই সে বেরিয়ে গেলো
ছাড়া পেলো অবরুদ্ধ হাসি,
হো-হো শব্দে ঘর গেলো ভ'রে।
তোমার পাশেই ছিলো মল্লিকা গাঙ্গুলি,
নিখুঁত পালিশ-করা তিন-কোণা চোখা নখ দিয়ে
চিমটি কেটে তোমার নধর ঘাড়ে
বলেছিলো, 'জীবনটা নেহাৎ মন্দ না,
কিন্তু এই শান্তনুর ভক্তদের অশ্রান্ত উৎপাতে
ইচ্ছে করে না আর বাঁচি।'
এ-আশ্চর্য রসিকতা শুনে
আবার হাসির ঢেউ ফেনিয়ে উঠলো।
তারপর শশাঙ্কর কথা
বেমালুম ভুলে গিয়ে আমরা সবাই
চালালেম জমাট আড্ডা,
হাসিঠাট্টা, পরচর্চা, সিগারেট, চা।

পরশু সকালে
ঠিক এলো শশাঙ্কশেখর।
সেদিন ছিলেম একা। তবু সে লজ্জায়
চোখ তুলে তাকাতে পারে না।
মৃদুস্বরে
দু' একটি কথা ব'লে চুপ ক'রে থাকে,
নখে নখ ঘষে।
মনে হ'লো কী যেন বলতে চায়,
বলতে পারে না।
আমিই তখন
ছোটো-ছোটো প্রশ্ন ক'রে, চোখে-মুখে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে
কথা কওয়ালেম তাকে।
কলেজের ভালো ছাত্র ছিলো।

বি. এ. পরীক্ষার বারে
চাটগাঁর বিপ্লবী ঝড়ে
শুকনো পাতার মতো উড়ে গেলো।
দু' বছর রাজবন্দী থেকে
এসেছে বেরিয়ে
মাস দুই আগে।
'জেলে ব'সে আপনার সবগুলি বই
বার-বার হ'য়ে গেছে পড়া।
পড়তে-পড়তে
কেবল ভেবেছি মনে-মনে
আপনার মতো
কখনো কি লিখতে পারবো!'
ধরা প'ড়ে গেলো।
আচমকা মনের কথা
ব'লে ফেলে লাল হ'য়ে উঠলো বেচারা।
শুধোলেম, 'আপনি লেখেন বুঝি?'
'না, না, ও কিছু নয়, কিছু নয়,
কেবল মক্‌শো করা!
আপনার লেখা প'ড়ে এটা তো জেনেছি
লেখা কাকে বলে!'
কথা শুনে, হাব-ভাব দেখে
কেমন মমতা হ'লো লোকটার 'পরে।
মনে হলো, রোগা লম্বা খাপছাড়া চেহারার তলে
একটা জ্যান্ত মন আছে,
তোমরা যাকে বলো
ইণ্টারেস্টিং।
হয়তো বা নিজের লেখার
সুখ্যাতি শুনেই
মনটা নরম হয়েছিলো।
আত্মশ্লাঘা মানুষেরই দুর্বলতা,
আমিও মানুষ।
ওকে লজ্জা না-দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে
শুধোলেম কথায়-কথায়,
'আপনার কোনো লেখা সঙ্গে আছে নাকি?'
লক্ষ্য ক'রে দেখলেম, বাঁ দিকের পকেটটা স্ফীত,
চাঁদরের ভাঁজে
ওটাকে লুকিয়ে রাখা ক্রমাগত চেষ্টা তার।

এইবার বার তিন চার ঢোঁক গিলে
কম্পিত আঙুলে
গোল ক'রে প্যাক করা মোটা পাণ্ডুলিপি
দিলে সে আমার হাতে।
'জেলে ব'সে লেখা-লেখা খেলা—
জানি এ কিছুই নয়,
তবু মনে এই আশা ছিলো
হয়তো কোনো-একদিন
আপনাকে দেখাতে পারবো—'
বলতে-বলতে
গলা বুঁজে এলো,
কথা শেষ করতে না-পেরে
আঙুল জড়াতে লাগলো চাদরের খুঁটে।
বললেম, 'প'ড়ে দেখবো।'
'তাহ'লে আবার কবে—?'
একটু ভেবে বললেম,
'আগামী মঙ্গলবার।'

পাণ্ডুলিপিটাকে
দেখলেম নেড়ে-চেড়ে।
মস্ত উপন্যাস
আগাগোড়া অসহ্য উচ্ছ্বাস।
সবচেয়ে মজা এই, কখনো-কখনো
মনে হয় হুবহু আমারই লেখা।
মনে-মনে বললেম, আরে রামো।
তাহ'লে আমি কি এই!
লেখকের দুর্বলতাগুলি
ঠিক বেছে নিয়ে
জাঁকিয়ে জাহির করা অনুকারকের
আশ্চর্য ক্ষমতা!
তবু এও বলি
অজস্র ফেনার ফাঁকে-ফাঁকে
হঠাৎ একটি কথা চোখে প'ড়ে চমকে উঠেছি।
তখনি হয়েছে মনে এর মধ্যে বস্তু আছে, সত্য আছে,
আপাতত আমাতে আচ্ছন্ন হ'য়ে
সব চাপা পড়া।

আমার কবল থেকে ওকে
উদ্ধার করতে যদি পারি,
তাহ'লে হয়তো
সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে নবীন নায়ক
দেখা দেবে—শশাঙ্কশেখর।
চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়।

যখন মঙ্গলবারে
এলো সে, প্রচুর
উৎসাহ দিলেম তাকে।
মাত্রা-ছাড়া হবেও বা সেটা।
তুমি তো জানোই
অল্প ভালো লাগলেই অতিরিক্ত ভালো বলা
আমার স্বভাব।
তাই নিয়ে তোমাদের কাছে
বিস্তর লাঞ্ছনা
বরাবর সইতে হয়েছে।
সব-শেষে বললেম, 'কিন্তু একটি কথা।
শান্তনু বোসের ভূত আপনার কাঁধে চেপে আছে,
ঝেড়ে ফেলতেই হবে।'
টকটকে টম্যাটোর মতো
লাল হ'য়ে শশাঙ্কশেখর
চুপ ক'রে ব'সে রইলো।
মিনিট দশেক পরে
ভাঙা-ভাঙা স্বরে
ছাড়া-ছাড়া এলোমেলো কয়েকটি কথা
অনেক চেষ্টায় যেন বের ক'রে দিলে।
যে-কথা সে বলতে চায়, অনুমানে বুঝে নিতে হলো,
সেটা এই:
যতদিন রাজবন্দী ছিলো
খাওয়া-পরা, মাসে-মাসে বই কেনা,
সবই জুটে গেছে।
জেলের বাইরে যেই আসা,
অমনি গিলেছে তাকে হাঁ-করা বেকার-কারাগার

এত বড়ো বিচিত্র সংসারে
কোনোই কাজে সে লাগে নাকি ?
তাকে দিয়ে কারো কোনো প্রয়োজন নেই,
সে কি এমনই জঞ্জাল ?
মনে-মনে আশা ছিলো তার
হয়তো কলকাতায় গেলে
কিছু জুটে যেতে পারে।
এ ক'দিন দারুণ রোদ্দুরে
ঘোরাঘুরি করেছে সে ড্যালহৌসি পাড়ায়।
কিছুই হয়নি।
এদিকে এসেছে শেষ হ'য়ে
সামান্য সম্বল।
কাল দেশে ফিরে যেতে হবে।

এর পর
পর-পর যা-কিছু ঘটেছে
গেলো পাঁচ বছরের ইতিহাসে,
তুমি তো ভালোই জানো, শর্মী
প্রুফ-রীডরের
কাজ দিয়ে ঢোকালেম তাকে
আমার আপিশে।
ছ'মাসের মধ্যে তার
ছুটি গল্প বেরুলো আমার
'বাণী' পত্রিকায়।
সাহিত্যজগতে যেন উৎসাহের বন্যা নেমে এলো।
কে এই শশাঙ্ক সেন, নবীন লেখক,
তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা
চারদিকে আবর্তিত
সবচেয়ে মজার যে-কথা
রটেছিলো সে-সময়ে, সেটা এই—শান্তনুবাবুই
অকস্মাৎ ছদ্মনাম নিয়েছেন।
কেননা তখনও
আমার গন্ধটা ওর রচনায়
কিছুটা তীব্রই ছিলো।

পরের বছর
এক লাফে সহকারী সম্পাদক হ'য়ে
শশাঙ্কর নবজন্ম হ'লো।
আপিশে অনেক চোখ অত্যন্ত টাটালো
তোমরাও পছন্দ করলে না।
আমার অনেক কাজ শশাঙ্কর হাতে ছেড়ে দিয়ে
আমি যেন বাঁচলেম।
পনেরো বছর ধ'রে মাসিকপত্রের ঘানি
টেনে-টেনে ক্লান্ত প্রাণ
ঠিক যেন শশাঙ্করই অপেক্ষায় ছিলো।
কাজ তার নিখুঁত নিপুণ,
স্বভাবটি বিনম্র মধুর,
একান্ত নির্ভরযোগ্য, কর্মঠ, উৎসাহী,
যথার্থ সাহিত্যপ্রীতি মজ্জাগত তার।
আমার যতটা সাধ্য মাইনে তার বাড়িয়ে দিলেম,
নাম তার মলাটে প্রকাশ পেলো
আমার নামেরই পাশে।
তোমরা সবাই বললে, 'এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি,'
মাইনে-করা সব-অডিটরের
নাম যে মলাটে ছাপা হয়
কোনো জন্মে শুনিনি এমন কথা !'
আমি শুধু বললেম, 'শশাঙ্ক যে সাহিত্যিক।
আমারই ও সমধর্মী।'

ইতিমধ্যে শশাঙ্কশেখর
অনেক বদলে গেছে।
আপন শক্তির স্বাদ পেয়ে,
উপরন্তু কলকাতার জল-হাওয়ার গুণে
হাবাগোবা ভাব গেছে কেটে।
তবু তার দুর্মর সংকোচ
আমার ড্রয়িংরুমে।
তোমরা যখন আসো
কিছুতেই আসতে চায় না।
আমি ভেবে দেখলেম এ সংকোচে তার
স্বাভাবিক প্রতিভার ক্ষতি হবে।

আপনাকে ছোটো ব'লে ভাবা
অতিশয় মারাত্মক,
তারই ফলে দম্ভের বিকার
মানুষকে বাড়তে দেয় না।
আমি তাই জোর ক'রে আনলেম তারে
গুণীজনসভামধ্যে,
অক্লান্ত উৎসাহে তার মুখ খোলালেম।
কালক্রমে শিখলো সে সকলের সমকক্ষ হ'তে,
যোগ দেয় সকল কথায়,
এমনকি তর্ক করে।

তোমরা সবাই চ'টে গেলে,
বিশেষত তুমি।
কোথাকার কাকে এনে আমাদের আড্ডায় বসানো—
শান্তনুর কাণ্ডজ্ঞান নেই!
দুটো গল্প লিখেছে ব'লেই
কাঁধে তুলে নাচতে হবে কি?
এদিকে তো অশিক্ষিত, পড়াশুনো কিচ্ছু করেনি,
সব-কিছু নিয়েই অথচ
কথা বলা চাই।
—অসহ্য উৎপাত!
এত বেশি উষ্মা যে তোমার
সেটা অহেতুক নয়।
রাজনীতি নিয়ে
অনর্গল উত্তপ্ত বক্তৃতা
যখন চালাতে,
শশাঙ্কই মাঝে মাঝে বাধা দিতো, আপত্তি তুলতো,
আমি ছাড়া আমাদের দলে
আর-কেউ যে-অন্যায় কখনো করেনি।

আমাকে করেছো ক্ষমা
যেহেতু তোমার
বাল্যবন্ধু আমি।
তাছাড়া খ্যাতির মোহ সকলেরই মনে কিছু আছে।

সাহিত্যের খ্যাতিমান
পলিটিক্স নিয়ে যদি বোকার মতোই কিছু বলে,
কিংবা দিগ্বিজয়ী ব্যবসায়ী
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নাম ক'রে
কামিনী রায়ের পদ্য বক্তৃতায় উদ্ধৃত করেন,
তাহ'লেও একেবারে মুখের উপরে
হেসে ওঠে সম্ভব হয় না।
—কী বলো, সত্যি নয়?
অনেক তুমুল তর্কে রাত্তির বারোটা
বাজিয়েছি তুমি আমি,
অনেক অপ্রিয় বাক্য বিনিময় ক'রে
দু'জনেরই হো-হো হাস্যে
তর্কের হয়েছে শেষ।
ধৈর্য ধ'রে তুমি যে আমাকে
সহ্য ক'রে গেছ,
সে কি শুধু আমারই খ্যাতির জন্য?
না, না।
তোমার আমার মধ্যে কুড়ি বছরের
বন্ধুতা কি কিছু নয়?
আমাকে ভালোই বাসতে, তাই
তুমি যে এমন
অসহিষ্ণু, দুর্মেজাজি,
তুমিও আমাকে
অতি সহজেই ক্ষমা করতে পেরেছো।
সত্যি বলো, তা-ই নয়?
এখন যে তুমি
আমার জীবনসীমা ছেড়ে চ'লে গেছ,
এখনো কি আর
মনে-মনে আমাকে বাসো না ভালো!
—সত্যি, তা-ই নয়?

কিন্তু শশাঙ্কর
খ্যাতি নেই, অর্থ নেই কোনো সামাজিক
পটভূমি নেই,
সে তোমার বন্ধু নয়, বরং তোমার

বন্ধুতার ব্যবধানরূপে
লেগেছে তোমার চোখে।
তাকে তুমি হাসিমুখে মেনে নেবে,
এটা আশা করা
এখন বুঝতে পারি ভুল হয়েছিলো,
আমারই সে-ভুল!

আরো তিন বছর কাটলো।
শশাঙ্কর প্রবল উৎসাহে
'বাণী' পত্রিকার
ভাগ্য-তারা মধ্যাকাশে।
সর্কুলেশনের অঙ্ক তিন হাজার থেকে
একেবারে পাঁচ হাজারে ঠেকে-ঠেকে।
শশাঙ্কর মাসান্ত মজুরি
সুসভ্য সমাজে আর অনুচ্চারণীয় নয়,
তার উপর স্বাধীন সাহিত্য-ব্যবসায়
ভালোই রোজগার করে।
প্রতিপত্তি যা-কিছু আমার
ওর জন্যে সম্পূর্ণ করেছি ব্যবহার
সানন্দে, স্বেচ্ছায়;
কেননা আমি যে
ওর মধ্যে প্রতিভার আভাস দেখেছি
সকলের আগে।
ও আমার আবিষ্কার।
ওর উন্মীলিয়মান ক্ষমতার
অনুকূল পরিবেষ রচনার দায়িত্ব আমারই।
সর্বসাধারণ
আজ ওর প্রতিভাকে স্বীকৃতির চিহ্ন যদি দেয়,
আমারই সে জিৎ।

শশাঙ্ক যে সাহিত্যজগতে
আপন স্বাক্ষর এঁকে
আমাকে করেছে জয়ী
এর সার্থকতা
কোনোদিন ভুলবো না।

মনে পড়ে, পর-পর বেরুলো যখন ওর
দুটো ছোটোগল্পের বই,
সে কী স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা,
আনন্দিত কী অভিনন্দন
সমালোচনার
মহলে-মহলে।
কেউ বললে, রবীন্দ্রনাথের পরে হয়নি এমন
ছোটোগল্প লেখা!'
কেউ বললে, 'আধুনিক কথাটার সত্যি কী যে মানে
শশাঙ্কবাবুর গল্প প'ড়ে
এতদিনে বোঝা গেলো।'
কেউ তাকে আখ্যা দিলে ভবিষ্যৎ সাহিত্যের অগ্রদূত,
কারো মতে শশাঙ্কই বাংলা সাহিত্যের মুক্তিদাতা।
উল্টো সুর ধরলেন যাঁরা,
তাঁদের ঈর্ষার বিষ, ব্যক্তিগত আক্রোশের ঝাঁজ
উগ্র হয়ে ফুটে উঠলো গায়ে-পড়া নিন্দায় বিদ্রূপে।
বাংলা দেশেও
ঘটলো এমন অঘটন
সে-নিন্দায় কেউ বড়ো পাতলো না কান,
তখনকার মতো
শশাঙ্করই জয়-জয়াকার।

উৎসাহের প্রথম উচ্ছ্বাসে
শশাঙ্ককে নিয়ে
হয়তো কিছুটা
বাড়াবাড়ি হয়েছিলো।
অমন হ'য়েই থাকে।
সাহিত্য-আসরে কোনো শক্তিমান নবীন লেখক
যখন প্রথম দেখা দেন
সকলেই খুব বেশি ভালো বলে তাকে।
প্রশংসার সে-অতিশয়তা
উৎসাহ দেবারই ইচ্ছা,
কারো কোনো ক্ষতি নেই তাতে।
কিছুকাল পরে
একদা তরুণতম লেখক যখন
মধ্যবয়সের প্রান্তে আসে,

তখন আরম্ভ হয়
যথার্থ পরীক্ষা তার।
সমালোচকেরা
অকরুণ তীক্ষ্ণ চোখে তখন তাকায় তার দিকে।
'লোকটাকে এতদিন ধ'রে
এত যে প্রশংসা করা হ'লো
সত্যি কি সে তার যোগ্য ?
আমাদের সকলকে বোকা বানিয়ে সে
ফাঁকি দেয়নি তো ?'
এমনি মনের ভাব থেকে
সমালোচনার সব যন্ত্রপাতি, অতি সূক্ষ্ম কলকব্জা
বার-বার প্রয়োগের পরে
হয়তো প্রমাণ হয়, লোকটা তেমন-কিছু নয়।

আপাতত শশাঙ্ক যদি বা
পাওনার অতিরিক্ত পেয়ে থাকে,
সেটা তো ভালোই।
এটা মূল্যদান নয়, এটা শুধু তার
তারুণ্যেরে মাল্যদান।
সে-সময়ে এ-কথা তোমাকে
কিছুতেই বোঝাতে পারিনি।
তুমি ছিলে অত্যন্ত অখুশি
শশাঙ্কর আকস্মিক অভ্যুত্থানে।
আমাকে বলতে বার-বার,
'এ-খ্যাতিতে ফাঁকি আছে, সেটা
আর কারো চোখে না পড়ুক,
আমাকে এড়াতে পারবে না।
ওর জন্যে—এমন কী আছে,
যা তুমি করোনি!
কাটা-ছেঁড়া, অদল-বদল
বার-বার হয়েছে তোমারই হাতে।
তারপর ছুটো-একটা ভালো গল্প দৈবাৎ লিখেছে—
তাই নিয়ে এত হুলুস্থুল!
ওর যেটা শক্তি সে তো তোমারই আশ্রয়,
তা না-হ'লে কে ওকে চিনতো!'

উত্তরে বলেছি :
'তুমি কি জানো না
প্রতিভা যে আগুনের মতো,
যত চাপা-পড়া থাক, সব বাধা ঠেলে
কোনো-একদিন ঠিক জ্ব'লে উঠবেই।
দৈবক্রমে আমারই কাছে ও
এসে যে পড়েছে
আমারই সৌভাগ্য সেটা।
আমি যদি না হ'তম, হ'তো অন্য কেউ।'
বলেছিলে বাঁকা হেসে,
'কিছু মনে কোরো না, শান্তনু,
কিন্তু সত্যি তুমি বড়ো খোশামোদপ্রিয়,
আপন স্বার্থের জন্য প্রাণপণে ও তোমার খোশামোদ করে,
তাই তুমি শশাঙ্কবিষয়ে অন্ধ।'

চেয়েছিলে আমাকে আঘাত দিতে।
দিয়েছো আঘাত।
আজও তার চিহ্ন আঁকা আছে মনে।

মনে-মনে জানতেম, শশাঙ্কর পলিটিক্স
তোমার মনের মতো নয়,
তাই এত অপছন্দ ওকে।
এও সত্যি, তুমি
সাহিত্যের ভালো-মন্দ বিশেষ বোঝো না।
ওর খ্যাতি অসহ্য তোমার
ব্যক্তিগত কারণেই।
তার মধ্যে হয়তো ঈর্ষাও ছিলো।
শশাঙ্ককে ভালোবেসে কখনো তোমাকে
দিয়েছি কি না-জেনে আঘাত!
তোমার আমার মধ্যে কুড়ি বছরের
বন্ধুতার অমর্যাদা অজান্তে কি করেছি কখনো ?
যদি তা-ই হ'য়ে থাকে ক্ষমা কোরো—না, না,
তুমি তো নিজেরই হাতে পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নিয়ে
চুকিয়ে দিয়েছো
বন্ধুতার দাম।
আর ক্ষমা চাওয়া কেন ?

তোমার কথার
জবাব অনেক ছিলো,
কিছুই বলিনি।
কেবল বলেছিলেম :
'তুমি যাকে খোশামোদ বলো, আমি তাকে বলি—ভালোবাসা।
এখন তোমার
জানি না বিশ্বাস হবে কিনা,
কিন্তু এটা জেনো, শমী,
শশাঙ্ক আমাকে
সত্যি-সত্যি ভালোবাসতো।
যেদিন প্রথম এলো, সেদিন থেকেই
দেখেছি তা তার চোখে।
তারপর কত কাজে অস্ফুট কথায়
কত ছোটো-ছোটো ঘটনায়
মুখে যা যায় না বলা, শুধু মনে-মনে বোঝা যায়—
লেগেছে আমার মনে তার ভালোবাসা।
এত শ্রদ্ধা, একান্ত বিশ্বাস,
অবিমিশ্র এমন প্রণয়
এ-জীবনে সুলভ যে নয়
ভালোই তা জানি।
তাই আমি তার অনুরাগে
করেছি গভীর শ্রদ্ধা ;
মনে-মনে ভেবেছি, 'হায়রে,
মানুষ হিসেবে
আমি তো নিতান্ত সাধারণ,—
তবু এ আমারই মধ্যে কিছু বুঝি ভালো আছে, সত্য আছে,
সেটুকুই মনের দৃষ্টিতে ওর পড়েছে কি ধরা ?
ও তাকেই ভালোবাসে, আমাকে তো নয়,
তাই ওর প্রীতি মূল্যবান।
আমি সেটা প্রত্যাখ্যান করি, এমন কী সাহস আমার।'

শমী, তুমি জাঁক ক'রে এ-কথাটা সর্বদা বলতে,
সংসারিক বুদ্ধিতে শান্তনু
বালক তোমার তুলনায়।
হয়তো কথাটা ঠিক।

তবু যে তোমার কথা শুনে
শশাঙ্কর প্রেমে
স্বার্থবুদ্ধি-প্ররোচিত স্তাবকতা ভেবে
অবিশ্বাস কখনো করিনি
এটুকুই সৌভাগ্য আমার।
অত্যন্ত বুদ্ধির তাড়নায়
হৃদয়ের অনুরাগে স্বার্থের চক্রান্ত ভেবে
অবজ্ঞা করতে পারি
এত ছোটো আমি নই।
আমার জীবনে
কিছু-কিছু সাড়ম্বর সম্মান পেয়েছি,
বিহ্বল ভক্তের মুখে আপন কীর্তির
বর্ণনা শুনেছি বার-বার—
অতিস্ফীত চবিতচর্বণ!
তাতে তৃপ্তি কই ?
প্রাণ চায় বিশুদ্ধ প্রীতির স্পর্শ,
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়
সভাস্থলে জয়মাল্য নয়।
সে-প্রীতি পেয়েছি,
যখনই, যেখানে,
যেখানেই ভালোবাসা ছুঁয়ে গেছে প্রাণ—
সেখানেই আপনাকে সার্থক জেনেছি।
সেই সব প্রীতির বিক্ষিপ্ত কণা
রেখেছি সঞ্চয় ক'রে নিভৃত অন্তরে
অতি যত্নে।
যদিও বিদ্বেষ
ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো বিষ-দাঁত বের ক'রে
অবিশ্রান্ত ঘুরেছে আমার পিছে—
তবু এ-কথাও সত্য
কেউ-কেউ ভালোও বেসেছে।
আমার জীবনে
যদি কিছু মূল্য থাকে সে-মূল্য তো এই।
তুমি, শমী, তুমিও আমাকে
ভালো যে বেসেছো, তার স্মৃতি
এখনো আমার
কোনো-কোনো অবসর-মুহূর্তেরে
মাধুর্যে রাঙায়ে দেয়

আজ তুমি মনে-মনে ভাবো যদি
সাংসারিক বুদ্ধির অভাবে
ভালোবাসা নামে এক কল্পনায়
অত্যন্ত বিশ্বাস রেখে
আমি ঠ'কে গেছি—
সে তোমার ভুল।
না, আমি ঠকিনি।
ভালোবাসা ছিলো যতক্ষণ
প্রাণ পূর্ণ ক'রে ছিলো।
আজ সেই ভালোবাসা নেই,
শুধু তার স্মৃতি আছে,
তারও মূল্য কম নয়।

শশাঙ্কর উপলক্ষ্যে
তোমার আমার মধ্যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হবে
কখনো ভাবিনি।
কিন্তু তা-ই হ'লো।
আমার আড্ডায়
খ্যাতনামানাম্নীদের দল
এতদিনে উৎসাহিত শশাঙ্ককে নিয়ে।
কেননা এখন সে তো
সদ্য-চাটগাঁ-থেকে-আসা উজবগ বাঙাল আর নয়,
এখন সে রীতিমতো সেলিব্রিটি,—
আধুনিক সাহিত্যের মুক্তিদাতা, ভবিষ্যত সাহিত্যের অগ্রদূত,
শশাঙ্কশেখর সেন।
সে যখন ঘরে ঢোকে
তারই দিকে সবগুলি চোখ
একসঙ্গে ছোটে।
দুর্দান্ত স্বয়ম্ভূ পাল সহজে কাউকে
মানুষ ব'লেই
গণ্য যে করে না,
শশাঙ্কর বন্ধুতায় তারও দেখি বিশেষ আগ্রহ।
এমনকি মল্লিকা গাঙ্গুলি
ফিরতি পথে তুলে নেয় তাকে

নিজের গাড়িতে
মাঝে-মাঝে নিয়ে যায় চৈনিক হোটেলে
জমকালো ডিনারে।

এতটা তোমার
সহ্য করা সম্ভব হ'তো না,
তাই এত সূচনা দেখেই
সংক্ষেপে বিদায় নিলে তুমি।
আমার আড্ডায়
সবচেয়ে নিয়মিত, একবারে অনিবার্য তুমি ছিলে,
সেই তুমি আজ নেই।
কলেজের ছাত্রাবস্থা থেকে
জীবনের প্রতি কাজে, প্রতি দুঃখে সুখে
তোমাকে পেয়েছি সঙ্গী
তোমার সংসর্গ থেকে
নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ভাবতে পারিনি কোনোদিন।
হঠাৎ ছিঁড়লো তার।
আজ বুঝি বছরখানেক হবে
তোমাকে দেখি না চোখে।
জীবনের পরিবর্তনের স্রোতে,
এমন কতই হয়,
একবার যা হয়েছে সেটাই যে চিরকাল হবে
এত বড়ো মোহ আর কিছু নয়—
মনে-মনে এই কথা ভেবে
এটাও নিয়েছি মেনে।
সবচেয়ে আশ্চর্য এইটে
তোমার অভাবে কিছু ঠেকে নেই,
কাজকর্ম, হাসিগল্প, আনন্দ-উৎসব
যেমন চলতো, সবই তেমনি চলছে।

শশাঙ্ক এদিকে
অজস্র উৎসাহ পেয়ে চারদিক থেকে
বসন্তের সবুজ গাছের মতো
প্রাণরসে হিল্লোলিত।
দু'খানা নতুন বই তার
এক সঙ্গে প্রেসে গেছে,
গোটা দুই উপন্যাস

বিভিন্ন মাসিকপত্রে একই সঙ্গে
চলছে ধারাবাহিক।
মনে পড়ে, এ-সময়ে
তাকে শুধু চোখে দেখে মন খুশি হতো।
চোখে মুখে উচ্ছল প্রাণের লীলা,
বুদ্ধির সতেজ দীপ্তি,
স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মধুরতা।
অচেতনতার
অন্ধকার ভেদ ক'রে আপনাকে পেয়েছে যে খুঁজে
তার সুখে সুখী সে এখন।

এই সময়েই
মনের নেপথ্যে তার চলছিলো বদলের পালা,
তখন বুঝিনি।
যখন বুঝলেম—ঢের দেরি হ'য়ে গেছে,
কিছু আর করবার নেই।
একদিন বললেম তাকে,
'এ-মাসের যুগধর্মে তোমার গল্পটা কিন্তু
তেমন জমেনি।'
যে-মুহূর্তে এই কথা বলা
ঘোর কালো হ'য়ে গেলো মুখ,
মুখ নিচু ক'রে
রইলো একটুক্ষণ।
তারপর মুখ তুলে বল্লে, 'আপনি
এ-কথা বলছেন বটে,
কিন্তু যুগধর্ম-সম্পাদক
সাতকড়িপতিবাবু উচ্ছ্বসিত এই গল্প প'ড়ে।
তিনিও তো কম বোদ্ধা নন।'

অত্যন্ত অবাক হ'য়ে
তাকিয়ে রইলেম ওর দিকে।
ওর এই মুখ আমি আগে যেন কখনো দেখিনি।
শশাঙ্ক বলছে এই কথা?

পরমুহূর্তেই
শশাঙ্ক নামিয়ে নিলে চোখ,
আস্তে উঠে চ'লে গেলো।
তারপর দিন কয়
দেখলেম ঐকান্তিক আনুগত্য তার,
চোখ তুলে তাকায় না আমি ঘরে এলে,
যখন যা বলি তারই প্রতিধ্বনি করে
—এটা মোটে ভালো লাগলো না।

কিছুদিন যেতে
বুঝলেম শশঙ্কর মনের গহনে
গোলমাল চলেছে কোনো।
ব্যাপারটা যায় না বুঝিয়ে বলা,
শুধু মনে মনে বোঝা যায়।
শশাঙ্ক যে কোনো
অপরাধ করেছে তা নয়,
কিন্তু কোনো অপরাধ করলেই বুঝি
এর চেয়ে ভালো ছিলো।
অতি প্রিয় পরিচিত সলজ্জ মধুর
যে-ভঙ্গিটি ছিলো ওর
চিহ্নমাত্র নেই তার।
এ-ভঙ্গি ও কোথায় শিখলো?
তার কোনো বর্ণনা যায় না করা,
কিন্তু শুধু তারই জন্যে
ওকে যেন মনে হয় অন্য কেউ।
ভঙ্গিটা কিছুই নয়, ভঙ্গিটাই সব।
যত দীন ততই দাম্ভিক,
প্রশংসা-ভিক্ষুক যত ততই উদ্ধত,
কোন এক প্রচ্ছন্ন আক্রোশে
সর্বদা অস্থির।
স্তম্ভিত হলেম,
শশাঙ্কর এই মূর্তি দেখে।

শুধু ওকে লক্ষ্য ক'রে যাই
কিছুই বলিনে মুখে,
মনে-মনে ওরই জন্যে ভাবনা হয়।
কিছুদিন পরে
যখন দেখলেম তার অসুখী অস্থির ভাব
বেড়েই চলেছে,
কাছে ডেকে একদিন বললেম তাকে :
'দেখছি বড্ড বেশি খাটুনির চাপ
পড়েছে তোমার 'পরে।
মাসখানেক ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করো না,
কিংবা যদি দারজিলিং-এ—'
আমার কথায়
বাধা দিয়ে ফোঁস ক'রে ব'লে উঠ্‌লো,
'পয়সা পেলে খাটতে আপত্তি কিসে?'
মৃদুস্বরে বললেম,
'বাংলাদেশে সাহিত্যের কাজে
পয়সা সবচেয়ে কম।
তুমি তো সে তুলনায় ভালোই পাচ্ছো।'
'ভালো!' বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো শশাঙ্কর ঠোঁটে।
কুৎসিত সে-হাসি।

আর কোনো কথা
হ'লো না সেদিন
কয়েকদিন পরে
পাড়লেম কথাটা আবার।
'আমার বিশ্বাস
কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে
তোমার ভালোই হবে।
দারজিলিংয়ে যদি যেতে চাও, তার সব
ব্যবস্থা দিচ্ছি ক'রে।'
'আমার স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে যেন
বড্ড বেশি চিন্তিত দেখছি।'
'তা একটু চিন্তিত বইকি।
মাঝে-মাঝে বিশ্রাম না নিলে
শরীর টেঁকেনা, মনে মরচে পড়ে।

কলকাতায় ব'সে
বিশ্রাম সম্ভব নয়, তাই বাইরে যাওয়া—'
শশাঙ্ক হঠাৎ
অদ্ভুত বিকৃত স্বরে, যেন জোর ক'রে
আপন মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধের পরে যেন
ব'লে উঠ্‌লো :
'এই ফাঁকে আমাকে তাড়াতে চান?
প্রাণপণে খেটে-খুটে আপনার বাণী পত্রিকার
আশাতীত উন্নতি কি ঘটাইনি আমি?
এখন ভাবছেন মনে, ওকে আর মাসে-মাসে মাইনে দেয়া কেন?
পঁচিশ টাকার
কেরানি দিয়েই
দিব্যি সব কাজ চ'লে যাবে!
আপনার মনের কথা তো এই?'

মিনিটকয়েক
কোনো কথা এলো না আমার মুখে।
তারপর বললেম,
'তুমি জানো এ-কথা সত্যি নয়।'
উচ্চ হেসে শশাঙ্ক বললে,
'কী ক'রে জানবো!
আপনি ক্যাপিট্যালিস্ট, রক্ত-শোষা জাত!
অপরের পরিশ্রমে আত্মবৃদ্ধি আপনার পেশা।
কিন্তু আমি ভুলবো না আর
আপনার সাধুতার ভাণে।
সামনের মাস থেকে আমার মাইনে
একশো টাকা বাড়িয়ে না দেন যদি,
তাহ'লে বাধ্য হ'য়ে
অন্য পথ দেখতেই হবে।'

নিঃশ্বাস ছাড়লেম।
ব্যাপারটা এতক্ষণে বোঝা গেলো।
শশাঙ্কর কথা এ তো নয়!
ওকে দিয়ে এত সব কথা
কে যে বলিয়েছে

তাও অনুমান
করতে পারলেম।
অনুমানে হয়নি যে ভুল,
তুমি জানো, শমী।

দেখাশোনা যদিও হয় না
তোমার খবর কিছু রাখি।
গেলো ইলেক্‌শনে
মন্ত্রী হবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছিলে।
জেলায়-জেলায়
তারস্বরে বক্তৃতা চীৎকার,
চিঁড়ে-গুড় বিতরণ—
দশটাকা-নোটের ছড়াছড়ি
সব ব্যর্থ ক'রে
তোমার পার্টির হার হ'লো।
প্রতিপক্ষ পেলো ক্যাবিনেট।
তোমাদের বিপরীতমতি
মন্ত্রীমণ্ডলের হাতে প'ড়ে
সমস্ত দেশের
কী যে ঘোর সর্বনাশ হবে
সে কথাটা জন-সাধারণে
প্রকাশ করার জন্যে
উপযুক্ত অস্ত্র চাই।
অর্থাৎ—দৈনিক পত্র।
তুচ্ছ কথা ফেনিয়ে-ফেনিয়ে
প্রতিদিন মস্ত কথা বানাবার
উপযুক্ত যন্ত্র চাই।
অর্থাৎ—একটি
ধারালো লিখিয়ে।

তার পরদিনই
শশাঙ্ক আমাকে ছেড়ে চ'লে গেলো।
তার ঠিক এক মাস পরে

দেখা দিলো তোমাদের
পার্টির দৈনিকপত্র 'রবিকর,'
গায়ে তার বড়ো-বড়ো অক্ষরে ছাপানো,
সম্পাদক : শশাঙ্কশেখর সেন।

রবিকরে প্রতি রবিবারে
সাহিত্যের আলোচনা থাকে
অধিকাংশ তার—
আমার নির্জলা নিন্দা।
আমার রচনাগুলি কোন-কোন বৈদেশিক গল্প থেকে চুরি
আমার মোটরগাড়ি কার কাছ থেকে
কী কৌশলে অপহৃত,
ওসমান আলির কাছে কত টাকা ধার ব'লে নিয়ে
প্রতিদানরূপে প্রতিমাসে
তার লেখা ছাপছি 'বাণী'তে
এ-সব গোপন তথ্য সপ্তাহে সপ্তাহে
তোমাদের রবিকর করে আবিষ্কার।
বিবিধ বিচিত্র যুক্তি এঁটে
এইটেই করছো প্রমাণ
শান্তনু বোসের লেখা একেবারে বাজে,
তার উপর লোকটাও সুবিধের নয়।

তোমাদের এ-সব লেখায়—
স্বাক্ষর থাকে না।
কিন্তু ওর পংক্তিতে-পংক্তিতে
অদৃশ্য স্বাক্ষর—
ধরা পড়ে আমার দৃষ্টিতে।
কেননা ও-সব যার লেখা
আমিই তো তাকে
হাতে ধ'রে লেখা শিখিয়েছি।
যা-ই বলো, শশাঙ্ক লিখতে জানে,
কলমের ধার আছে।

রবিকরে রবিবাসরীয়
আসরে আমার নিন্দা শেষ হ'লে

তারপর শুরু হয় শশাঙ্কর স্তুতি।
রবীন্দ্রনাথের পরে
আমাদের সাহিত্যে যে শশাঙ্করই স্থান,
(এমনকি জীবনের বাস্তব রূপের
অঙ্কনে যে শশাঙ্কর কাছে
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পরাজিত)
এই কথা ব'লে শুরু ক'রে
শশাঙ্কর তুলনায়
পূর্ববর্তী অন্যান্য লেখকদের
একেবারে ধূলিসাৎ ক'রে দাও।
বিশেষত আমার উদ্দেশে
বাছা-বাছা খোঁচা থাকে।
সেগুলি যে অবান্তর অর্থহীন
তাতেই তোমার
মনের দুঃসহ জ্বালা ধরা পড়ে।

এই লেখাগুলি স্বাক্ষরিত
কখনো তোমার নামে,
কখনো বা তোমার পার্টির
অন্য-কোনো দিক্‌পালের।
অন্যদের লেখা নিয়ে আমার কিছুই
বলবার নেই,
কিন্তু তুমি যে
এমন নিতান্ত বাজে লেখা
ছাপাতে পাও না লজ্জা,
এতে সত্যি দুঃখ হয় মনে।
জানি, তুমি ব্যস্ত নানা কাজে
দু'ঘণ্টা নিবিষ্ট হ'য়ে বসবার
সময় তোমার নেই—
তা-ই যদি, তবে লেখো কেন ?
সাহিত্যচর্চার চেয়ে অনেক জরুরি
তোমাদের দেশোদ্ধার কাজ।
তা-ই নিয়ে থাকো।

লেখার দরকার হ'লে
ওস্তাদ লিখিয়ে ভাড়া ক'রে
ইচ্ছেমতো নেবে তাকে দু'বেলা খাটিয়ে।
এটা তো নতুন কিছু নয়।
তোমরা রাজনৈতিকেরা
যখন যা দরকার উপযুক্ত দামে
ভাড়া ক'রে থাকো সবই
সম্পাদক, গুণ্ডা, বেশ্যা, সন্ন্যাসী, লেখক।

শশাঙ্ক আজকে
তোমার পোলিটিকাল ছ্যাকরা গাড়িতে
দু' বেলা খাটছে ভাড়া।
আশা করি দানাপানি জুটছে ভালোই।
তোমাদেরই দলের লোক সে আজ
তাই ওর সাহিত্যপ্রতিভা
এতদিনে তুমি
দেখতে পেয়েছো।
আমি বলবো এটুকুই ভালো।
শশাঙ্কর যত খ্যাতি হবে
তোমাদের পার্টির সুবিধে তত,
তাই তুমি মার্কিন টেক্‌নীকে
ফাঁপিয়ে তুলেছো ওকে।
অবাক হবার এতে কিছু নেই।
আমার লেখার সঙ্গে আজ
মেলে না তোমার পলিটিক্স,
তোমার অশ্রান্ত চেষ্টা তাই
লোকচক্ষে আমাকে অত্যন্ত হেয় করা।
এতেও অবাক
হবার কিছু নেই।
সকলেই জানে
কিছুই অন্যায় নয় প্রেমে, যুদ্ধে, পলিটিক্সে।

যাক, যা হয়েছে,
ভালোই হয়েছে।
অন্তত ভালো ব'লে মেনে নেয়াটাই
ভালো মনে করি।
শুধু একটি কথা
তোমাকে জানাতে চাই।
তুমি রাজনীতির আবর্তে পড়ে
যা-কিছু করেছো তার দাম
হয়তো পাবে হাতে-হাতে,
কিংবা হয়তো তার দেনা
নিঃশেষে মেটাতে গিয়ে দেউলে হ'তে হবে।
ও-সব বুঝিনে আমি।
আমার জীবনে
ওর কোনো মূল্য নেই, মানে নেই।
কিন্তু তুমি
রাজনীতি-রঙ্গমঞ্চে
যত বড়ো ধুরন্ধরই হও
তবু তুমি সেই—
সেই শমী।
আমার সাহিত্য-সাধনার
কিছু মূল্য থাক কিংবা নাই থাক,
তোমাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে
নিতান্ত তুচ্ছও যদি প্রতিপন্ন হই,
তবু আমি সে-আমিই আছি।
এই কথাটাই
এখনো পারিনে ভুলতে।
তুমি কি পেরেছো?

অভিজ্ঞান-বসন্ত ও আধুনিক কবিতা

সন্তোষকুমার প্রতিহার

[১]

হাল আমলের সাহিত্যের সমালোচনা করা যে একটা কঠিন কাজ, এ বিষয়ে সুধীমহলে মতান্তর নেই। কোন সাহিত্যচেষ্টাকে পুরোপুরি বুঝতে হলে তার আশেপাশের অনেক খবর আমাদের জানা দরকার। আমরা অতীত যুগের সম্বন্ধে যত কথা জানি, বর্ত্তমান যুগের সম্বন্ধে তত কথা জানি না, আর যেটুকু জানি তারও ঠিক অর্থ বুঝি না, ফলে আমাদের চোখে আমাদের নিজেদের যুগের চেহারাটা যত ঝাপসা, অন্য যুগের চেহারা ততটা ঝাপসা নয়। বর্ত্তমান যুগের ব্যূহের মধ্যে আবদ্ধ বলেই আমাদের যুগ সম্বন্ধে আমরা এত বেশী অজ্ঞ। কালের তুলাদণ্ডে প্রাচীন সাহিত্যের একটা মূল্য স্থির হয়ে গেছে, বহু মন তার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, বহু মনীষী তাদের নিকষ-পাথরে তাকে ক'ষে দেখেছেন। সে সাহিত্যকে যখন আমরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করি, তখনও আমরা বাইরে থেকে অনেক সাহায্য পাই। সে সাহিত্যের প্রতি আমাদের চিত্তে একটা পূর্ব্বরাগের ভাব বিদ্যমান থাকে; বহুলোকে তাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেছে, এই বোধ আমাদের মধ্যে একটা শ্রদ্ধাযুক্ত আত্মনিবেদনের ভাব নিয়ে আসে, যার জন্য সে সাহিত্যের অন্তরে প্রবেশ লাভ সহজসাধ্য হয়। আধুনিক সাহিত্যের আলোচনার পথের এই সকল প্রতিকূলতার কথা বিবেচনা করেই সকল দেশের সাহিত্যবিচারকরা সে-সাহিত্য সমালোচনার সময় একটি সঙ্কোচ ও দ্বিধার ভাব প্রকাশ করেছেন, অনেকে বা সে-কাজ থেকে বিরত হয়েছেন।

কিন্তু সমালোচকরা সমালোচনা করতে বিরত হলেও কবিদের কাব্যসৃষ্টির বিরাম ঘটে না। জীবনের স্রোত কোন জায়গায় এসে থেমে যায় নি। সে শতধারায় বয়ে চলেছে। "সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবননির্ঝরিণী।" বাস্তব জীবনে আমরা পদে পদে দেখতে পাই জীবনের নূতন নূতন বিস্ময়কর অভিব্যক্তি, জীবনের যে অভিব্যক্তি পূর্ব্ব যুগের কোন মহাকবিরই কল্পনায় স্থান পায় নি। জীবনের এই অভিব্যক্তির ধারার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ব'য়ে চলে সাহিত্যের অভিব্যক্তির ধারা। আমাদের বাস্তব জীবনকে যে পর্য্যন্ত না কবিরা কাব্যের ছন্দে গেঁথে তোলেন, সে পর্য্যন্ত বস্তুলোকের ভার আমাদের কাছে দুঃসহ হয়ে ওঠে। আমাদের ধরিত্রী একদিন একটা অগ্নিপিণ্ড ছিল,

* অভিজ্ঞানবসন্ত: অমিয় চক্রবর্তী। দেড় টাকা

ক্রমে ক্রমে ধরাপৃষ্ঠ শীতল হয়ে এল, তাতে কচি কচি ঘাসের শ্যামল আস্তরণ দেখা দিল। কোথায় গেল ধরিত্রীর সে দাবদাহ, সে তপ্তশ্বাস; সে হয়ে উঠল মানুষের প্রিয় আবাসভূমি। কবিরাও যে দিন আমাদের বাস্তব জীবনের উপর তাঁদের কল্পনার স্নিগ্ধ আলোক ফেলেন, তখন দূরে সরে যায় তার ভাব, আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে তার অপূর্ব্ব রূপ। সে দিন আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি, একটা অনির্ব্বচনীয় মুক্তির আস্বাদ পাই। বাস্তব জীবনের বস্তুপুঞ্জের কুহেলিকাজাল আমাদের চিত্তকে বিভ্রান্ত করে, যে পর্য্যন্ত না কবিপ্রতিভা তাদের উপর ঐক্যের সুষমা বিস্তার করে। কবিরা আমাদের মুক্তি দেন অপ্রকাশের ছায়ালোকের কারাগার থেকে। অভিজ্ঞানবসন্তের কবির ভাষায় বলি:

নর্ত্তকী পারমিকা
বহি প্রথম তৃণশিখা
টুটি কুজ্ঝটিকা
জাগে,
ছায়াজয়ী জাগে।

এই নর্ত্তকী পারমিকার নূপুরনিক্কণ কবিদের কাব্যে শোনা যায়, এই নূপুর-নিক্কণ বস্তুলোককে উত্তীর্ণ করে রূপলোকে, বস্তুপিণ্ডের দুর্বহ ভার হরণ করে, যেমন অভিজ্ঞানবসন্তের উর্ব্বশী কবিতার ভিখিরি ইটালিয়ানের ব্যারেল অর্গ্যানের সুর তার মোহ বিস্তার করেছে লণ্ডনের ককনি খবরঅলার চীৎকার, থিয়েটারের লক্ষ আলোর শীৎকার, দৈত্য বাড়ি-গাড়ির ঘনবন্দী সারের উপর, এবং হরণ করেছে প্রচণ্ড ইউরোপের ভার।

সভ্যতার ইতিহাসে আমরা মাঝে মাঝে যুগপরিবর্ত্তন দেখি, যেদিন সভ্যতা তার পুরাতন কলেবরকে জীর্ণ বাসের ন্যায় পরিহার ক'রে নূতন কলেবর ধারণ করে। সভ্যতার এই ঋতুপরিবর্ত্তনের ক্ষণটি মানুষের ইতিহাসে একটি সঙ্কটকাল। পুরাতন সভ্যতাকে সে হারিয়েছে, নূতন সভ্যতার সঙ্গে তার কাজের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু সে সভ্যতা তার আত্মীয় হয়ে ওঠে নি, তার সঙ্গে হৃদয়ের মিতালি ঘটেনি; সেদিনের সভ্যতার কোলে সে স্থান পায় প্রবাসীর মত, নূতন সভ্যতার বিরাট অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তার কাছে বিভীষিকার মত হাজির হয়। তাঁরাই হলেন সে-যুগের আধুনিক কবি, যাঁরা এই নূতন সভ্যতাকে মানুষের আপনার জিনিস করে তোলেন, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে রূপের প্রসাদ বিতরণে মানুষের প্রিয় করে তোলেন। "একস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষা" বশে কবিরা যেমন জগতের সমস্ত খণ্ড সৌন্দর্য্যকে এক অখণ্ড সৌন্দর্য্যপ্রতিমার মধ্যে দেখতে চান; শ্রাবণে দিগন্তপারে মেঘভারে যে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দেখা দেয়, তা মানসসুন্দরীর চক্ষে

'না জানি ধরে কেমন আকার' তা দেখবার জন্য যেমন উৎসুক হয়ে ওঠেন, সাধারণ মানুষও দেখতে চায় তার লৌকিক জীবনকে কাব্যের অলৌকিক ভূমিকার মধ্যে, সেও দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে তার লোকায়তিক জীবনের সাজবেশ চারুকলা লোকাতীত আশ্রয় পেয়ে কি রূপ ধারণ করে। যে পর্য্যন্ত না নূতন সভ্যতার বিপুল সাজসরঞ্জাম, তার অভিনব আয়োজন-প্রয়োজন শিল্পীর তুলিকার রঙে রঙীন হয়ে উঠে, ততদিন একটা দিগন্তজোড়া নিরানন্দ ও ব্যর্থতার ভার সারা সমাজের বুকে চাপাসর্দ্দির মত চেপে থাকে। মানুষ উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করে সেই আধুনিক কবির জন্য যিনি হাজির হবেন মুক্তিদূতরূপে, যিনি তার এই প্রবাসদুঃখের অবসান ঘটাবেন। অভিজ্ঞানবসন্তের কবি আধুনিক যুগের মন্ত্রধারাকে, আধুনিক যুগের জীবনযাত্রাকে কাব্যের ছন্দে গেঁথে তুলে আমাদের এই অব্যক্ত সন্ধিৎসাকে কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ করেছেন, আধুনিক জীবনের "ধূলিজালে গীতরসধারা সিঞ্চন" করেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের নূতন পথের পথিকৃৎ; তিনি সাহিত্যের সার্থকতার যে নূতন পথ খুলে দিয়েছেন সে-পথে অনুযাত্রীদের অভাব হবে না, যাঁরা আধুনিক যুগের জীবনধারা ও মননধারা শিল্পরূপে রূপায়িত ক'রে আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে আমাদের চিত্তের অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ঘটাবেন। আধুনিক সাহিত্যের নিগূঢ় তাৎপর্য্যের কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। এই তাৎপর্য্যের প্রতি অবহিত না হয়ে যেন নূতনের প্রতি যে বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা মানব প্রকৃতিতে স্বাভাবিক, সেই পূর্ব্ববিরাগবশে এই সাহিত্যচেষ্টাকে হেয় না ভাবি, যেন ভুলে না যাই যে he laughs best who laughs last, যেন আধুনিক সাহিত্যের এই সুমহৎ প্রয়াসকে উপহাস ক'রে মহাকালের বিচারে আমরা নিজেরাই উপহাসাস্পদ বলে ধিক্কৃত না হই।

সব যুগেই আধুনিক কবিরা ঐতিহ্যের বন্ধন কাটিয়ে নিজেরা নূতন পথ কেটে চলতে সুরু করেন। তাঁদের বিষয়বস্তু নূতন, প্রকাশভঙ্গী নূতন; ভাষা, ছন্দ, উপমা, অলঙ্কার সকলের মধ্যেই একটা অভিনবত্বের আস্বাদ পাই। অভিজ্ঞানবসন্তের কবি এই সর্ব্বতোমুখ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন; তিনি নিজেকে গতানুগতিকতার অপচ্ছায়া থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য আমাদের ঐতিহ্যবদ্ধ মন পদে পদে এই অভিনবত্বের চমক বরদাস্ত করতে পারে না; এই চমকের অন্তরালে যে চমৎকারিত্ব লুকানো আছে, তা খুঁজে বের করার মত ধৈর্য্য আমাদের নেই। কিন্তু ঐ পথই যে সার্থকতার পথ একথা আলঙ্কারিকেরা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন। "সন্তি নবাঃ কাব্যার্থাঃ, পরোপনিবদ্ধার্থবিরচনে ন কশ্চিৎ কবের্গুণ ইতি ভাবয়িত্বা পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসঃ সুকবেঃ সরস্বত্যেষা ভগবতী যথেষ্টং ঘটয়তি বস্তু।

সৈব ভগবতী সরস্বতী স্বয়মভিমতমর্থমাবির্ভাবয়তি। যেন হি মহাকবিস্বং মহাকবীনাম্।" [ভাবানুবাদ : প্রতি যুগ নিয়ে আসে সাহিত্যের, শিল্পের নব নব রসপ্রেরণা। পূর্ব্বসূরীগণ যে কাব্যার্থ সৃষ্টি করে গেছেন, নিজের কাব্যগ্রন্থে সেই জ্ঞাতাস্বাদ কাব্যার্থের পুনঃ পরিবেষণ সার্থক সৃষ্টির পথ নয়, এই ভেবে যে সুকবি পরের সোনা কানে দিতে বিরত হন, কাব্যলক্ষ্মী স্বয়ং তাঁর অন্তরে আবির্ভূত হন তাঁর সকল ঐশ্বর্য্য নিয়ে, তাঁকে জুগিয়ে দেন মনোমত বিষয়বস্তু, তাঁর বাণীকে ভরে দেন অভিমত অর্থময়তায়। এই পথেই মহাকবিদের প্রতিভা সার্থকতার সন্ধান পায়।]

অভিজ্ঞানবসন্তে কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ কবিতা রয়েছে; তাদের ছন্দস্বাচ্ছন্দ্য আমাদের অন্তরে নিঃসংশয় প্রতীতি জন্মায় যে কবি একজন ওস্তাদ ছান্দসিক। কিন্তু এ বই-এর অধিকাংশ কবিতা গদ্য কবিতা। ছোট গল্পের পরিচয় দিতে যেয়ে বীরবল বলেছেন তা ছোট ও বটে, গল্প ও বটে। গদ্যকবিতার পরিচয় দিতে হলে বলতে হয় যে তা গদ্যও নয়, কবিতাও নয় অর্থাৎ তার শব্দযোজনার মধ্যে গদ্যের logical mould নেই, কবিতার rhythmical mould নেই; অথবা তা গদ্যও বটে, কবিতাও বটে অর্থাৎ তা গদ্যের মত পায়ে হাঁটে আবার কবিতার মত রসলোকে গিয়ে পৌছায়। সশরীরে পায়ে হেঁটে স্বর্গে পৌছান যেমন সবার মধ্যে কুলোয় না, তেমনি গদ্যকবিতা রচনা করা যারতার কাজ নয়। যে মেয়ের চুল সুন্দর নয়, তারও মুক্তাজালগ্রথিত, কুসুমদামখচিত, ধূপধূম্রচর্চ্চিত সুরচিত বেণী পুরুষের চোখে ধোঁকা দিতে পারে কিন্তু এলোচুলে তার চুলের সৌন্দর্য্যের দৈন্য চট করে ধরা পড়ে। ছন্দোঝঙ্কারমুখরিত, উপমা-অলঙ্কারভূয়িষ্ঠ কবিতার কারুকার্য্য-খচিত ভাষার ঐশ্বর্য্য তার আভ্যন্তরীণ দৈন্য লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু নিরাভরণা গদ্যকবিতা যদি স্বসমুখ রসের ধারায় অভিষিক্ত না হয়, তা হলে তার সে দৈন্য "ঝটিত্যবভাসতে" হাতে হাতে ধরা পড়ে। যাঁরা সত্যিকারের কবি নন, সেই মন্দঃকবিযশঃপ্রার্থীর দল গদ্যকবিতার ক্ষেত্রে সুবিধা করতে পারবেন না। ছন্দোবদ্ধ কবিতার যদি উপমান হয় নাচ ও গান, গদ্যকবিতার উপমান হবে চলা ও আলাপ, অর্থাৎ গদ্যকবিতায় কড়াকড় কোন বন্ধন নেই কিন্তু নিয়ম সংযম থেকে তা একেবারে মুক্ত নয়। যদিও সুনিয়ন্ত্রিত পর্ব্বপর্ব্বাঙ্গবিন্যাস গদ্যকবিতায় নেই তথাপি গদ্যকবিতা পর্ব্ববিভক্ত এবং পর্ব্বগুলোর মধ্যে একটা ক্ষীণ মাত্রাসমকত্বও বিদ্যমান রয়েছে। গদ্যকবিতার ছন্দ বাংলা অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দের একটা বৃহত্তর, মুক্ততর প্রতিরূপ, অবশ্য তার মধ্যে মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্তের পর্ব্ব যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না তা নয়; কেননা গদ্য কবিতার সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা অসাধারণ। বাল্মীকি দেবনদী গঙ্গার বর্ণনায় বলেছেন যে কোথাও সে নদী "বেণীকৃতজলা", কোথাও

বা "আবর্ত্তশোভিতা", কোথাও "স্তিমিতগম্ভীরা", কোথাও বা "বেগসম্যাকুলা", কোথাও বা "গম্ভীরনির্ঘোষা", কোথাও বা "ভৈরবনিঃস্বনা", কোথাও "নির্ম্মলফেনহাসিনী", কোথাও বা "জলাঘাতাট্টহাসোগ্রা"। গদ্যকবিতার রচনারীতির মধ্যে এমনি একটা বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যায়, কোন পর্ব্বটি দু মাত্রার, কোনটি বা দশমাত্রার, কোন পর্ব্বটি একেবারে নির্ভেজাল গদ্যের পর্ব্ব, কোনটি বা আবার যুক্তবর্ণের সংঘাতমুখর ধ্বনিগৌরবভূয়িষ্ঠ খাঁটি অক্ষরবৃত্তের পর্ব্ব, কোথাও বা পর্ব্বগুলি কেবল অন্ত্যানুপ্রাসের জোরেই ছন্দোধর্ম্মবিশিষ্ট। বলা বাহুল্য একটি সহজাত সদাজাগ্রত রসবোধই এই বিচিত্র উপাদানকে অস্পষ্ট একটা কাঠামোর ঐক্যের মধ্যে বেঁধে রাখতে পারে; অকবির হাতে এই পর্ব্বগুলির সূক্ষ্মভারসাম্যটি লঙ্ঘন করার সম্ভাবনা খুবই বেশী। গদ্যকবিতাকে পর্ব্বে বিভক্ত করা যায়, যেমন গদ্যকে করা যায়; গদ্যের মতই গদ্যকবিতার মধ্যে পর্ব্বাঙ্গবিন্যাসের কোন বালাই নেই কিন্তু যদি কোথাও মাঝে সুনিয়ন্ত্রিত পর্ব্বাঙ্গবিন্যাস থাকে, তাতে গদ্যকবিতার কোন ক্ষতি নাই যদিও গদ্যের মধ্যে সে রকম পর্ব্বাঙ্গবিন্যাস গদ্যরীতির বিরোধী। গদ্যকবিতায় পর্ব্বের শেষে সুস্পষ্ট যতির ফলে যে দীর্ঘ অবকাশ পাওয়া যায়, তা গদ্যে পাওয়া যায় না; গদ্যকবিতার বিলম্বিত লয়ও গদ্যে পাওয়া যায় না; গদ্যে পর্ব্বগুলো চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে বাক্যগুলো, গদ্য কবিতায় চোখে পড়ে পর্ব্বগুলো, বাক্য সেখানে আছে কি না লক্ষ্য করি না। মোটের উপর গদ্যকবিতার ছাঁদ গদ্য বা পদ্য দু-এর ছাঁদ থেকে স্বতন্ত্র।

[২]

এ-বই-এর কবিতাগুলিকে বিষয় অনুসারে কবি বিভিন্ন ভাগে চারিয়ে দিয়েছেন। এ-প্রবন্ধে প্রত্যেক ভাগের দু' একটা কবিতার পরিচয় দেবার প্রয়াস পাব। প্রথম ভাগের নাম প্রাথমিক। যে সকল বিষয় নিয়ে কবিতা-গুলো লেখা—যেমন পাহাড়, সাগর, মরুভূমি, জল, হাওয়া—তারা এখনও রয়েছে, আদিম যুগেও ছিল। এ সবকে কবি দেখেছেন আদিম মানবের বিস্ময় নিয়ে। যে হাওয়া গাছ ওপড়ায়, সমুদ্র ঝাঁকায়, সেই মরুর শিমুম রৌদ্ররাগী হাওয়া আবার জুঁই ফুলের চারধারে কচি কুঁড়ি নাড়ে, মোমবাতির আলো ঠেলে,—হাওয়ার এই বিচিত্ররূপ ও কামচারিত্ব কবিকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। হাতে একমুঠো জল নিলে তা আঙুলের ফাঁকে মুক্তোর মত টলমল করে ঝরে যায়, পদ্মপাতার উপর হীরে রোদ্দুরের ছোঁয়া লেগে ঝিক্‌ঝিক করে ওঠে, সন্ধ্যার বাগানে ঝারিতে জল দেয় আর কচি ডালগুলি স্নাত স্নিগ্ধ পরিতৃপ্ত হয়ে উঠে—এই সব "চূর্ণ চূর্ণ প্রত্যক্ষ বিস্ময়" কবি আমাদের

অনুভবগম্য ক'রে তুলেছেন। অন্ধগলির বদ্ধ হাওয়ায় বন্দীপ্রাণের শৈলশিখরের মুক্ত বায়ুপ্রবাহের জন্য যে অন্তর্গূঢ় ক্রন্দন তা 'রুদ্রাক্ষর' কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে। এই কবিতার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমরা দেখি যে আমাদের গুহাশায়ী বিরাট প্রাণ যেন পাখা মেলছে, উপরে ওঠার নেশা তাকে পেয়ে বসেছে, আফগান, ইরান, হিন্দুকুশের পর্ব্বতমালার বিচিত্র দৃশ্য তার মধ্যে একটা ফেনিল উন্মাদনা সঞ্চার করেছে, তার নগাধিরাজের মহামহিমময় রূপ দেখে সে একটা অপূর্ব্ব চিত্তবিস্তার অনুভব করেছে; তারপর দেখি মাদকতার নেশা মৃদু হয়ে এসেছে, সে ডানা গুটিয়ে সবিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে দাক্ষিণাত্যের গিরিমালার দিকে; তার পর যেন উর্দ্ধারোহণব্যাকুলতা অন্তরে নিয়ে মাটিতে নেমে এসেছে। 'রুদ্রাক্ষর' কবিতা এই বই-এর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। ছন্দোবদ্ধ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটির যথাযথ আবৃত্তির ফলে আমরা বুঝতে পারি ছন্দের ব্যঞ্জনাশক্তি কতদূর পর্য্যন্ত যেতে পারে। 'অন্তিক' কবিতাটি এ-বই-এর আর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। আলঙ্কারিকেরা ধ্বনিকাব্যকে শ্রেষ্ঠকাব্য ব'লে অভিহিত করেছেন। ধ্বনিকাব্যে যা বলা হয়েছে তাকে আশ্রয় ক'রে কিন্তু আচ্ছন্ন ক'রে এমন একটা জিনিস আভাসে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত হয় যা স্পষ্ট কোথাও বলা হয় নি। কবি বলেছেন

দ্রাক্ষাকুঞ্জনমিত পথ গেছে
তোমার দিকে
—হ'ল অদৃশ্য।
বনকীর্ণ শ্যামলকম্পিতরুদ্রতরঙ্গ
—তোমার পটদুগান্তে হল বিলীন।
ছিল ঝর্ণার প্রাণমঞ্জীর বাহিনী—
নেই, নেই।

এ-কয়েকটি ছত্রে কবি যা বলেছেন, তাকে তিরস্কৃত ক'রে পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা সৌন্দর্য্যের শ্রেণীবিভাগে যার নাম দিয়েছেন sublime সেই sublime-এর ধ্বনি আমাদের চিত্তে ঘা দেয়। এ-কয়েকটি ছত্রে মরুভূমির একটি অধৃষ্য দীপ্তগম্ভীর রূপ ফুটে উঠেছে। একটা অসীম অমোঘশক্তি যেন এক মায়াগণ্ডী টেনে তার অলজ্ঘ্য অনুশাসন প্রচার করেছে—thus far and no farther; তার সেই ভ্রূকুটি-ভয়াল নিষেধ সমগ্র বিশ্বকে দূরে অপসারিত ক'রে রেখেছে, কুমারসম্ভব কাব্যে নন্দীর মুখার্পিত অঙ্গুলিসঙ্কেতে সমগ্র বনভূমির অকালবসন্তের চাঞ্চল্য শুদ্ধ হওয়ার বর্ণনায় আমরা যে 'সাব্লাইম' রসের আস্বাদ পাই, এই অন্তিক কবিতাতে সেই রসের আস্বাদ পাই।

দ্বিতীয় বিভাগটির নাম প্রদক্ষিণ। ভ্রমণের স্মৃতি অবলম্বন ক'রে এই বিভাগের কবিতাগুলি লেখা। সৌখীন ভ্রমণ-শীর্ষক কবিতায় জাভা, মালয়,

চীনের কাল্পনিক ভ্রমণের কথা বলা হয়েছে। এ-বিভাগের কবিতাগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন জায়গার বৈশিষ্ট্যটি স্বল্প পরিসরের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কবিতাগুলিতে 'স্থানীয় রঙে'র পরিচয় পাই। যেমন চমনের রুক্ষধরণী,

শৈল সমাজলোকালয়, উট, কারাভান,
কালো তাঁবু বেদুইনের।

'ইরাণ' কবিতায় আধুনিক সমস্ত ছোঁয়াচ বর্জ্জিত পাহাড়ে-ঘেরা নিভৃত গ্রামের ঝর্ণার ধারে তৃণাকীর্ণ উইলোমর্ম্মরিত পথে যখন একজন 'টুরিস্ট' দেখা দিল, তখনকার সেই উৎকট অসামঞ্জস্যটি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'টুরিস্টে'র আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের বস্তুতান্ত্রিক বর্ণনা এই অসামঞ্জস্যকে ফুটিয়ে তুলেছে, নতুবা সে বর্ণনা কবিতার পক্ষে ভারস্বরূপ হোত এবং তার মধ্যে কেবল চমক থাকত, চমৎকারিত্ব থাকত না। 'হাইফা' কবিতায় বারুদাগ্নি ইউরোপ থেকে পলাতক ইহুদী মেয়েটির ('মন তবু বাঁধা স্বপ্নের হিমে ভরা কোন পশ্চিমে') ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিটির বর্ণনা অতীব মনোজ্ঞ। আধুনিক সভ্যতার উৎকট যানবাহনগুলো তার সে ধ্যান ভাঙাতে পারল না, যেমন দুর্বাসার "অয়মহংভো" এই ভৈরব নিঃস্বন ধ্যানরতা শকুন্তলার ধ্যান ভাঙাতে পারেনি।

সাম্রাজ্যদর্শী জাহাজের উঁচু নাক,
স্টীমার, মাস্তুল, জেটির জটলা,
সাইপ্রাস্ থেকে সওদাভরা নৌকো, তেলের ট্যাঙ্ক
প্রকাণ্ড ক্রেনে মালতোলা

এই রকম কতগুলো বিকট পদার্থের বর্ণনার আঘাত থেকে কবি মৃদুকাব্য-শরীরকে রক্ষা করেছেন কি করে—এ-রকম প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগা স্বাভাবিক। আলঙ্কারিকের ভাষায় জবাব দেওয়া যায় যে "নাস্ত্যেব তদ্বস্তু যৎ সর্বাত্মনা রসতাৎপর্য্যবতঃ কবেস্তদিচ্ছয়া তদভিমতরসাঙ্গতাং ন ধত্তে"। এমন বস্তু নেই যা রসতৎপর কবির ইচ্ছায় তাঁর অভিমত প্রকাশোপযোগী অঙ্গত্ব না ধারণ করে। এই উৎকট পদার্থগুলিকে ধ্যানের গভীরতার মাপকাঠি হিসাবেই ব্যবহার করা হয়েছে, এদের সাহায্যেই রস অভিব্যক্তি পেয়েছে, এরা রসের বহিরঙ্গ নয়। অভিজ্ঞানবসন্তে অনেক জায়গাতেই পাঠকের মনে হোতে পারে যে এখানে যে বর্ণনা আমদানী করা হয়েছে, চমক লাগানো ছাড়া তার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারব যে এ বর্ণনা ও "চারুত্বাতিশয়ং পুষ্ণাতি", কাব্যের চারুত্বকেই পুষ্ট করেছে।

তার পরের বিভাগটির নাম "সূর্য্যগণ্ডিত ছায়া"। কবি বলেছেন যা আকস্মিক তাকে যেন চিরন্তনের স্থানে বসিয়ে আমাদের আত্মা পরাজয়

স্বীকার না করে, আমরা ছায়াকে সত্য ভেবে যেন সূর্য্যকে মিথ্যা না ভাবি। কম্যুনিস্টরা যে দানবের সঙ্গে লড়াই করছেন তাকে পরাস্ত করা দরকার সংঘবদ্ধ শক্তির সাহায্যে কিন্তু সে জীবনে যেটুকু স্থান অধিকার ক'রে আছে, তার বেশী স্থান অধিকার করেছে ভেবে বিভ্রান্ত যেন না হই। 'কালের ভূত' কবিতাটি একটি উপভোগ্য কবিতা। 'সংগতি' কবিতাটির মধ্যে একটি বলিষ্ঠ আস্তিক্যবুদ্ধির পরশ পাই, কবির নিষ্ঠার সংক্রামণ আমরা নিজেরাও অনুভব করি। কবি যেভাবে অসঙ্গতিগুলি বেছে নিয়েছেন, তা তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও মৌলিকতার পরিচায়ক। 'হরেকৃষ্ণর যুক্তি' কবিতায় কবি বলেছেন যে নাবালকের মত magic-এ ভরসা না রেখে যেন আমরা প্রাপ্ত-বয়স্কদের মত logicএর উপর নির্ভর করি, আমরা যেন সব জিনিসকে তালপাকিয়ে খিচুড়ি না বানাই, যুক্তিবিরোধী অসঙ্গত দাবী সব পোষণ ক'রে নিজেদের বিড়ম্বিত না করি। গাধার উপমাটা বেশ উপযোগী হয়েছে। 'তিনপ্রশ্ন' কবিতাটিও বেশ উপভোগ্য ও আস্তিক্যবুদ্ধির পরিচায়ক। 'আটপৌরে' কবিতায় সেই জাতীয় নায়ককে নিয়ে কবিতা রচনা করা হয়েছে যাদেরকে উচ্চ কাব্য পরিহাস করে এসেছে, যাদের ছেঁড়া উড়ো প্রাণের কাহিনী কবিরা তাঁদের কাব্যলোক থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন, যাদেরকে স্বীকার করলে ধ্যানের প্রশান্তি নষ্ট হয়। অভিজ্ঞানবসন্তের কবি বেহেস্তের এই ফাউকে সেলাম জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গদ্যকবিতা সমস্তকেই আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়, স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।

চতুর্থ বিভাগটির নাম "মন-মাধ্যাহ্নিক"। আধুনিক যুগের যে মননধারা দীপ্তশিখায় জ্ব'লে উঠেছে, তাকে নিয়ে কবি এ বিভাগের কবিতাগুলি রচনা করেছেন। 'কথা' কবিতায় কবির সূক্ষ্ম সুকুমার ভাষানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। যে দুর্ঘট শব্দযোজনায় প্রয়াসকে দান্তে panther quest নাম দিয়েছেন, 'অনির্ব্বচনীয়' কবিতায় সেই প্রকাশ-বেদনা রূপ পেয়েছে। 'অ্যাক্সিডেন্ট' কবিতাটি আধুনিক কবিতার একটি চমৎকার উদাহরণ। তার সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ করে দেখবার অবকাশ এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে পাওয়া যাবে না। এই অধ্যায়ের অন্যান্য কবিতায় কবি আধুনিক মনস্তত্ত্বের মুখ্যধারাকে যে অপরূপ শিল্পিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন তা পাঠক কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকেই বুঝতে পারবেন।

উন্মাদ অন্ধকার মনের ঘুম
যার তলে এখনো জাগরণ জড়িয়ে জটিল হয়ে
বইচে দিক্‌হীন স্রোতস্বিনী।

* * *

স্বচ্ছবোধনের
মনোবিকলনের
শোধনশুভ্রবেগে আনো সেই ধারাকে

* * *

চলো ঘুমের স্বপ্নাভ পথে
মহামনোরাজ্যে—
সেখানে ম্লানতায় স্তিমিত তারা
নীহারিকা
তন্দ্রায় জাগছে বেগক্রিয়াবান

* * *

পরিচয় দেখতে নামব মগ্নচৈতন্যে
মিলিয়ে দেখব ভাস্বর চৈতন্যের সঙ্গে
প্রথমসূর্য্যকরোজ্জ্বল।

পঞ্চম বিভাগটির নাম "সংসার"। এই বিভাগে 'রাত্রিযাপন' ও 'বসুধা' এই দুটি কবিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাত্রিযাপন কবিতাটি শোকের কবিতা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সারা কবিতায় হা হুতাশের কোথাও কোন নাম গন্ধ নেই, ভাবালুতার স্পর্শ মাত্র নেই। বৈজ্ঞানিক যখন তাঁর ল্যাবরেটারির পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করেন তার মধ্যে যেমন আবেগের কোন ছোঁয়াচ লাগে না, এই কবিতাতে বক্তাও তেমনি তার শোকার্ত্ত হৃদয়ের অনুভূতি একটা শুষ্ক গদ্যময় তালিকায় লিপিবদ্ধ করেছে, সে যেন দেবতার নিকট কঠিন শপথে আবদ্ধ যে সে বলার সময় সত্য থেকে তিল-মাত্র ভ্রষ্ট হবে না। প্রিয়বিয়োগের পরও মানুষ বেঁচে থাকে, এই দিয়ে যেন তার লজ্জার সীমাপরিসীমা নেই, "অহম্ অদ্যাপি প্রাণিমি", "অহং ন বিদীর্য্যে"—এখনও সে বেঁচে আছে, এখনও তার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে না, এই বলে সে নিজেকে কত ধিক্কার দেয়। এ-কবিতায় কবি এ-জাতীয় আত্মগ্লানির অবতারণা করেন নি।

বুকে প্রাণটা এমনি রইল, জানো ভাই
ঘরে দাঁড়িয়ে শুধু মন বললে যাই.
—যাই

সে দিন রাত্রে আমি যখন আমার কুমুবোনকে হারাই।

সে দিন রাত্রে আমি যখন আমার কুসুবোনকে হারাই। আমাদের প্রিয় বিয়োগের পরও চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারা তেমনি থাকে কিন্তু আমাদের অশ্রুধৌত চোখে বিষণ্ণ সুন্দর পৃথিবী একটা নূতন মাধুরী নিয়ে দেখা দেয়।

এল আবার দিন, প্রাচীন সোনার বেশভূষা,
... ... মেঘের স্তরে স্তরে
রোজকার বিষণ্ণসুন্দর সকাল এল ভ'রে।

আমরা যেদিন প্রিয়জনকে হারিয়েও দেখি যে চারদিকের ঘর-সংসার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সবই ঠিক রয়েছে, কেবল একজন যে ঠিক এমনি সত্য ছিল, সে চিরদিনের মত চলে গেছে, তখন একটা অব্যক্ত গূঢ় বেদনা আমাদের চিত্তকে মথিত করে।

> দরজায় দেখলেম দাঁড়িয়ে—হঠাৎ—আছি সবাই
> জানো ভাই
> —আর সবাই।

বিশ্বের সমস্ত শোকার্ত্ত ব্যক্তির একটা নিগূঢ় উপলব্ধি এই শেষ ছত্রটিতে (—আর সবাই) ভাষা পেয়েছে। এই কবিতাতে কবি অভাবনীয় শিল্প-সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। 'বসুধা' কবিতায় প্রাণের রহস্যনিকেতন থেকে চিরনির্ব্বাসিত শিক্ষিত বাঙালীর শতবর্ষের অন্তর্গূঢ় মর্ম্মবেদনা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। কৃত্রিম শিক্ষা-দীক্ষার ফলে, বিকৃত জীবনযাত্রার ফলে প্রাণের পরিপূর্ণলীলা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমাদের হয় না। প্রকৃতির কোলে যেখানে গাছপালা তরুলতা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, মুকুলিত হচ্ছে, সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। প্রাণের কোন রহস্যের সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় নেই। আমাদের প্রাণ খাঁচার পাখীর মত গুমরে উঠে প্রাণের রহস্যলীলার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভের জন্য, সে উৎসুক হ'য়ে কামনা করে যে সে

> জিইয়ে তুলবে বর্ষার নূতন কল্মিশাক
> লাউডগা, কচিশশা, কাঁচা আমড়া, তাজা লঙ্কা

আমাদের চোখ-কান আছে, হাত-পা আছে, কিন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত ও-সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর আমাদের কোন অধিকার নেই। হিতোপদেশের গল্পে পাখীরা বানরের দলকে বলেছিল "হস্তপদাদি সংযুক্তাঃ যূয়ং কিং অবসীদথ?" আমাদের মত শিক্ষিত বাঙালী যারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ব্যবহারের কোন কৌশলই আয়ত্ত করেনি, তাদের প্রতিও কি ঠিক ঐ উক্তি প্রযুজ্য নয়? যখন আমরা করিৎকর্ম্মা লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখি তখন আমরা নিজেদের শোচনীয় অবস্থার কথা বুঝতে পারি। আমরা যখন দেখি মাঝি নৌকা বাইছে, জেলে জাল ফেলছে, জেলের ছেলে বর্ষার ভরা নদীতে লাফঝাঁপ দিচ্ছে, কাঠের মিস্ত্রী চকচকে করাত দিয়ে কাঠ চিরছে, তার ছেলেটা দোতলা বাড়ীর কাঠামোটার উপর অবাধে চলাফেরা করছে, তখন আমাদের প্রাণ ব'লে ওঠে—আনন্দলোকের সৌভাগ্যবান অধিবাসী তোমরা, আমাদেরকে সঙ্গে নাও।

> তারই কাছে থাকব যেখানে কারখানাঘরে কাঠ কাটছে করাত
> তুষ জমছে, আস্তিনগুটানো কারিগর, চকচকে লোহা নাড়ছে শক্তহাত।

বহির্জীবনের মত আমাদের অন্তর্জীবনেও আমরা পঙ্গু, সৃষ্টিশক্তিহীন। মননজীবনে যা বাড়ন্ত, প্রাণবন্ত—তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই; যা খণ্ডিত, ছিন্ন, মৃত তাই নিয়েই আমাদের কারবার। সজীব মনের সংশ্রব পাবার জন্য আমরা অধীর হয়ে উঠি,

> চায় মগজে রোদ্দুর বৃষ্টি,
> চাষের লাঙল কাদায় সৃষ্টি,
> চায় বীজের সংস্পর্শ
> শিকড়ের সংঘর্ষ
> প্রাত্যহিক অফুরন্ত
> —বাড়ন্ত, প্রাণবন্ত।

শেষ বিভাগের নাম "দিনযাপন"। এই কবিতাগুলিতে কবি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক গূঢ় কথা বলেছেন, যা অনুকম্পায়ীচিত্তে অনুরূপ প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে। এ অধ্যায়ের প্রত্যেকটি কবিতা আমাদের হৃদয়ে তার অব্যবহিত স্পর্শ রেখে যায়, প্রত্যেকটির মধ্যে অকৃত্রিমতার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। প্রবন্ধ ইতিমধ্যে সুদীর্ঘ হয়ে উঠেছে, এ অধ্যায়ের কোন কবিতার পরিচয় দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে হোল। 'প্রতীক্ষা-বিদায়' কবিতাটি এ বইএর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ-কবিতায় পাঠক কবির ছন্দস্বাচ্ছন্দ্যের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাবেন।

অভিজ্ঞানবসন্তের আলোচনা শেষ করলাম। যে সকল মতামত প্রকাশ করেছি, তার জন্য ষোল আনাই নির্ভর করতে হয়েছে ব্যক্তিগত রুচি ও বিচারশক্তির উপর। যে কাব্যের বহুল আলোচনা হয় নি, সে কাব্যের সমালোচনা ব্যাপারে এ জিনিস অপরিহার্য্য; ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনাও সেই পরিমাণে বেশী। তথাপি ক্ষীণ আশা মনে জেগে রয়েছে যে এই আলোচনার মধ্যে রসজ্ঞ পাঠক স্বীয় মর্ম্মবাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাবেন। পাঠককে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই বলে বিদায় নিচ্ছি—"স্বয়ং পশ্য বিচারয়"।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বিষ্ণু দে

গতশতাব্দীতে মধ্যবিত্ত বাঙালী আমরা পরম উৎসাহে নতুন শিক্ষায় মেতেছিলাম; তখন সে উৎসাহ ছিল স্বাভাবিক, একমাত্র সুস্থ পথ। সমাজ-ব্যবস্থায় মোড় ফেরার সময় তখন, নতুন শিক্ষায় ছিল জীবিকার ভরসা এবং নতুন জীবনযাত্রার আশা। সে আশাভরসার চেহারা আজকে স্পষ্ট হয়েছে অনেক নৈরাশ্যের সঙ্ঘর্ষে। তার কারণ অবশ্য পূর্ব্বজদের চেয়ে আমাদের

বুদ্ধির আধিক্য নয়। সাহিত্যশিল্পের জগতে বিশেষ করে আমাদের ঐতিহাসিক বিনয় প্রয়োজন। কারণ সে জগতে কি গ্রাহ্য আর কি ত্যাজ্য, সে বিষয়ে সেকালের কবিরা আমাদের দৃষ্টান্ত হ'য়ে অনেক পণ্ডশ্রম থেকে বাঁচাতে পারেন।

আজকে আমাদের উত্তরাধিকার আবিষ্কার করতে হলে যাঁদের রচনাবলী বিচার করতে হবে, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের বিশেষ মর্যাদা। সে আবিষ্কারে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সহায়। বঙ্কিম গুপ্ত-কবির প্রতিভা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বঙ্কিমের মধ্যেও সেই দেশজ মনোবৃত্তির আভাস পাওয়া যায়, যে মনোবৃত্তি শিক্ষিত বাঙালী আর বাংলার জনসমাজের বিলীয়মান ভেদের সমাধানে আমাদের অবশ্য আলোচ্য। বঙ্কিমের ভাষায় "মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি, ঈশ্বরগুপ্ত বাংলার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙালী কবি জন্মে না, জন্মিবার যো নাই, জন্মিয়া কাজ নাই।" কথাটি ঐতিহাসিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, কিন্তু ইতিমধ্যে শিক্ষিত বাঙালী আর খাঁটি বাঙালী দুই স্রোত অনেক দূর ব'য়ে গিয়েছে, দুর্লঙ্ঘ্য ভেদের ব্যবধানে দুই স্রোতই সমুদ্রে গিয়ে আজ একাকার। আজ আমরা শিক্ষিত শ্রেণীর বিড়ম্বিত কাব্য সাধনার চূড়ান্তে এসেছি। আমাদের সংস্কৃতির ক্ষুরধার চূড়ায় সামাজিক সমর্থনের আশ্রয় নেই অথচ সমাজ-জীবনের মরীয়া তাগিদ আমাদের ব্যক্তিত্ববাদের দোরগোড়ায় হানা দিচ্ছে। আজকে তাই কবিকুলকে ভাবতে হচ্ছে বাংলার জনসমাজের চৈতন্যের সঙ্গে, দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধনের কথা। অবশ্যই এ একতা পারস্পরিক। এবং যেহেতু ব্যাপারটা যান্ত্রিক নয়, সেই হেতু এই সংগঠন সাহিত্যিক বক্তৃতায় বা বই পড়ে' বা লিখেই হবে না। কিন্তু এলোমেলো সামাজিক সত্তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যেরও গৌণদান আছে এবং দেশজ ঐতিহ্যের সন্ধান তার প্রথম পর্ব।

এই ঐতিহ্য আমরা আজও লোকশিল্পে ও সাহিত্যে খুঁজে পাই। বঙ্কিম একে বলেছিলেন রিয়ালিজম্। পাহাড়পুরের শিল্পনিদর্শন থেকে গ্রামশিল্পের যে সব লুপ্তপ্রায় নমুনা মেলায় আজও দেখা যায়, সে সবেই এই বহির্জগতের বস্তু সম্বন্ধে সুস্থ মনোযোগের প্রমাণ। চণ্ডীকাব্যে, মঙ্গলকাব্যে, এমন কি বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই স্বাস্থ্য আমাদের আশ্চর্য্য করে। এই মনোবৃত্তি দেবদেবীর প্রতি মানুষের মহিমা আরোপ করে, সদাগরদের নাকাল করে, প্রেমের মধ্যে নিঃসঙ্কোচ সম্পূর্ণতা পায়। ইংরেজিতে একে মানবিকতা বলে। এই মানবিকতার বস্তুনির্ভরতা বুদ্ধির উপরে আস্থা, ভাববিলাস এড়িয়ে অভীপ্সা ও প্রত্যক্ষের সমন্বয়—হয়তো বা একটু রসিকতার আমেজেই

সমন্বয়—আজও বাংলা জনসমাজের অন্তরঙ্গ জীবনে দেখা যায়। শিক্ষিত বাঙালীর সান্নিধ্যে আমরা ভুলে' যাই যে বাঙালীর বিখ্যাত ভাবালুতা সাম্প্রতিক এবং শিক্ষিত বাঙালীর বিশেষত্ব মাত্র। দেশের যে ঐতিহ্য ব্রিটিশপূর্ব শিল্পসাহিত্যের উৎস, সেই লোকমানসে বাচালতা থাকলেও অশ্রুজলের চর্চা নেই।

গতশতাব্দীর কণ্টকিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই ঐতিহ্য বিস্তারে এক দিক্‌পাল। সেখানে তাঁর কাজ শুধু উপভোগ্য লেখা নয়, তাঁর সাহিত্য-জীবন রূপকও বটে। পুরাতন ঐতিহ্যে বাঁধা তাঁর লেখনী নতুন সমাজের পটে যে আঁচড় কেটেছিল, সেটাই বিস্ময়কর ঘটনা। হয়তো সে আঁচড়ে মহাকাব্যের রূপ নেই, কিন্তু কবির লড়াই-এর কবি, প্রথাসিদ্ধ খাদ্যবর্ণনার কবি, প্রণয় বা পরমার্থের লেখক যে সংবাদপ্রভাকরের চক্ষুষ্মান সম্পাদক ছিলেন এ তথ্য আমাদের কাছে মূল্যবান।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে কি সুন্দর অতি, জগতের শোভা।
আকাশের অকস্মাৎ আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট সুখদ স্বভাব॥—

ইত্যাদির প্রথাসিদ্ধ লেখকই দুর্ভিক্ষ নীলকর, শিখযুদ্ধ, বর্মাযুদ্ধ বিষয়ে অল্পবিস্তর জোরালো পদ্য লিখেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের ইংরেজী নববর্ষ নামক কবিতা থেকেই তাঁর এই দ্বৈতধর্মী বস্তুবাদের মজাদার উদাহরণ আরম্ভ করি।

খৃষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যতো শ্বেত নর॥

সে উৎসবে   বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে
আহা তায় রোজ রোজ কতো রোজ ফোটে। ইত্যাদি

পরে দেখি   বিবিজান চলে' যান লবেজান করে'।
শাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম
বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্ শেম্।
সিন্দূরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি।
নসী, যশী, ক্ষেমী, রামী, যামী, শামী, গুল্কি।

এদিকে কিন্তু এ বহিরাশ্রয়ী চোখে ছদ্ম মিশনরীও কবিতার বিষয়, পৌষ পার্বণেও কবির প্রবল আগ্রহ। তপসী মাছ বা পাঁঠা কিছুতেই এ জড়বাদীর আপত্তি নেই—

রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥
তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান্।
তুমি সাধু সাধু তুমি ছাগীর সন্তান॥

কিম্বা কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোপ দাড়ী তপস্বীর প্রায় ॥
—হায় রে তপস্বী তোর তপস্যার কি জোর ॥

আনারসকে তাই মনে হয়

বন হতে এল এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর ॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায় ॥
সকল নয়ন-মাঝে রক্ত আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে ॥
শেষে অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।
গালে এসে বাস কোরো মরণের কালে ॥

এই প্রাকৃত মনের বাস্তবিকতাতেই কবির সহানুভূতি রূপ পায়

কিছুদিন মা! দয়া করি রপ্তানিটি বন্ধ রাখো,
ধনে প্রাণে হল কাঙালা,
ভাত বিনে বাঁচিনে, আমরা ভেতো বাঙালী,
চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে চালের জাহাজ চেলো নাকো।

কিম্বা হয় দুনিয়া ওলটপালট আর কিসে ভাই রক্ষে হবে।
পোড়া আকালেতে নাকাল করে, ডামাডোল পড়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেড়া শিক্ষে ধরে' ভিক্ষে করে' বেড়াই সবে।

সেকেলে কবির তাই ভরসা দূর সিংহাসনে :

ওগো মা ভিক্টোরিয়া
কর গো মানা। যতো তোর রাঙা ছেলে আর যেন মা
চোখ রাঙে না চোখ রাঙে না ॥—

কিন্তু এ-কাতর প্রার্থনাতেও অতি কথনের চটক, চাপা হাসির আভাস :—

ও-মা! গো-হত্যাটি উঠিয়ে দে মা! অভয়পদে এই বাসনা।
মাগো সকল গরু ফুরিয়ে গেলে দুগ্ধ খেতে আর পাব না ॥

ওদিকে এই ভারত কিসে রক্ষা হবে ভেব না না মা, সে ভাবনা।
সে "তাঁতিয়া তেপির" মাথা কেটে আমরা ধরে দেব "নানা" ॥

অবশ্য এ-কথা মানতে হবে যে সমস্যাই শুধু ঈশ্বর গুপ্তকে উত্তেজিত করে, সেইটুকুই তাঁর কৃতিত্ব। তিনি মুখ ফিরিয়ে কাব্যসাধনা করেননি এইটাই বড়ো কথা। সমাধান যেকালে ইতিহাসেই প্রায় দৃশ্য ছিল না, সেকালে একজন কবির মধ্যে সে দিব্যদৃষ্টি আশা করাই অন্যায়। তাই গুপ্ত কবি তিক্ত দ্বিধায় সীমাবদ্ধ। ভিক্টোরিয়া-র ভক্ত মার্শ্‌ম্যানকে বিদায় দেন :

শুনিতেছি বাবাজান এই তব পণ।
সাক্ষ্য দিতে করিতেছি বিলাতে গমন ॥
জোড়করে পশুপতি করি নিবেদন।
সেখানে কোরো না গিয়ে প্রজার পীড়ন।
ভূত প্রেত সঙ্গীগুলি সঙ্গে লয়ে' যাও।

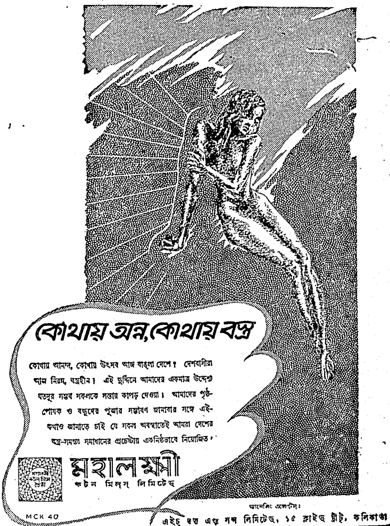

কবিতা

অজিত দত্ত
পাতালকন্যা ১॥০

অমিয় চক্রবর্তী
অভিজ্ঞান বসন্ত ১॥০

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
মৈনাক ১৲
শিবির ১॥০

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়
বর্ষশেষ ১॥০
বসুন্ধরা ১৸০

জীবনানন্দ দাশ
ধূসর পাণ্ডুলিপি ২৲

বিমলচন্দ্র ঘোষ
দক্ষিনায়ণ ১॥০

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সঞ্চারী ১৲

ফাল্গুনী রায়
বারোটি কবিতা ১৲

বিষ্ণু দে
পূর্বলেখ ১৸০

বুদ্ধদেব বসু
কঙ্কাবতী ২৲
নতুন পাতা ২৲

মণীন্দ্র রায়
একচক্ষু ১৲

কবিতা

মণীশ ঘটক
শিলা-লিপি ২৲

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
স্নায়ু ১৲

সমর সেন
কয়েকটি কবিতা ১৷০
গ্রহণ ১৲
নানা কথা ৸০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
পদাতিক ৸০

আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
আধুনিক বাংলা কবিতা (সংকলন) ২৲

প্রবন্ধ, ভ্রমণ, ছোটো গল্প

বুদ্ধদেব বসু
সমুদ্রতীর ১৲
সব-পেয়েছির দেশে ১॥০

জ্যোতির্ময় রায়
পদ্মনাভ ১৷০
দৃষ্টিকোণ ১॥০

প্রতিভা বসু
মাধবীর জন্য ১৸০

কবিতাভবন: ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা

এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও ?
বাজাই বিজয়ী বাদ্য টম্ টম্ টম্
কিসে তুমি কম ?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙে বম্ বম্ বম্।

বিধবা-বিবাহ ঈশ্বর গুপ্তের পছন্দ হয় না, অথচ বিলাত থেকে সে আইন প্রত্যাহারের সম্ভাবনাও তাঁকে বিচলিত করে। এদিকে তিনি লেখেন:

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব।
একদিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেবিল খায় খানা।
পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পুজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে।
বৃদ্ধ ধরে পশুভাব, জন্তুভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ, ছেলে বলে যিশু।—

ওদিকে ভাবী সমাজের চিত্রও তাঁকে ঠিক সান্ত্বনা দেয় না:

লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল,
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া!
ঠাটঠমকে চালাক চতুর
সভ্য হবে থোড়া থোড়া!
আর কি এরা এমন করে'
সাজ সেঁজুতির ব্রত নেবে ?
আর কি এরা আদর করে'
পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে ?
পর্দা তুলে' ঘোমটা খুলে'
সেজে গুজে' সভায় যাবে!
আপন হাতে হাঁকিয়ে' বগী
গড়ের মাঠের হাওয়া খাবে।

আমরা কবিত্ব বলতে যা বুঝি, রোমান্টিক কাব্যর সে সংজ্ঞা গুপ্তকাব্যে প্রযোজ্য না হলেও তার নিজস্ব মর্যাদা আছে। অনেকেরই ধারণা যে এ মেজাজ বা মননরীতিতে মহৎ কাব্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। কিন্তু সামাজিক পরিবেশে এ-প্রাকৃত মনোবৃত্তিও রোমান্টিক আবেগ যে দানা বাঁধতে পারে, তার প্রমাণ ইংরেজি কাব্যে চসার এবং আরো মহৎ প্রমাণ দান্তে। রোমান্টিক কাব্যধারায় যেটা মস্ত লাভের বিষয়, সেটা হচ্ছে কাব্যরূপ বা ফর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা। ঈশ্বর গুপ্ত সে জ্ঞানের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন নি, তার জন্যে অনেকটা দায়ী হয়তো তাঁর শৈশবের প্রতিকূল আবহাওয়া, শিক্ষার অভাব।

তা' ছাড়া, মনে রাখা দরকার যে তিনি যে যুগসন্ধির, সামাজিক দোটানার, শিক্ষার ও ঐতিহ্যের আপাতবিরোধের কবি, সে বিরোধে তিনি ঐতিহ্যের চেনা পক্ষই নিয়েছিলেন। দেশজ রীতি বা কনভেন্‌শনেই তাঁর কবিত্বের শক্তি এবং সে কনভেন্‌শনে তখন ভাঙন ধরেছে আর সে রীতির

লৌকিক স্বভাব এবং রোমান্টিক জ্ঞান গরিমার সমন্বয় তাঁর আয়ত্তে ছিল না। তার কারণ যে শুধু তাঁর কবিপ্রতিভার সামান্যতা নয়, তার প্রমাণ পাই মাইকেল, হেমচন্দ্র একাধিক নাম করা কবিকীর্তিতে। হেমচন্দ্র অবশ্য প্রায় ঈশ্বর গুপ্তের সমগোত্র ছিলেন কবিত্বের তুলাদণ্ডে। হেমচন্দ্র এদিকে রোমান্টিক স্বপ্নের অভীপ্সার আস্বাদে মাইকেলের অনুকারক, ওদিকে আবার গুপ্ত কবির রীতিতে সাময়িক ঘটনা নিয়েও পদ্য লেখেন। কিন্তু দুটি ধারা তাঁর কবিস্বভাবে এক হয় না। ফলে দুটি ধারাই তির্যগ্‌গামী, ক্ষীণ। মাইকেলের প্রচণ্ড প্রতিভা এ-সমন্বয় প্রায় সম্ভব ক'রে তুলেছিল। মেঘনাদবধের উদ্দাম কল্পনা চতুর্দশপদাবলীতে, ব্রজাঙ্গনায় অনেকটা সমাজবেদ্য, অনেকটা প্রাকৃত সমর্থনে সার্থক। তবু তাঁর কাব্যভাষার বাধা মাইকেল বাঁধতে পারেন নি। তাই বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ বা একেই কি বলে সভ্যতায় যে প্রাকৃত শুভবুদ্ধি সামাজিক দৃষ্টি, যে বস্তুনির্ভর দেশজরীতির সুস্থ মনোবিন্যাস পাই, তা তাঁর মিলটন্‌-ঘেঁষা বায়রন্‌-ঘেঁষা কাব্যে মূর্তি পায়নি। কবিতার চেয়ে নাট্যরূপ কেন এ-কাজে সহায় সে-কথা এ-প্রসঙ্গে বিচার্য। সেকথা এই শুভবুদ্ধি, এই রীতি টেকচাঁদকে, কালীপ্রসন্নকে লুব্ধ করেছিল, দীনবন্ধু মিত্র এই মননের উৎসেই পান তাঁর অসামান্য, প্রায় সেক্সপীয়রীয় মানবিকতা। ঐতিহাসিক কারণে ও ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যে ঈশ্বর গুপ্ত এই রীতির সার্থকতা এবং সীমাবদ্ধতা একাধারে দুয়েরই দৃষ্টান্ত। কিন্তু বাক্যবিন্যাসের দেশজ রীতি আজও আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে খুঁজতে পারি, যেমন পারি বস্তু-নির্ভর সাধারণ সুস্থ বুদ্ধির সরসতা। অবশ্য কোনো-কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দেশী সাধনায় এই সন্ধানের মধ্যে একটা স্থূলতা দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরেও রুচির এই বিপরীত রূপ আমাদের মধ্যবিত্ত বিড়ম্বনাতেই সম্ভব। তার জন্যে চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা ঐতিহ্যের কবিরা দায়ী নন, দায়ী আমাদেরই ঐতিহাসিকবোধের অভাব এবং মধ্যবিত্ত কুরুচি।

আলোচনা

বাংলা ছন্দ ও মিল

প্রবোধচন্দ্র সেন

গত আষাঢ় মাসের 'কবিতা'য় 'বাংলা ছন্দ ও মিল' নামক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আশা করি তাতে বিষয়টা ভালো করে বোঝার পক্ষে সহায়তা হবে।

উক্ত প্রবন্ধের গোড়াতেই বুদ্ধদেববাবু বলেছেন, 'বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন'ই ছিল 'দময়ন্তী' কাব্য রচনায় তাঁর 'সাধনা'। ছন্দ জিনিসটাই বহুলপরিমাণে বাক্‌রীতির উপর নির্ভর করে, বস্তুত শিল্পিত বাক্‌রীতিরই নামান্তর ছন্দ। সুতরাং বাক্‌রীতির মূলগত নিয়মগুলিকে লংঘন করে ছন্দ দাঁড়াতেই পারে না। তাই উদ্ধৃত উক্তিটিকে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন যে, তিনি গদ্যের সঙ্গে পদ্যের স্বভাবের মিলন ঘটাতে অর্থাৎ 'পদ্যকে দিয়ে গদ্যকবিতার কাজ করিয়ে নিতে চেয়েছেন। কেননা, তাঁর বিশ্বাস 'পদ্য অথচ গদ্যকবিতার মতো মৌখিক ভাষায় গঠিত, বাংলা পদ্যের নতুন পরিণতি বোধ হয় এই দিকেই'। পদ্যরচনাকে এভাবে গদ্যভাবাপন্ন করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি 'অনুশাসনের' উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে এই—'বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে চ্যুত হবো না'। এই অনুশাসনটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতিকে কিছু পরিমাণে লংঘন না করলে পদ্য রচনা করাই অসম্ভব। সম্ভবত এই উক্তিটির মর্মার্থ পরিস্ফুট হয়েছে পরবর্তী অনুশাসনগুলিতে। যথা—(১) হইবে, বলিব, করিতেছে প্রভৃতি 'সাধু' ক্রিয়াপদ এবং ফুটি', চলিছে, দেহ (=দাও,), দেখিবারে, এনু, নারি (=পারি না) প্রভৃতি 'কাব্যিক' ক্রিয়াপদ বর্জন করে তার স্থলে পুরোপুরি চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা; (২) মম, কভু, যেথা, যবে, পরান, প্রায় (=মতো) প্রভৃতি কাব্যিক শব্দ পরিহার করে আমার, কখনও, যেখানে প্রভৃতি গদ্যোচিত শব্দের প্রয়োগ; (৩) হাত, গাছ, ফুল প্রভৃতি নিত্যপ্রচলিত কথার সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার না করা (অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে আপত্তি নেই)। গদ্যের চেয়ে পদ্যে ভাষার ঐশ্বর্য, বৈচিত্র্য এবং স্বাধীনতা অনেক বেশি। উক্তপ্রকার বিধানের দ্বারা পদ্যের স্বাধীনগতি অনেকখানি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা। তৃতীয় বিধানটির পক্ষেই একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রচনার প্রয়োজন অনুসারে হাত, গাছ, ফুল ব্যবহারে যেমন বাধা নেই, তেমনি হস্ত, তরু, পুষ্প লিখতেও বাধা থাকা উচিত নয়। তবে কতকগুলি পদ্যরচনাকে বিশেষভাবে গদ্যধর্মী করে তোলার সার্থকতা আছে, একথা অবশ্যস্বীকার্য। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় নিয়মটি বিশেষভাবে এবং প্রথম নিয়মটি 'প্রয়োজনমতো'

ও 'যথাসম্ভব' পালনীয়। বুদ্ধদেববাবু নিজেও স্বীকার করেছেন, যথেষ্ট প্রয়াসসত্ত্বেও তিনি সর্বত্র এই বিধানগুলি মেনে চলতে পারেননি। তিনি নিজেই কয়েকটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, পাঠক হয়তো আরো ব্যতিক্রম পাবেন, 'কিন্তু খুব বেশি পাবেন না'। আমার মনে হয় এসব ব্যতিক্রমের সংখ্যা তিনি যত কম মনে করেন আসলে তত কম নয়। 'দময়ন্তী' নামক প্রথম কবি তাটিতেই নিন্দে (=নিন্দা করে), কাটায়েছি, মুঞ্জরিবে, আসিবে, শুনায়েছে, আকর্ষিবে, থমকে, উতরে, শিহরে, আজিও, সলিলে, শিলা, শুধায়ে, মুঞ্জরেছে, ছিনায়ে, তাকায়ে, কয়ে গেলো, ফিরায়ে, প্রেমেরে, তোরে প্রভৃতি উক্ত বিধান-বিরোধী বহু শব্দ লক্ষ্য করা গেল। সলিল এবং শিলা শব্দের প্রয়োগ উপরের তৃতীয় বিধানের ব্যতিক্রম। বাকি শব্দগুলিও মৌখিক রীতির চলতি গদ্যে অচল। নিন্দে, মুঞ্জরিবে, আকর্ষিবে, উতরে, শুধায়ে, প্রেমেরে প্রভৃতি সাধু গদ্যেও চলে না। কাটায়েছি, আসিবে, আজিও, ছিনায়ে, ফিরায়েকে অনায়াসেই কাটিয়েছি, আসবে, আজও, ছিনিয়ে, ফিরিয়ে লেখা যেতো ; ছন্দের খাতিরে যে কাটায়েছি ইত্যাদি লিখতে হয়েছে, তাও নয়।

ছন্দের প্রয়োজনেই পদ্যের ভাষাগত স্বাধীনতা অনেকখানি সংকুচিত হয়, মিল রাখলে আরও সংকীর্ণ হয়। তাই পদ্যে শব্দের চয়নে ও বিন্যাসে অনেকখানি স্বাধীনতা থাকা দরকার। নতুবা ভাবপ্রকাশেই বাধা ঘটে। কোনো অনুশাসনের দ্বারা শব্দচয়নের পরিধিকে সংকীর্ণ করে তুললে কবিতা রচনার মূল উদ্দেশ্যকেই খণ্ডিত করা হয়। তবু উক্ত প্রথম অনুশাসনটির একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন 'সাধুছন্দ' তাতে সব রকম চলতি ক্রিয়াপদই চলে : কেবল হাস্‌বে চল্‌তে শুন্‌ল প্রভৃতি হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ চলে না। যদি তা চালানো যায় তবে কবির স্বাধীনতা আরও বাড়ে। বহু বৎসর পূর্বে কোনো কোনো প্রবন্ধে আমি দৃষ্টান্ত যোগে এ-কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন করি। তারপরে 'পরিশেষ' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ সাধু ছন্দেও হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। তাতে আমার মন্তব্যের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ হয়। কিন্তু 'পরিশেষ' গ্রন্থে উক্তরূপ ক্রিয়াপদের যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রিক প্রয়োগই দেখা যায়। যেমন—

সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
'উঠ্‌ত' না শঙ্খধ্বনি,
'মিল্‌ত' না যাত্রী কোনো জন।—(প্রাণ, পরিশেষ)

রবীন্দ্রনাথ উক্তপ্রকার যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক প্রয়োগের দৃষ্টান্তও দেখিয়েছেন তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থে।—

(১) টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল,
'সিট্‌কে' মুখ থাবি, জর 'আট্‌কে' যাবে কাল। পৃঃ ১৩০
(২) বৈকালে বৈশাখী এল আকাশ-লুণ্ঠনে,
শুক্লরাতি 'ঢাক্‌ল' মুখ মেঘাবগুণ্ঠনে। পৃঃ ১৫৩

এখানে উঠ্‌ত ও মিল্‌ত শব্দে যুগ্মধ্বনির দ্বিমাত্রিক প্রয়োগ এবং সিট্‌কে, আট্‌কে, ঢাক্‌ল শব্দে যুগ্মধ্বনির একমাত্রিক প্রয়োগ লক্ষ্য করার বিষয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যে এই উভয়প্রকার প্রয়োগই দেখা যায়। 'দময়ন্তী'তে শুধু বিশ্লিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্তই লক্ষ্য করেছি। যেমন—

কাজটা 'জুট্‌ত' যদি তবে কি 'ছুট্‌তে' হতো পৃঃ ১৮

আষাঢ়ের 'কবিতা'য় অজিত দত্ত লিখেছেন, "সাধু ক্রিয়াপদের ক্রমবিলোপ সমস্ত ছন্দ এক কথায় বাংলা কবিতার পক্ষেই একটা শুভ লক্ষণ"। কিন্তু ১২ শ্রাবণের 'ভৈরব' পত্রিকায় দেখছি তিনি লিখেছেন—

পৃথিবীর আলোছায়া আবার কি দেখিব দুচোখে? …
দেবতা কি বজ্র লয়ে জাগিবে না কভু কোনোখানে?

এখানে অনায়াসেই 'দেখবো' এবং 'জাগবে' লেখা যেত। কিন্তু তথাপি কেন লেখেননি জানি না। আমার মনে হয় হেরি, নেহারি, নারি (=পারি না), দেখিনু প্রভৃতি ক্রিয়াপদ যেমন পদ্যরচনায় একেবারে বর্জনীয় নয়, তেমনি দেখিব, লাগিল, ছুটিতে প্রভৃতি সাধু ক্রিয়াপদকেও সম্পূর্ণ পরিহার করা চলে না। উভয়প্রকার ক্রিয়াপদই পদ্যরচয়িতার ভাবপ্রকাশের পক্ষে অবস্থাবিশেষে অত্যজ্য। অকারণে কবির স্বাধীনতা তথা পদ্যের শব্দসম্পদকে সংকুচিত করার মানে হয় না। তবে নেহাৎ নিষ্প্রয়োজনে হেরি, নারি, পেনু, গেনু প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ যেমন আজকাল আর কেউ করেন না ; তেমনি ভবিষ্যতে সাধু ক্রিয়াপদও নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে না বলেই মনে হয়। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে 'হেরি-নারি-এনু'র মতো 'দেখিব-করিল-ছুটিতে' প্রভৃতিও প্রত্ন (archaic) ক্রিয়াপদ হিসাবে বেঁচে থাকবে।

এবার কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের কথা বলব। বুদ্ধদেববাবু **পয়ার** কথাটি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে পাঠকের ভুল ধারণা হবার খুবই আশংকা আছে। একশ্রেণীর ছন্দকেই তিনি 'পয়ারজাতীয় ছন্দ' বলে অভিহিত করেছেন। সেটা ঠিক নয়। এ-বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে আরও সতর্কতা সহকারে গ্রহণ করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত দিয়ে শুরু করলেই বোঝানো সহজ হবে।—

(১) বরষার নির্ঝরে। অঙ্কিত-কায়,
দুই তীরে গিরিমালা। কত দূর যায়।—(নিষ্ফল উপহার, মানসী)

কিংবা
ফাল্গুনে বিকশিত। কাঞ্চন ফুল,
ডালে ডালে পুঞ্জিত। আম্রমুকুল।
চঞ্চল মৌমাছি। গুঞ্জরি' গায়,
বেনুবনে মর্মরে। দক্ষিণ বায়।—(পাঠপ্রচয়, তৃতীয় ভাগ)

এ-ছন্দের প্রতিপংক্তি আট ও ছয় মাত্রার দুই **পদে** বিভক্ত। সুতরাং এটি যে পয়ার তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথও এটিকে পয়ার বলেই অভিহিত করেছেন ('মানসী' ১ম সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। লক্ষ্য করা প্রয়োজন

এখানে যুগ্মধ্বনি (ফাল্ কাঞ, চন্, পুঞ, আম্ ইত্যাদি) সর্বত্রই সম্প্রসারিত ও দ্বিমাত্রিক। এবার পরবর্তী চার পংক্তিকে রূপান্তরিক করা যাক।—

(২) ফাল্গুনে কাঞ্চনপুষ্প। বিকশি আকুল,
ডালে ডালে পুঞ্জীভূত। আম্রের মুকুল।
চঞ্চল মৌমাছি যত। গুঞ্জরিয়া গায়,
বেনুকুঞ্জে মর্মরিছে। দক্ষিণের বায়।

এখানেও প্রতিপংক্তিতে আট ও ছয় মাত্রার দুই পদ। সুতরাং এটাও-যে পয়ার তাতে সন্দেহ নেই। লক্ষ্য করার বিষয় এখানে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিগুলি সম্প্রসারিতই রয়েছে, কিন্তু শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনিগুলি সংকুচিত হয়ে গিয়েছে—ফলে অনেকগুলি নূতন ধ্বনি বসাবার অবকাশ ঘটেছে। আবার রূপান্তরিত করা যাক।—

(৩) ফাগুন মাসে উঠল ফুটে। অশোক-পলাশ ফুল,
শাখায় শাখায় পড়ল ঝুলে। আম্রমুকুল-দুল।
চপল যত মৌমাছিরা। গুঞ্জরিয়া গায়।
বেণুরবনে মর্মরিয়া। বইছে দখিন বায়।

এটাও পয়ার। রবীন্দ্রনাথও এ ছন্দকে পয়ার বলেই স্বীকার করেছেন (বাংলা ভাষাপরিচয়, পৃঃ ৬৮-৬৯ দ্রষ্টব্য)।

বলা বাহুল্য উক্ত তিনটি দৃষ্টান্তই পয়ার হলেও ওগুলি প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন। বাংলা ছন্দ যে প্রকৃতিভেদে তিনটি শাখায় বিভক্ত, একথা সর্ববাদিস্বীকৃত (রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ, পৃঃ ৫৫ দ্রষ্টব্য)। বস্তুত 'পয়ার' কথাটি কোনো বিশেষ ছন্দ-প্রকৃতির নাম নয়; ওটি হচ্ছে আসলে ছন্দের আকৃতিগত রূপবিশেষের অর্থাৎ একটি বিশেষ ছন্দোবন্ধের (metrical structure-এর) নাম। তাই ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের ন্যায় পয়ারও প্রকৃতিভেদে তিন রকম হতে পারে। কাজেই 'পয়ারজাতীয় ছন্দ' নাম দিয়ে কোনো বিশেষ প্রকৃতির ছন্দ বোঝাতে চেষ্টা করলে ভুল বোঝানো হয়।

'ছড়ার ছন্দ' কথাটাও সুষ্ঠু নয়। ও-ছন্দ শুধু ছড়ারই বিশেষ এলাকা নয়। মেয়েলি ব্রতকথা, পল্লীগাথা, বাউলের গান, ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র এক কথায় সমগ্র folk Literature বা লোকসাহিত্যেরই প্রধান বাহন হচ্ছে ওই ছন্দ। সুতরাং ও-ছন্দকে **লৌকিক ছন্দ** (Folk Metre) বলাই অধিকতর সংগত।

রবীন্দ্রনাথকথিত 'তিন মাত্রার ছন্দ' সম্বন্ধে বুদ্ধদেববাবুর মনে একটু ভুল ধারণা আছে বলে মনে হলো। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'-র ছন্দকেই তিন মাত্রার ছন্দ বলেন, তা নয়। তিনি 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর' প্রভৃতি লৌকিক ছন্দকেও 'তিন মাত্রার ছন্দ' বলেছেন (ছন্দ, পৃঃ ১৩৩ দ্রষ্টব্য)। ছন্দের নামকরণে এ-রকম শিথিলতা পাঠকের মনে সুস্পষ্ট ধারণার সহায়ক নয়।

উপরে যে তিন প্রকার পয়ারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তার প্রথমটিকে বলা যায় মাত্রিক বা **মাত্রাবৃত্ত** (Moric) পয়ার। দ্বিতীয়টির প্রচলিত নাম অক্ষরবৃত্ত পয়ার, আমার পরিভাষায় **যৌগিক** (Composite) পয়ার। আর, তৃতীয়টি হচ্ছে লৌকিক পয়ার, পারিভাষিক নাম **স্বরবৃত্ত** (Syllabic) পয়ার। মাত্রাবৃত্ত, যৌগিক ও স্বরবৃত্ত হচ্ছে বাংলা ছন্দের তিনটি বিশিষ্ট প্রকৃতির নাম। মাত্রাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুগ্মধ্বনির সার্বত্রিক সম্প্রসারণ-শীলতা; যৌগিক ছন্দের বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে সংকুচিত ও সম্প্রসারিত এই দুরকম যুগ্মধ্বনিরই সমাবেশ; আর স্বরবৃত্ত ছন্দ নির্ভর করে প্রধানত প্রতিপর্বের (foot-এর) সিলেব্ল্-সংখ্যার উপর। রবীন্দ্রনাথ ষন্মাত্রপর্বিক (hexamoric) মাত্রাবৃত্ত এবং চতুঃস্বরপর্বিক (tetrasyllabic) স্বরবৃত্ত, এই উভয়প্রকার ছন্দকেই 'তিন মাত্রার ছন্দ' বলতেন।

বুদ্ধদেব বাবুর '**যুগ্মস্বর**' কথাটার প্রয়োগও সমর্থনযোগ্য নয়। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও, এই কটি একক স্বরকে বলা যায় অযুগ্মস্বর (monophthong) এবং ঐ (=অই্ বা ওই্), ঔ (=অউ্ বা ওউ্), আই্, আউ্, উই্, এই্, উউ্, আও্ প্রভৃতি জোড়াস্বরকে বলা যায় যুগ্মস্বর (diphthong)।

৩

বুদ্ধদেববাবু 'পয়ার ছন্দে'-র সঙ্গে 'ছড়ার ছন্দে'-র (অর্থাৎ যৌগিক ও স্বরবৃত্ত ছন্দের) যে তুলনা করেছেন, তাও সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি বলেছেন, পয়ার ছন্দে 'বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের পাশেই মুখের একটা চলতি বুলি সহজেই সে নিজের মধ্যে মানিয়ে নেয়', পক্ষান্তরে 'পয়ারের বিশাল মুক্তি ছড়ার ছন্দে নেই,···অনেক কথা আছে যা এ ছন্দে ঢোকে না, অনেক ভাব আছে যা এ-ছন্দ বহন করতে পারে না।···গাম্ভীর্য এর প্রকৃতিগতই নয়···এবং এ-ছন্দ কিছুক্ষণ পরেই একঘেয়ে ঠেকে'। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল যাবৎ পুনঃপুনঃ এ-মনোভাবের কঠোর প্রতিবাদ করেছেন (ছন্দ, ৩২-৩৭, [illegible]৯-৫৪ এবং ২০৯-২১৩ পৃঃ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য)। এস্থলে ওবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা না করে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করেই নিরস্ত হবো। লৌকিক ছন্দের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'এই ছন্দের ভঙ্গী একঘেয়ে নয়।···এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।··(এই ছন্দে) মেঘনাদবধ কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হতো সে কথা স্বীকার করব না।···এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে একথা মানব না।···সংস্কৃত বলো, ফার্সি বলো, ইংরেজি বলো সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে।·· প্রাকৃত বাংলাকে গুরু-চণ্ডালী দোষ স্পর্শই করে না। সাধু ছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশোল সয় না'।

যাঁরা পদ্যকে পদ্য রেখেই তাকে দিয়ে গদ্যকবিতার কাজ করিয়ে নিতে চান, তাঁদের দৃষ্টি 'পুনশ্চ' কাব্যের ছুটি, গানের বাসা ও পয়লা আশ্বিন, এই শেষের তিনটি কবিতার দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই। এই তিনটি কবিতার ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য এখনও আমাদের সাহিত্যে যথোচিতভাবে স্বীকৃত হয়নি। বস্তুত সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে তথা বাংলা সাহিত্যে এই তিনটি কবিতা unique। এই তিনটি কবিতার ভাষা গদ্য নয়, রীতিমতো ছন্দোবদ্ধ পদ্য ; অথচ এগুলিতে, বিশেষ করে 'পয়লা আশ্বিন' কবিতাটিতে, ছন্দোময় পদ্যের ভাষাতেও নিরাভরণ গদ্যের অকুণ্ঠিত পৌরুষ শক্তি ও ভাবের গাম্ভীর্য যে-ভাবে ফুটে উঠেছে তা অতুলনীয়। অথচ এগুলির ভিত্তি হচ্ছে লৌকিক ছন্দ, তথাকথিত সাধু 'পয়ার' ছন্দ নয়। একথা স্মরণ করা প্রয়োজন যে, বাংলা লৌকিক ছন্দ এখনও পূর্ণ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তার সম্ভাব্যতার অবকাশও প্রচুর।

৪

বাংলা ছন্দের একটি প্রধান নিয়ম হচ্ছে এই। মা, চা, কি, সে প্রভৃতি অযুগ্মস্বরান্ত শব্দ সাধারণত পরবর্তী বা পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েই উচ্চারিত হয়। মা-যাবেন, চা-খাব, কি-চাও, এসো-মা, খাবে-কি, আমি-তো প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করলেই একথার সার্থকতা বোঝা যাবে। যদি বিশেষ কারণে একক ও বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে ওসব শব্দ প্রলম্বিত ও দ্বিমাত্রিক হয়ে যায়। যেমন—

পান বিড়ি আর। 'চা' সিগারেট। বেচে হতে চাও। ধনী ?

এসব কথা নানা উপলক্ষে বহু প্রবন্ধেই আলোচনা করেছি। এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ১৩৪২ সালের জৈষ্ঠ্যের 'বিচিত্রা'য় এ-নিয়মের কয়েকটি দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলাম। এখানে উদ্ধৃত করছি।—

(১) গর্জিল পৌরবরাজ অসি মুক্ত করি,
'কি ! এত স্পর্ধা তার ? আনো তাকে ত্বরা'।
(২) ছি, বন্ধু, তোমারে সাজে না কভু হেন দুর্বলতা।
(৩) না, না, পারিব না করিতে পালন
এ নির্দয় আজ্ঞা তব, ক্ষমা কর মোরে।
(৪) আবার ডাকিনু, 'কে ?', নাহি পেয়ে সাড়া
বিস্ময়ে বাহিরে এসে উঠিনু চমকি।
(৫) সহসা ধ্বনিল 'কু', প্রতিধ্বনি সনে
শিহরি উঠিল দিক্ বন হতে বনে।

রবীন্দ্রসাহিত্যেও এরকম প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে।

(১) গোলাপ ফুল। ফুটিয়ে আছে। মধুপ হোথা। যাস্‌নে,
ফুলের মধু। লুটিতে গিয়ে। কাঁটার ঘা। খাস্‌নে।—শৈশবসংগীত
(২) কি! শেষে এই হল,। এই হল হায়!
কি করেছি যার লাগি। এ গান সে গায়।—ভগ্নহৃদয়

(৩) চলি চলি। পা পা। টলি-টলি। যায়
গরবিনী। হেসে হেসে। আড়ে আড়ে। চায়।—কড়ি ও কোমল
(৪) আধেক মুখ। নয়ন দুটি। ভাবিছে রাজ।-বালা,
কে পরালে। মালা।
—সোনার তরী

কামিনী রায়ের এই বিখ্যাত পংক্তিদুটিও

'বল্ ছিন্ন বীণে। বল্ উচ্চৈঃস্বরে—
না, না, না। মানবের তরে···

এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিছুকাল পূর্বে 'পরিচয়' পত্রিকাতেও (১৩৪৮, ফাল্গুন) এ-বিষয়ে আলোচনা করেছি। সুতরাং

এরা তো বাঙালি নয়, কী করে বুঝবে
মা, বাবা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী,
এ-সব কথার মানে কী।

বুদ্ধদেববাবুর এই কয়টি লাইনে বাংলা ছন্দের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি বাংলা উচ্চারণ তথা ছন্দের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই মা, স্ত্রী এবং কী ধ্বনি দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেববাবু বলেছেন যে, তিনি 'দময়ন্তীর' ছন্দ-রচনায় সর্বত্রই চোখে-দেখার চেয়ে কানে-শোনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হলদে, টুকরো, পাগড়ি প্রভৃতি শব্দে অদৃশ্য যুক্তাক্ষরের উল্লেখ করেছেন। তিনি ভেবে দেখেননি যে, 'যুক্তাক্ষর' কানে শোনা যায় না, চোখেই দেখা যায়। অর্থাৎ টুকরো প্রভৃতি শব্দে তিনি মনের চোখে যুক্তাক্ষর দেখেছেন। যেসব নিরক্ষর ব্যক্তির চোখে দেখার অভ্যাস কখনও হয়নি তারা ওসব শব্দে যুক্তাক্ষর শোনে না, শোনে যুগ্মধ্বনি। অক্ষর জিনিসটা দেখার, শোনার নয় ; শোনার জিনিস হচ্ছে ধ্বনি। যাঁদের দেখার সংস্কার মন থেকে যায়নি তাঁরাই যুক্তাক্ষরের কথা বলেন। তাঁদের কাছে টুকরো শব্দের রূপ হচ্ছে টুক্রো। যাদের চোখে দেখার সংস্কার জন্মায়নি তাদের কানে ও-শব্দটা শোনায় টুক্-রো। টুক্ যুগ্মধ্বনিটাই শোনার বস্তু, ক্রো যুক্তাক্ষরটা দেখার বস্তু। 'ছন্দ' শব্দের চাক্ষুষ বিভাগ হচ্ছে ছ-ন্দ, কিন্তু তার শ্রৌত বিভাগ হচ্ছে ছন্-দ। এ-বিষয়ে সর্বশেষ আলোচনা করেছি ১৩৪৮ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'পরিচয়ে'। সে প্রসঙ্গেই যুগ্মধ্বনির সংকোচন-সম্প্রসারণের কথাও বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছি। ও জিনিসটা যে শুধু আধুনিক কালেই ধরা পড়েছে তা নয়। নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

'ঝগড়া' করি। পুরিয়া বাসনা···
'ঝগড়া' ত। বাদ তব নাই।

আমার কথিত যুগ্মধ্বনির সংশ্লেষণ-ক্ষমতার পুনরালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেববাবু ১৩৪৮ সালের চৈত্র সংখ্যা 'কবিতা'য়

দেখা দিল কলক তার। [illegible] একদিন

এই লাইনটাকে সমর্থন করেছিলেন। 'কলকাতা-র 'কল্' ধ্বনির স[illegible] অবশ্য সমর্থনযোগ্য। পরিচয়ে 'এক সক্কাল' কথায় 'এক' ধ্বনির সংকোচ আমাদের উচ্চারণপদ্ধতির বিরোধী বলে মত দিয়েছিলাম। বুদ্ধদেববাবু তা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি 'আরো-এক'-এ ধ্বনির সংশ্লেষণ স্বীকার করে 'অর্থাৎ ও-এ এই দুটি স্বরবর্ণের যুগ্ম উচ্চারণ' করে [illegible] পংক্তিটিকে সমর্থন করেছেন। 'ও-এ'র সংশ্লেষণ বা 'যুগ্ম-উচ্চারণ' কথার দ্বারা তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন জানি না। 'আরো-এক'-কে 'আরেক' ধরলে ওকারের সার্থকতা থাকে না এবং 'আরোয়েক' ধরলে ছন্দ থাকে না। [illegible] পয়ারের দ্বিতীয় পদে 'আরো এক সকাল' কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

'দময়ন্তী'র ছন্দ-বৈশিষ্ট্য এবং বুদ্ধদেববাবুর প্রবন্ধের পক্ষে ও বিপক্ষে আরো অনেক কথাই বলার আছে। কিন্তু স্থানাভাববশত আর একটিমাত্র কথা বলেই নিরস্ত হবো। বুদ্ধদেববাবুর মতে 'যুগ্মমিল' আমাদের চোখের সংস্কার মাত্র এবং এ-রকম মিলের প্রবর্তক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। আসল কথা এই যে, বাংলায় মিল বলতে চিরকালই যুগ্মমিল বোঝায় এবং বাংলা সাহিত্যের জন্ম থেকেই বাংলায় ও-রকম মিল চলে আসছে (চর্যাপদ দ্রষ্টব্য)। শুধু তাই নয়। বাংলায় যাকে বলি মিল হিন্দিতে তাকেই বলে 'তুক' এবং সংস্কৃতে বলে অন্ত্যানুপ্রাস। তুক এবং অন্ত্যানুপ্রাস কথার মানেও 'যুগ্মমিল'। সংস্কৃত (মোহমুদ্গর, গঙ্গাস্তোত্র, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি স্মরণীয়), প্রাকৃত, হিন্দি, প্রাচীন বাংলা, সর্বত্রই যুগ্মমিলের ছড়াছড়ি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে এর প্রবর্তক বলা সংগত নয়, এবং তা চোখের সংস্কারও নয়। মিলের আলোচনাটা অসম্পূর্ণই রইল, কারণ স্থানাভাব।

বাংলা কাব্যে মিল

শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধূরী

গত আষাঢ় ১৩৫০ এর 'কবিতা'য় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু বাংলা ছন্দ ও মিল প্রবন্ধে বাংলা কবিতায় মিল সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কারে আপত্তি জানাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বৈশাখ ১৩৪৫-এর বিশেষ সংখ্যা 'কবিতা'য় শ্রীযুক্ত অজিত দত্তের লেখা 'বাংলা মিলের দুরূহ তত্ত্ব' প্রবন্ধটির উল্লেখ করিয়া বাংলা কাব্যে মিল সম্বন্ধে অজিতবাবুর মতে তাঁহার সমর্থন জানাইয়াছেন।

অজিতবাবুর মতে 'বাংলা কবিতার মিল দেবার যে নিয়ম প্রচলিত তা অনেক সময় কা[illegible]র রস নষ্ট করে এবং সাধারণতঃ কবিসম্প্রদায়ের উপর

[illegible] অবিচারের পরিচয় দেয়।......বাংলায় যে মিলের এত অভাব তার
[illegible]রণ স্বরান্ত শব্দে একটি বর্ণের মিলকে সাধারণত আমরা অত্যন্ত খারাপ
[illegible]ল বলে মনে করি বাংলায় সে-জিনিষ একবারে অচল। অপরপক্ষে
বহুস্বরের মিলকে আমরা খুব ভাল মিল বলি।' অজিতবাবু 'বাংলা কবিতায়
এক স্বরের [illegible]র পক্ষপাতী। তার প্রথম কারণ আমার বিশ্বাস কবিতা
সুশ্রাব্য এবং সুপাঠ্য হবার জন্যে কমপক্ষে যেটুকু দরকার তার বেশী কবিদের
কাছ থেকে আমাদের দাবী করা উচিত নয়। দুই বা ততোধিক
স্বরের মিল কবিতায় প্রত্যাশা করলে আমার মতে কবিদের প্রতি
নিতান্ত অবিচার করা হয়। আমি বলি কানটাকেই প্রাধান্য
দেওয়া। কেন [illegible] "অন্ধকার"-এর সঙ্গে "বন্ধদ্বার" মিল দেখে
আমরা তারিফ কেন করবো? এবং কবিদের কাছ থেকে এ জাতীয়
মিল আমরা চাইবোই বা কেন? প্রাচীন বাংলা কাব্যে মিলের এত
কড়াক্কড় ছিল না। ভারতচন্দ্রের আগে পর্য্যন্ত সব কবিই মিল বিষয়ে যথেষ্ট
স্বাধীনতা ভোগ করে গেছেন।......কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর কাশীরাম
দাসের মহাভারতে দুই স্বরের মিলটাই বরঞ্চ ব্যতিক্রম, কিন্তু তদ্দ্বারা বাঙালি
পাঠকের কোনদিন সে-সব বই উপভোগে বাধা জন্মেনি। ভারতচন্দ্র এবং
ঈশ্বর গুপ্ত যে দুজন কবি আধুনিক বাংলা কবিতায় বহুস্বরের মিল প্রচলনের
জন্য প্রধানত দায়ী তাঁদেরকে কেউ প্রথম শ্রেণীর কবি বলবে না...।'
বুদ্ধদেব বাবু বলিতেছেন, 'বাংলায় সব মিলই যে যুগ্মস্বরের মিল কিংবা
ইংরেজিমতে 'মেয়েলি' মিল একথা আজকের দিনে নতুন নয়। অবশ্য
এই যুগ্মমিলের প্রবর্ত্তন রবীন্দ্রনাথই করেন, প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে একমাত্রার
মিলে কারু কানে খটকা লাগতো না।'

বাংলা কবিতায় মিলের যে নিয়ম প্রচলিত তাহা এই যে হসন্ত শব্দের
ক্ষেত্রে অন্তস্থিত ব্যঞ্জন ধ্বনি ও উপান্ত স্বরে (যথা মন-বন) এবং স্বরান্ত
শব্দে অন্তস্বর ও উপান্ত স্বরে মিল থাকিতে হইবে (যথা 'আঁখি-পাখী'।—
ইহাকেই বুদ্ধদেববাবু যুগ্মস্বরের মিল বলিয়াছেন)। অজিতবাবু স্বরান্ত শব্দে ও
এ[illegible]স্বরের মিলের পক্ষপাতী এবং এই মতের আন্তরিক সমর্থন তিনি বুদ্ধদেব-
বাবুর নিকট পাইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে 'দেখি-পাখী'র মিলে
আপত্তি হওয়া উচিত নয়। এ-সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্ব্বে যে তথ্য তাঁরা
দিয়েছেন সে-সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন।
[illegible]মতঃ 'রবীন্দ্রনাথ' যুগ্মস্বরের মিলের প্রবর্ত্তক, বুদ্ধদেববাবুর এই উক্তি
সত্য নয়। অজিতবাবু যুগ্মস্বরের মিলের জন্য ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বরগুপ্তকে
প্রধানত দায়ী করিয়াছেন এবং কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাসের কাব্যে দুইস্বরের
মিল ব্যতিক্রম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যুগ্মস্বরের মিলের জন্য
ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বরগুপ্তকে দায়ী করাও সঙ্গত নয়। [illegible] শব্দে যুগ্মস্বরের
মিল বাংলা কাব্যের জন্মাবধিই রহিয়াছে এবং নিয়ম হিসাবেই রহিয়াছে—

ব্যতিক্রম হিসাবে নয়। প্রাচীন চর্য্যাপদ থেকে আরম্ভ করি... পর্য্যন্ত কোন সমিল কাব্যেই যুগ্মমিল ব্যতিক্রম হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই। অনেক দৃষ্টান্ত দিবার স্থান নাই এবং প্রয়োজনও নাই। যুগ্মমিল যে প্রথমাবধিই বাংলা কাব্যে ছিল তাহার সামান্য উদাহরণ দেওয়া গেল।

'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ
লুই ভণই-গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥' — চর্য্যাপদ

'জোণ্হ গোএর আলো জালা
আগন পোথী ইষ্টামালা

'কেনা বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে
কেনা বাঁশী বা এ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে — শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

যে বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার কবিতার অনুকরণে ব্রজবুলির উৎপত্তি তিনিও মৈথিলী ভাষায় লিখিতেছেন:

আজু মঝু শুভদিন ভেলা
কামিনী পেখনু সনানক বেলা
চিকুর গরয়ে জলধারে
মেঘ বরিখে জনু মোতিমহারে

তেঁই উদসল কুচ জোরা
পলটি বৈঠাবল কনক কটোরা
নীবিবন্ধ করল উদেশ
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ।

বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলীতে মিলের নমুনা হিসাবে দেওয়া যায়: দেহ-সন্দেহ; দাসিরে-অভিলাষিরে; পরতীতরে-নীতরে; গাঞা-পাঞা; অঙ্গপরসঙ্গ; কাঁতি-রাতি।

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কনের মিলের নমুনা: নাদ-বিষাদ; অন্ধকার-আপনার; পুরীতে-চমকিতে; গর্জ্জন-কোনজন; রজনী-জননী ইত্যাদি।

মালাধর বসু: বিনয়—বিজয়; বচন—সর্ব্বজন; ঠাঞী—চাই; চ...—রচন; জননী—পালনী

কৃত্তিবাস ওঝা: কূলে—বুলে; বায়—তথায়; বসতি—সন্ততি; ...—বিদিত; মুরতি—অবগতি; ঘোড়া—জোড়া; পাছে—আছে; সুখে—সম্মুখে; অবতার—চমৎকার।

অতএব দেখা যাইতেছে যুগ্মস্বরের প্রাধান্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত এইরূপ কোন আধুনিক কবিকে দায়ী করা ভুল। একস্বরের মিলটা সর্ব্বকালেই বাংলাকাব্যে ব্যতিক্রম তবে ইঁহাদের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম। রবীন্দ্রনাথে একস্বরের মিল খুবই কম। ভারত... নাই। তবে যুগ্মস্বরের মিলের প্রয়োগভঙ্গীর গুণে ইঁহাদের কাব্যের ধ্বনি সুমধুর হইয়াছে। অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রে একস্বরের

...আরও বেশী মিলি... সত্য কিন্তু তাঁরাও যে একস্বরের মিল ব্যতিক্রম হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাওয়া যাইবে তাঁহাদের কাব্যেও যুগ্মস্বরের মিলের অতিমাত্রায় প্রাধান্যে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যুগ্মস্বরের মিল প্রথম হইতেই বাংলা কাব্যে রহিয়াছে এবং আজ ...র বছর ধরিয়া নিয়ম হিসাবে চলিয়া আসিতেছে। বাংলাকাব্যে ...সভোক্তাদের মিলের দিক দিয়া কানের সংস্কার যুগ্মমিলের আশ্রয়েই তৈরী হইয়াছে। অজিতবাবু বলিতেছেন, 'যাঁরা মিল দিয়ে পদ্য লেখেন তাঁরা জানেন যে বাংলা প্রচলিত শব্দের মধ্যে তিন-চারটির বেশী একরকম মিলের কথা খুঁজে পাওয়া কত শক্ত।' বুদ্ধদেববাবু বলিতেছেন, 'একথা সত্য যে বাংলা ভাষায় মিলের ঐশ্বর্য্য স্বভাবতই খুব বেশী…।' উভয়েই কবি এবং যুগ্মস্বরের মিল দিয়াই এপর্য্যন্ত উভয়েই (বুদ্ধদেববাবু 'দময়ন্তী'তে ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন বলিতেছেন) কবিতা রচনা করিয়াছেন, দুই জনের এই বিপরীত মতের সামঞ্জস্যসাধন সম্ভব কিনা তাহা তাঁহারাই বিচার করিবেন। আমাদের অর্থাৎ পাঠক সম্প্রদায়ের কানে যতক্ষণ না আঘাত লাগিবে ততক্ষণ মিল লইয়া আমাদের নালিশ করিবার কোন হেতু নাই।

অজিতবাবু বলিতেছেন, 'কানটাকেই প্রাধান্য দেওয়া কেন?" কিন্তু কবিতায় কানটাকেই প্রাধান্য না দিলে চলিবে কেন? 'মৃদুমুখী যূথিকার' সঙ্গে 'সিধুমুখা স্তবিকা'র মিলে যে আপত্তি তিনি করিতেছেন বা রবীন্দ্রনাথের 'তাহা—আহা' তে যে তাঁর আপত্তি তাহাও তো কানকে আশ্রয় করিয়াই। যুগ্মস্বরের মিল ভালো কি মন্দ সে বিচারে কানই প্রধান। চোখের যে সংস্কার আমাদের আছে বলিয়া অজিতবাবু ও বুদ্ধদেববাবু বলিতেছেন তাহাই বরং ভুল। সংস্কারটা কানের; কবিতাপাঠকের কাছে চোখের সংস্কারের কোন দামই নাই। 'দৃষ্টিকটু' হইলে কোন ক্ষতি নাই সেটা ছাপার অক্ষরের ব্যাপার, 'শ্রুতিকটু' বলিয়াই 'দেখি-পাখী' মিলে আপত্তি। যদি কোন কবিতায় অজিতবাবু বা বুদ্ধদেববাবু বা আমি ... কবি '...পাখী'তে মিল দিয়া তাহা শ্রুতিমধুর করিয়া রসোত্তীর্ণ করিতে পারেন তবে সেখানে এই মিল নিশ্চয়ই গ্রাহ্য। কবিতা সাধারণতঃ সকলেই জোরে পড়িয়া থাকেন—অন্ততঃ পড়া উচিত—মিল বা ছন্দে বাধিলে তাহা কানেই প্রথম ঠেকে এবং রসগ্রহণে মন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই আপত্তি উঠে। কানের প্রয়োজনটা এত বড় যে আমরা অনেক সময় শুধু চোখ নয় ...ধান উচ্চারণরীতি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করি। ছন্দের প্রয়োজনে (এ... সেটা ... প্রয়োজনেই) উচ্চারণরীতি যে উপেক্ষা করি তার উদাহরণ কবিতায় অনেক মিলিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়—

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা

ছন্দের খাতিরে 'অনঙ্গ' শব্দের 'ন'-তে জোর দিতে হয় এবং এখানে জোর দেওয়া এই শব্দটির স্বাভাবিক উচ্চারণ রীতি-বিরুদ্ধ। বলাবাহুল্য ইহা কবির ত্রুটিই বলিতে হইবে। স্বাভাবিক উচ্চারণ রীতি অব্যাহত রাখিয়াই ছন্দ গঠন করা সঙ্গত। তথাপি পড়িবার সময় আমরা কানকে খুসী করিবার জন্য 'ন'-তে জোর দিয়া পড়ি। বুদ্ধদেববাবু বলিয়াছেন

বিপদমাঝে ঝাপায়ে পড়ে
শোণিত উঠে ফুটে
সক[illegible] দেহে সকল মনে
[illegible]বন জেগে উঠে।

'এখানে "উঠে" মানে 'ওঠে' উচ্চারণও তাই, অন্তত তাই হওয়া উচিত।' কিন্তু একথা শুনিলে বিস্মিত [illegible]ইব না যে রবীন্দ্রনাথ যখন এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন অন্ততঃ তখন তিনি [illegible] তাঁর স্বদেশবাসী সকলেই পড়িবার সময়ও 'উঠে'ই পড়তেন। প্রথমতঃ শব্দের উচ্চারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে বদলাইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ অনেক শব্দের বানান এবং উচ্চারণ সাধু এবং চলতি ভাষায় বিভিন্ন। বাঙ্গলা সাহিত্যে চলতি ভাষা সম্প্রতি যে অত্যধিক মর্য্যাদা পাইতেছে তাহার ফলে তাহাতে অনেক শব্দের চলতি বানান এবং উচ্চারণ তাহার সাধু বানান এবং উচ্চারণকে ক্রমে অপ্রচ[illegible] করিয়া দিতে পারে এ-সম্ভাবনার উদ্ভব হইয়াছে। কবিতাতে মিলের প্রয়োজনে স্বাভাবিক উচ্চারণনীতি পর্য্যন্ত যদি লঙ্ঘন করা চলে তবে দুই উচ্চারণ-রীতি আছে এমন শব্দের যে উচ্চারণে মিল নষ্ট না হয় সেই উচ্চারণই নিশ্চয় বিধেয়। অবশ্য যদি কোন শব্দের সাধু উচ্চারণ চলতি উচ্চারণের বহুলপ্রয়োগের ফলে ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া যায় তখন মিলের প্রয়োজন লঙ্ঘন করিয়া কোন কোন স্থলে প্রচলিত চলতি উচ্চারণ মানিয়া পড়িলে হয়ত তাহা দোষের না হইতে পারে বিশেষতঃ যেখানে মিলের নিয়মভঙ্গের চেয়েও প্রচলিত উচ্চারণ-রীতি ভঙ্গ কানে বেশী আঘাত করে। বুদ্ধদেববাবুর উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে 'উঠে'র উচ্চারণ 'ওঠে' হওয়া উচিত একথা [illegible]স্বীকার্য্য মানিয়া লইতে পারিতেছি না। এখানে 'উঠে' [illegible] 'উঠে' উচ্চারণ অন্যায় নয় কেননা এই উচ্চারণ সাধুভাষাসম্মত এবং এই উচ্চারণে মিলও বজায় থাকে। 'ভালো মিলের আবশ্যিক [illegible]গিদে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) মতো বিরাট প্রতিভাকেও কখনো কখনো বিপদে প[illegible] সেটা ভালো মিলের দোষ নাও হইতে পারে। কবিতা লিখি[illegible] বাধা [illegible]পদ অনেক। বাধাবিপদ অবহেলায় অতিক্রম করিয়া মহৎ কাব্য সৃষ্টি করিতে পারেন বলিয়াই ত শ্রেষ্ঠ কবি শ্রেষ্ঠ শিল্পী। বু[illegible] কবি হইয়া এ-তথ্য নিশ্চয়ই জানেন। মিল দেওয়াই যদি বিপদ হয় তবে কাব্যসৃষ্টিতে এর চেয়ে ঢের বড় বিপদেরও অভাব নাই। ছন্দ, ভাব এগুলিও [illegible] সামান্য বস্তু বিবেচনা করিবার হেতু নাই। বুদ্ধদেববাবু যুগ্মমিলের বিপদের উল্লেখ

করি[illegible], 'Swallowing the camel but straining at a gnat' এই ইংরেজী বাক্যটি মনে পড়ে।

অজিতবাবু রবীন্দ্রনাথের 'লাগিয়া-ভাগিয়া' মিলের উল্লেখ করিয়াছেন [illegible] বুদ্ধদেববাবু 'আলা-বালা'র উল্লেখ করিয়াছেন। 'গুপ্তপ্রেম' কবিতায় 'লাগি[illegible]—ভা[illegible] যুগ্মস্বরের মিল বলিয়া শ্রুতিকটু নয়। 'ভাগিয়া' শব্দটার humorous [illegible]ciation এই বিশেষ কবিতার context-এ কানের ভিতর দিয়া মনকে আঘাত দেয় বলিয়াই এই শব্দটি ঐ বিশেষ কবিতায় শ্রুতিকটু। 'পুরস্কার' কবিতায় এই যুগ্মমিলনটি রসোত্তীর্ণ হইতে পারিত। আবার এমনও হইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ ঠিক যুগ্মমিলের প্রয়োজনে এই মিল দেন নাই। Non-humorous context-এ 'ভাগিয়া' শব্দটি তিনি আরো ব্যবহার করিয়াছেন। 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' গানের শেষ চরণে আছে 'কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে।' [illegible] জনের ভাষায় যে শব্দের সঙ্গে লঘু হাস্যোদ্দীপক ভাব জড়াইয়া আছে তেমন শব্দ গম্ভীর কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত আছে 'পূরবী'তে 'ইটালিয়া' কবিতায়:

উতারো ঘোমটা তব
বারেক তোমার কালো নয়নের আলোখানি দেখে লবো,

এখানে 'উতারো' মিলের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় নাই।

বুদ্ধদেববাবু বলিতেছেন, "মিলের খাতিরে শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ বিকৃত করতে রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো বাধ্য হয়েছেন:

দুগ্ধফেনশয়ন করি আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা ('সোনার তরী'—'নিদ্রিতা')

'আলা' কথাটি এখানে একটু শ্রুতিকটু তাতে সন্দেহ কী। 'আলো' বলতে পারলে কত ভালো হত।" বাস্তবিক কানে কানে কত তফাৎ তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। আমার কাছেত মনে হয় 'আলো' কথাটি এখানে চলিতে পারে না তার একাধিক কা[illegible] মধ্যে [illegible] প্রয়োজন[illegible]। 'আলা' এখানে সার্থক। 'আলা' উচ্চারণটি কি 'আ[illegible]' শব্দের বিকৃত [illegible] বুদ্ধদেববাবু কি 'আলা' শব্দটি ইতিপূর্ব্বে শুনেন নাই? বাংলাসাহিত্যে 'আ[illegible]' শব্দটির এত প্রাচুর্য্য যে তিনি এই শব্দটি ইতিপূর্ব্বে প্রান [illegible] বটে! রূপকথায় 'আলা' শব্দটি অহরহই তো পাওয়া [illegible] প্রাচীন সাহিত্যেও ইহার অসদ্ভাব নাই, 'চণ্ডীকাব্যে' আছে 'দীপ উজারিনু ম[illegible] হইল আলা।' কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর 'ধর্ম মঙ্গলে' [illegible]ছে 'ভুবন করিছে [illegible]' [illegible]বিতায়ও আছে

তোরা নিসাড়া হইয়া আয়লো সজনী
আঁধার করিয়া আলা
আলার ভিতর কালাটি আছে
চৌকী রয়েছে তথা—ইত্যাদি

কাজেই 'আলা' 'আলো'র বিকৃত উচ্চারণ নয়। 'আলা' শব্দটিতে রবীন্দ্রনাথ যে রূপকথার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন 'আলো' ব্যবহারে তাহা নষ্ট হইয়া যাইত। এখানে 'আলা' স্থলে 'আলো' ব্যবহার করা আর সাত সমুদ্র তের নদী পারে ঘুমন্ত রাজকন্যার জন্য নিদ্রিত পুরীতে বিজলী বাতি জ্বালাইয়া রাখা যেন একই প্রকারের রসভঙ্গ করা।

অজিতবাবু মিলটাকে একটা অলঙ্কার বলিয়াছেন। '[illegible] কবিরা এ অলঙ্কারের ব্যবহার খুব কমই করেছেন।……কারণ এখন আজকালকার আধুনিক মেয়েরাও জানেন সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্য বেশী গয়না পরার দরকার হয় না।' যেখানে কবিতা শুধুই মিলসর্ব্বস্ব ভাবরসহীন সেখানে মিলের বাহার যে কবিতাকে ব্যঙ্গ করিতে থাকে ইহা সত্য। কিন্তু কুৎসিত রমণীর পক্ষে রুচিবিহীন অলঙ্কার পরিধান সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক নয় এই যুক্তিতে সুন্দরী নারীর রুচিসঙ্গত অলঙ্কার পরিধান বাতিল করা কি সুযুক্তির পরিচায়ক? 'আজকালকার আধুনিক মেয়েরা' কি জানেন বলিতে পারি না কিন্তু তাঁহাদের যতদূর দেখিয়া থাকি তাহাতে পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আভরণ বিশেষতঃ কর্ণাভরণের বৈচিত্র্য এবং বাহুল্য দেখিয়া মনেত হয়না যে তাঁহারা সত্যি বিশ্বাস করেন যে, 'সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্য বেশী গয়না পরার' প্রয়োজন হয় না। আসল কথা অলঙ্কারেরও মূল্য আছে। অলঙ্কার সৌন্দর্য্য বাড়ায় তবে যে বস্তুর সৌন্দর্য্য বাড়াইবে—নারীদেহেরই হোক বা কাব্যরূপেরই হোক—তার সঙ্গে অলঙ্কারের সংযোগটি মানানসই এবং রুচিসঙ্গত হওয়া চাই। অলঙ্কার দ্বারা কুরূপ অনেক ক্ষেত্রেই ঢাকা যায় না সত্য, যেমন যুগ্মমিলের বাহার দিয়া কাব্যহীনতা ঢাকা যায় না! কিন্তু অক্ষম কাব্যের মিল দিয়া মিলের মূল্য বিচার করিব কেন? বিশেষতঃ অজিতবাবু যেভাবে মিলের উল্লেখ করিয়া বিচার করিয়াছেন তাহা খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। সমগ্র চরণ উদ্ধৃত না করিয়া মিল বিচার করিলে তাহাতে কিছু বুঝা যায় না। 'কাল[illegible]', '[illegible]নিদেন-জিতেন,' 'বুঝি-ঠিকুজি' 'অকালে-বকালে' এই মিলগুলি যেভাবে কবিতায় ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পড়িলে পাঠকের কর্ণ পীড়িত হয় না। প্রথম মিলটি 'লক্ষীর পরীক্ষা' হইতে সংগৃহীত এবং বইখানা পড়িবার সময় এই মিলটি 'সব চেয়ে [illegible] না-করবার [illegible]'[illegible]। বাকীগুলি 'পাতালকন্যা' হইতে উদ্ধৃত। পাঠকের সুবিধার জন্য কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মাইকেলে এক যতি যখন [illegible] অকালে
তাই শুনে তো এদের দলই মেলাই বকালে ৩৭পৃষ্ঠা
'উষঃকালে তব নাম মানুষে স্মরিবে চোখ বুজি
দুর্ভাগা, দুর্ভাগ্য তব, রাহুময় তোমার ঠিকুজি ৬৯পৃ

'আর কিছু নাই হোক—বি-সি-এস টাও তো নিদেন
হবে বলে ভেবেছিনু, বিজনের ছেলে যে জিতেন
সে-[illegible]তো মুন্সেফ হলো,—তার কাছে এ ছেলে তো সোনা।' ৩৮ পৃষ্ঠা

এই মিল কাব্যপিপাসু চিত্তে কোন বাধাই জন্মায় না। সবগুলিই যুগ্মস্বরের মিল, [illegible] [illegible]ড়িয়া [illegible] হয় না কবিকে দুয়ারে খিল লাগাইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্যে ইহাদের খুঁজিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। 'চোদ্দখানা ডিকসনারি'র জোরে যে বৈদ্যনাথ পদ্য লেখে তার কবিতায় 'নিসনি'র সঙ্গে ধ্বস্তি[illegible] মিল শুনিয়া অবশ্য আমরা অজিত বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াই হাসিয়াছি, কিন্তু এই জাতীয় মিল মাত্রেই হাস্যকর নয় তাহা সার্থকপ্রয়োগ দেখিলেই বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের এইখানেই কৃতিত্ব। তিনি যুগ্মমিলের সৌন্দর্য্য অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়াইয়াছেন। অসাধারণ উদ্ভাবনীশক্তি দ্বারা মিলেও আমাদের চমক দিয়াছেন। যে অপ্রত্যাশিত চমক কাব্যরস উপভোগকে বিশেষ এক প্রকার বিস্ময়ানন্দ দ্বারা মূল্যবান করে সে চমক অনেক [illegible] শুধু মিলের দ্বারা তিনি আমাদের দিয়াছেন:

এতদিন-যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে
দেখা পেলাম ফাল্গুনে।'

'মিছে ডাকো, মন বলে আজ না;
গেল উৎসব-রাতি ম্লান হয়ে এল বাতি
বাজিল বিসর্জ্জন-বাজনা।'

'অন্ধকার বন্ধদ্বার'ও নিম্নলিখিত লাইনে রসোত্তীর্ণ ই হইয়াছে:

'কুটীরে কুটীরে বন্ধদ্বার
নিভৃত রজনী অন্ধকার' ইত্যাদি

ইংরেজী মিলের কথাও অজিত বাবু উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে তুলনা এ ক্ষেত্রে মোটেই খাটে না। প্রথমতঃ, ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি এবং বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতি এক নয়। একটি ব্যঞ্জনবহুল, আর একটি স্বরবহুল, একটির ব্যঞ্জনধ্বনির চেয়ে আর একটির ব্যঞ্জনধ্বনি ঢের কোমল। [illegible] কথায় [illegible] ধ্বনিরূপের জাতি আলাদা, ছন্দমিলের নিয়ম এবং ঐতিহ্য বিভিন্ন। তথাপি ইংরেজী কাব্যেও যুগ্মস্বরের মিলের অভাব নাই। যে স্যুইনবার্ন-এর দৃষ্টান্ত অজিত বাবু দিয়াছেন তিনিই যুগ্মমিল এমন কি তিন স্বরের মিলও অতি সার্থকভাবেই [illegible]য়াছেন। 'Dedication 1865' এই কবিতাটির ৫২টী মিলের মধ্যে অন্ততঃ ২৪টী মিলই যুগ্মস্বরের। নমুনা হিসাবে কয়েকটীর উল্লেখ করা গেল: grey-leaf—bay-leaf; miss you—kiss [illegible] [illegible]meward, classtime—pastime; fainting—pain[illegible] [illegible]overs—lovers; gracious—spacious; repayment—raiment; lost [illegible]ng; one light—sunlight; [illegible] time [illegible] rhymes, [illegible]তি বিস্তরে। এখানে বলা প্রয়োজন

কবিতাটি হাস্যরসাশ্রিত নয়। এই যুগ্মমিল অবশ্য ব্যতিক্রম হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে স্যাইনবার্নের কাব্যেও। মূল নিয়ম ইংরেজীতে একস্বরের মিলই, যেমন বাংলা কাব্যে যুগ্মস্বরের। বাস্তবিক ইংরেজী ছন্দে মিলের প্রয়োজনীয়তা বাংলা ছন্দের চেয়ে অনেক কম। মিলটা ইংরেজী কাব্যের গোড়ায় ত একরকম ছিলইনা। প্রাচীন ইংরেজী কাব্যে মিল নাই বলিলেই চলে। মধ্যযুগে চসার-এর আমলে বিদেশ হইতে এবং বিশেষ করিয়া নর্মান-ফ্রান্স কর্ত্তৃক ইংলণ্ড বিজয়ের পর ফরাসী প্রভাবে ইংরেজী কাব্যে মিল জাঁকিয়া বসিয়াছে, তথাপি প্রায় প্রত্যেক যুগেই মিলের জবর দখলের বিরুদ্ধে অ... ক্ষর বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবিরা অনেকেই মিলকে পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছেন, তথাপি মিলের প্রতাপ এত বেশী যে জেরাড্ ম্যানলী হপকিন্স-এর দৃষ্টান্তে অনুপ্রেরিত অতি আধুনিক কাব্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং পরেও মিলের ক্ষমতা একেবারে উৎখাত করা সম্ভব হয় নাই। আমাদের কাব্যে মিলের ইতিহাস আলাদা। ভারতবর্ষের দেশীয় ভাষাগুলির কাব্য সম্বন্ধে বোধ হয় এই কথা সর্ব্বত্রই খাটে। অন্ততঃ বাংলা, মৈথিলী, হিন্দী সম্বন্ধে তো খাটেই। মিলটাই আমাদের কাব্যের স্বধর্ম্ম, বিশেষ করিয়া যুগ্মমিল। এদেশের শ্রেষ্ঠ কবিরা এপর্য্যন্ত যুগ্মমিলকেই সিংহাসন দিয়া আসিয়াছেন। একস্বরের মিল বা মিলহীনতা ব্যতিক্রম এবং বৈচিত্র্য হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই আজ যদি অক্ষম কবির হাতে যুগ্মমিলের অগভীর অতিমাধুর্য্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোন প্রতিভাশালী কবির হাতে এক স্বরের মিল সম্পাদনেই প্রকাশ পায় এবং সেইভাবেই কাব্যরস সৃষ্টি সফল এবং সার্থক হয় তবে বৈচিত্র্য হিসাবে ঐ কাব্যে একস্বরের মিলের দাম থাকিবে; একটা নূতন সর্ব্বজন ও সর্ব্বকালগ্রাহ্য ঐতিহ্যে পরিণত হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বুদ্ধদেববাবু ঠিকই বলিয়াছেন "আমাদের কাব্যে যুগ্মমিলই প্রধান হয়ে থাকবে।" বরং ইংরেজীতে যুগ্মস্বর তিন স্বরের মিল দ্বারা সে ভাষার কবিরা যে-রূপ বিচিত্র রস-সৃষ্টি করিয়াছেন বাংলায়ও সেভাবে মিলকে ব্যবহার করা চলিতে পারে। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ তাহা কিছু কিছু করিয়াছেন। হাস্যরস পরিবেশনে যুগ্মস্বরের ও তিন স্বরের মিল বহুল প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতায়ও যুগ্ম এবং বহু স্বরের এই মিল প্রয়োগ সার্থক হইয়াছে। 'শ্রাবণের পত্র' (মানসী) কবিতায়

'শ্রাবণে ডেপুটিপনা
এতকভু নয় স...
তন প্রথা, এ যে অনাসৃষ্টি অ...'

'পুরস্কার' কবিতায়

'তারপর এল ...
গণনায় রাজা চমৎকার
টাকা ঝনঝন ঝনৎকার
বাজাতে সে... চলি'

অথবা

'দেখি সে মুরতি গর্বনাশিয়া
কবির পরান উঠিল ত্রাসিয়া
পরিহাসছলে ঈষৎ হাসিয়া
কহে জুড়ি করপুট'

অজিত বাবু নিধুবাবুর টপ্পা এবং হেমচন্দ্র, দেবেন্দ্র সেনের কবিতা হইতে একস্বরের মিল উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে উদ্ধৃত লাইনগুলিতে একস্বরের মিল আমাদের কানে খারাপ ঠেকে না বরং ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে এক স্বরের মিলটাই আমাদের ভালো লাগে। তা লাগে সত্যি এবং ইহা হইতে এইটুকু বুঝি যে এক স্বরের মিলও সর্বত্র অগ্রাহ্য নয়, আর বাস্তবিক এক স্বরের মিলমাত্রেই অগ্রাহ্য ছিল না কোন দিন। কিন্তু অজিতবাবুর দৃষ্টান্ত হইতে ইহা প্রমাণ হয় না যে এক স্বরের মিল যুগ্মস্বরের মিলের চেয়েও বাঞ্ছনীয়। যে সমস্ত চরণ তিনি উদ্ধৃত করেছেন তাহাতে যুগ্ম মিল থাকিলে যে ধ্বনি এবং কাব্যরস উৎকৃষ্টতর হইত না এবিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না, অন্ততঃ হাস্যরস প্রকাশেও (হেমচন্দ্রের যে লাইনগুলি অজিত বাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হাস্যরসাশ্রিত) যুগ্মমিল যে উৎকৃষ্টতর তাহার প্রমাণ যখন রহিয়াছে

'আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ
পবিত্রপদপঙ্কে'

এখানে উৎকৃষ্টতরতার অন্যতম হেতু 'বৈয়াকরণ' এবং 'লইয়া চরণে'র মিলে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। তারপর হেমচন্দ্রের একস্বরের মিল অজিতবাবু যেখানে একটি দেখাইবেন সেখানে এই কবির কাব্য হইতেই যুগ্মস্বরের মিল অন্ততঃপক্ষে দশটি দেখানো চলিবে।

খেয়ে যায় নিয়ে যায় আর যায় চেয়ে
হায় হায় ঐ যায় বাঙ্গালীর মেয়ে

এ লাইন দুটি হেমচন্দ্রের রচনাই বটে। নিধুবাবুর টপ্পা বা কবির পাঁচালী বা ছড়ার কবিতা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। এগুলি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এসব কবিতার মাধুর্য্য তার গ্রাম্য সহজ ভাবে, খোঁড়া মিলের সেইখানেই সার্থকতা, সহজ গ্রাম্য ভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই। তথাপি কবিগানেও যুগ্মস্বরের মিল রহিয়াছে।

তুই জাত ফিরিঙ্গি জবরজঙ্গী নারব তোরে তরাতে
তুই যীশুখৃষ্টে ভজ গিয়ে মির্জ্জাপুরের গির্জ্জাতে'

এখানেও যুগ্মমিল রহিয়াছে। তারপর গোবিন্দদাস সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে

'এ সব মেড়ার মেড়া ছাগলের লোমছেঁড়া'
'এই যমুনাগঙ্গানদী এ দেশ তোঁদের হত যদি
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়'

এ সমস্ত লাইন গোবিন্দদাসেরই লেখা।

মোটকথা আধুনিক বা প্রচীন বাঙ্গালী কবিমাত্রেরই কবিতায় স্বরান্তস্বরের মিলই নিয়ম। ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বরগুপ্ত প্রথম শ্রেণীর কবি নন অজিতবাবুর এই মত বুঝিলাম। কিন্তু দেবেন্দ্র সেন বা গোবিন্দদাসই কি অজিতবাবুর মাপকাঠিতে প্রথম শ্রেণীর কবি? অজিতবাবু বলিতেছেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'যশ'-এ লিখেছেন :

কোথা যশ? কোথা যশ? কোথা যশ বলি,
আতি-পাতি খুঁজিলাম যশের বিপণি;
অলিগলি ঘুরে ঘুরে পথ গেনু ভুলি
ঝিকিমিকি গোধূলি। হোলোনা বিকিকিণি।

এ কবিতার মিল কি সত্যিই কানে আঘাত দেয়!' শুধু মিল নয় শেষ লাইনের ছন্দের ত্রুটিও কানে আঘাত দেয়না কি? দেবেন্দ্রনাথের আরও পাঁচ লাইন, উদ্ধৃত করিয়া অজিতবাবু বলিয়াছেন, 'ঐ অংশের একস্বরের মিল কোন কাব্যরসিককে বিচলিত করিবে না (যেহেতু কবিতাটি মিল বা ছন্দসর্ব্বস্ব নয়।' অজিতবাবুর এই কথায় অনেকখানি সত্য আছে। সব কবিতায় মিল বা ছন্দের স্থান সমান নয়। যেখানে তা নয় সেখানে ভালোমিল বা মন্দমিলের প্রশ্নটা গৌণ কেননা কানকে তা আঘাত করে না (যেমন অজিত বাবুর উদ্ধৃত লাইনগুলিতে করে নাই)। কিন্তু যে কাব্যে মিলের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, খোঁড়া মিলে কানে আঘাত লাগে সেখানে খোঁড়া মিল রসোপভোগে বাধা দেয় বলিয়াই তাহা অক্ষমতার পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁহার জীবনে আদিকবির প্রথম কবিতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও হয়না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে।' মিল কাব্যের আত্মার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলিয়াই তাহা তুচ্ছ করিবার বস্তু নয়।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে বাংলা কাব্যরীতির কোন্ প্রকার সংস্কারই যে বাঞ্ছনীয় নয় একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। অজিতবাবু ঠিকই বলিয়াছেন, 'হিয়া', 'গরজে', গো ইত্যাদি শব্দ এখন ভোঁতা হইয়া গিয়াছে (যদিও এক-যুগের ভোঁতা হিসাবে পরিত্যক্ত শব্দ আর একযুগে যে কাব্যরসসঞ্চার করিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত ভাষা এবং সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নয়)। অতএব এগুলি অন্ততঃ কিছুকালের [illegible] ও বর্জ্জনীয়। বাং[illegible] [illegible]র ধ্বনি-পটি

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ফলে এমন সুমধুর এবং সুকোমল হইয়া গিয়াছে, যে তাহাকে এ পথে আরও সুমধুর করা সম্ভব নয়। ছন্দ এবং মিলে অর্থাৎ কাব্যের গঠনে রবীন্দ্রনাথ যে রীতির পরিণতি দান করিয়াছেন সে রীতি তাহার সার্থকতার চরম সীমায় পৌছিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যের ধ্বনিরূপের অসাধারণ মাধুর্য্যের প্রধান হেতু তাঁর ছন্দ এবং মিল। বাংলা কাব্যের পূজারীরা যদি ধ্বনির দিক দিয়া নূতন পথ কাটিতে চান তবে বর্ত্তমানের অতিমাধুর্য্য অতি-কোমলতা তাঁহাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করিতে গিয়া কবিরা নিজেদের অক্ষমতার পরিচয় দিবেন মাত্র। তাই রুচি এবং রসের সীমার ভিতর স্বরপ্রধান মিলের মাধুর্য্য একটু কমাইয়া মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য সম্পাদনের চেষ্টা করিলে ফল আবাঞ্ছনীয় নাও হইতে পারে। অন্ততঃ সশ্রদ্ধচিত্তে আন্তরিক চেষ্টা—stunt নয়—সাধু বলিয়াই গণ্য হওয়া উচিত। তবে বৈচিত্র্যে নামে নির্দ্দয় অধ্যবসায় সহকারে বিপরীত বৈচিত্র্য নিরন্তর কর্ণে বর্ষিত না হইতে থাকিলে অসহায় বাঙ্গালী পাঠক কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবে।

দীনেন্দ্রকুমার রায়

চুয়াত্তর বছরে দীনেন্দ্রকুমার রায় লোকান্তরিত হয়েছেন। দীর্ঘ জীবন সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সেবায় নিযুক্ত থেকেও দীনেন্দ্রকুমার যে বাংলাদেশ থেকে যোগ্য সমাদর পেয়ে যাননি, তাঁর মৃত্যুর পর একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের দেশ তাঁকে জানে বাজার-চলতি গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক বলে এবং সে সব কাহিনী যদিও পড়েন হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ, তবু তার যে সাহিত্যিক কৌলীন্য কিছু আছে, সে কথা বোধ হয় কেউই মনে করেন না।

এই মনে না করার কারণটা সুস্পষ্ট। দীনেন্দ্রকুমারের রহস্যলহরী গ্রন্থমালার একটিও মৌলিক রচনা নয়—ইংরেজী ও মার্কিন গোয়েন্দা কাহিনীর ভাণ্ডার থেকে এদের বিষয়বস্তু আহৃত—এদের চরিত্র, ঘটনা, ঘটনাস্থল সবই বিদেশী। স্বভাবতঃই এগুলিকে মূল রচনার মর্য্যাদা কেউ দেন নি। অথচ মজা এই যে রহস্যলহরীর কোন বইই কোন বৈদেশিক উপন্যাসের ধারাবাহিক অনুবাদ নয়—প্রত্যেকটিই নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত আখ্যানের সমবায়ে গড়ে তোলা এক-একটি আত্মস্বতন্ত্র রচনা। আর সে রচনায় ঘটনার ঘনঘটা, চরিত্রের রহস্য-গূঢ়তা, ভাষার চমৎকারিতা কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়। 'চীনের ড্রাগন,' 'পীত পতঙ্গ', 'মাকড়সার মুড়ুলি' 'বুড়া জহুরীর কারসজী' ইত্যাদি বই আমি পড়েছি, এবং বলতে দ্বিধা নেই, থ্রিলার পড়ার যে আনন্দ, তা থেকে বঞ্চিত হইনি কোন ক্ষেত্রেই।

সবাংলা ভাষায় অনেক রোমাঞ্চকর উপন্যাস লেখা হয়েছে বিদেশী উপন্যাসের মাল-মসলা, চরিত্র ও সমস্যা বেমালুম আত্মসাৎ করে—অথচ সেগুলিকে বাংলার সাহিত্যভাণ্ডারের স্থান দিতে কারুরই কার্পণ্য হয়নি। দীনেন্দ্রকুমারও যদি রবার্ট ব্লেক আর স্মিথকে বঙ্গায়িত এবং নিউ ইয়র্ক বা মাঞ্চুরিয়ার পরিবেশ ও রঙ্গস্থলকে বঙ্গদেশে স্থানান্তরিত করে নিতেন, তাহলে হয়ত বাংলা ভাষার আসরে তাঁর অভ্যর্থনার অভাব হত না। দীনেন্দ্রকুমার তা করেন নি, এ তাঁর সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক, কিন্তু এখানেই হয়েছে তাঁর ব্যবসায়িক ভুল। বাংলা উপন্যাসে চাঁচাছোলা বিদেশ ও বিদেশী নায়ক-নায়িকা···আমাদের স্বাজাত্যবোধকে আহত করে বৈকি!

কিন্তু দীনেন্দ্রকুমারের সাহিত্যিক পরিচিতি শুধু রহস্যলহরী সিরিজেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি নিছক বাংলা বইও লিখেছেন কমসম করে অন্ততঃ খান আষ্টেক—তার ভেতর তিন খানা বই ত বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ রূপেই গণ্য হবার যোগ্য। আমি বলছি, 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীচরিত্র' ও 'পল্লীবৈচিত্র্যে'র কথা। বাংলাপল্লীর সুখ-দুঃখ, তার উৎসব-ব্যসনা, পাল-পর্ব্ব, প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার নানা টুকিটাকি জিনিষ এই তিনখানি বইয়ে এমন গভীর মমতায় এঁকেছেন তিনি—যার সত্যিই কোন তুলনা হয় না। সব গুলি অধ্যায়ই এদের এক-একটি রেখাচিত্র, কোথাও কোথাও গল্প বা ছোট গল্পের-ধাঁচ আছে, কোথাও কোথাও আছে শুধু বিবরণ, কিন্তু সমস্ত জড়িয়ে অখণ্ড ভাবে ফুটে উঠেছে যে পল্লীগ্রাম, তা যেমন প্রাণবন্ত, তেমনি মুখর।

স্বদেশী আন্দোলনের দিনে যখন আমাদের দেশাত্মবোধ তরঙ্গিত হচ্ছিল শুধু সহরে, তখন শিক্ষিত বাঙালীর চোখে খাঁটি বাংলা দেশকে তুলে ধরার দরকার হয়েছিল। একদা সওদাগরি অফিসের ও সরকারী দপ্তরখানার আকর্ষণে পল্লী বাংলাকে পেছনে ফেলে রেখে বাঙালী ভদ্রসন্তানরা দলে দলে এসে জড়ো হয়েছিলেন সহরে—পৌনে দুশো বছরের ভেতর তাঁদের সন্ততিরা খাস বাংলার সঙ্গে নাড়ির যোগ হারিয়ে সহরে মধ্যবিত্ত নামে একটা অদ্ভুত ত্রিশঙ্কু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছেন—এঁদের কাছে বাংলাদেশের আবেদন পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন দীনেন্দ্রকুমার। তাঁর বই তিনটিকে তাই শুধু উৎকৃষ্ট সাহিত্য বললেই হবে না, দেশ-দর্পণের গৌরবও দিতে হবে।

উৎকৃষ্ট সাহিত্য যে এগুলি সে সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই স্বীকৃতি রয়েছে এই trilogyর ভূমিকায়। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রশংসাও এগুলি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে এক সময় দীনেন্দ্রকুমার, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু-মণ্ডলীতে স্থান পেয়েছিলেন এবং সে সময়কার সাহিত্যিক গোষ্ঠী তাঁকে স্বশ্রেণীতে মর্য্যাদার সঙ্গেই নিয়েছিলেন। 'বসুমতী'তে তিনি যে 'আত্মজীবনস্মৃতি' লিখছিলেন, তা শেষ হয়নি—হলে তাতে এই অধ্যায়টির বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যেত। যতটা পড়েছি, এই আত্মকথা আমার খুবই ভালো লেগেছিল—সাময়িক সাহিত্য ও রাজনীতি নানা অনি বিস্তৃত তথ্য তিনি পরিবেশন করছিলেন চমৎকার ঘরোয়া ভঙ্গীতে। বহুকাল পরে তাঁর কলমে আবার ফিরে এসেছিল এই পুরাতনভঙ্গী। এই ভঙ্গীতে বাঙালী গদ্য লেখকদের বরাবরই একটা আশ্চর্য্য অধিকার দেখি—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু থেকে সুরু করে একেবারে হাল আমল পর্য্যন্ত চলে আসতে পারি অবাধে—আত্মকথা, ভ্রমণকাহিনী, রেখাচিত্র, যিনি যা লিখেছেন, সবই বেশ সহজ, সুন্দর ও সুখপাঠ্য। বোধ হয় আপন কথা, ঘরের কথা গুছিয়ে সহজ করে বলতে পারা বাঙালী চরিত্রেরই একটা বিশেষত্ব।

শুনেছি শেষ জীবনে দীনেন্দ্রকুমার ক্লেশে ছিলেন—থাকাই স্বাভাবিক। ঐকান্তিক সাহিত্য সেবা বাংলা দেশে আজো জীবনধারণের পথে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠেনি—এখনো দরজা আটক ক'রে রয়েছেন প্রকাশক সঙ্ঘ, যাঁরা লেখককে শোষণ করে তার বিনিময়ে নিজেদের তহবিল ভারী করতে কিছুমাত্র লজ্জা পান না। কিন্তু এ কথা পুরোনো। দীনেন্দ্রকুমার লোকান্তরিত হয়েছেন—তাঁর ক্লেশেরও অবসান হয়েছে, আজ তাঁর নির্মুক্ত নাম সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হবে আশা করি।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

যুগবতী-যুগবর্তী

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু,

কবিতার গত আশ্বিন সংখ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন ছাপলে সুখী হব। তিনি আপনাকে যে চিঠি লিখেছেন, সেই মর্মে আমাকেও একটি চিঠি লেখেন, আপনার অনুমতিক্রমে আলোচনাতে সেইটি থেকেই উদ্ধৃত করছি।

১।···"যুগবতী অর্থহীন···তথাপি মনে করি, কবি ইচ্ছা করেই যুগবতী লিখেছেন। তিনি যুগ শব্দটি নিয়ে শ্লেষ বা pun করেছেন।"

যুগ শব্দের 'জোয়াল' অর্থ, কবিতায় মুদ্রিত 'যুগবতী' পাঠ নিয়ে যখন সংশয় হয়, তখন সন্ধান নিয়ে জানতে পারি। ছাত্রদের অর্থবোধ করানো যাঁদের কৃত্য, তাঁদেরও অনেকে দেখছি এই অর্থটি জানতেন না। এটা প্রমাণ না হলেও লক্ষ্য করবার মতো যে 'যুগবতী' পাঠ ব্যবহার না করাতে যিনি সবচেয়ে বেশি দুঃখিত হয়েছেন তিনি এই দ্বিতীয় অর্থে 'যুগবতী'র

সমর্থন করেননি; শ্রদ্ধাস্পদ রাজশেখর বাবু যে-প্রয়োগে 'অর্থহীন' বলেছেন সেই অর্থেই তিনি এর সমর্থন করছেন।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় pun-এর যে-সব দৃষ্টান্ত সকলের মনে পড়ে সেগুলির মর্মগ্রহণ কিন্তু এত দুঃখসাধ্য নয়; সেগুলিকে একরকম সর্বজনবোধ্যই বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ সর্বজনবোধ্য ব্যতীত কোনো শব্দ ব্যবহার করতেন না, বা যুগ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ জানতেন না—এ-কথা বলা অবশ্য আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু শ্লেষ যেখানে উদ্দেশ্য, এবং যেখানে কোনো শব্দের একটি অর্থ সকলে জানেন, অন্য অর্থ অনেকে জানেন না, সেক্ষেত্রে এইরূপ প্রয়োগ তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় কিনা সেইটে বিচার করবেন।

২।…"দ্বিতীয় [জোয়াল] অর্থেই জোর দেওয়া হয়েছে, মিড-ভিক্টোরীয় যুগবতী = under mid-Victorian yoke।"

আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যদি এখানে pun করেও থাকেন তবে 'যুগবর্তী' প্রয়োগ দ্বারাই সে-অর্থ সহজেই সূচিত হতে পারে ('চরণবর্তী' ব্যবহার বোধহয় অনেকটা একরূপ অর্থে)—এবং আপাত অর্থের জন্য "অর্থহীন" প্রয়োগ দরকার হয় না।

৩।…"নপুংসক জীবে স্ত্রীত্ব আরোপ poetic license-এর বহির্ভূত নয়।"

রাজশেখর বাবুর এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে "গোরুর বিশেষণ ব'লে স্ত্রীলিঙ্গ, এ তো দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট" আপনার এই যুক্তি খণ্ডিত হয়, সে-কথা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন।

আমাদের মনে হয় 'যুগবতী' সমর্থনে কিঞ্চিৎ কষ্টকল্পনার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

প্রথম, আপাত অর্থ প্রকাশ করতে "অর্থহীন" প্রয়োগ।

দ্বিতীয়, শ্লিষ্ট অর্থ প্রকাশ করতে poetic license-এর আশ্রয় গ্রহণ। (যদি বলা হ'ত যে, এখানে 'গোরু' বলতে গাভীই বোঝাচ্ছে—সে তর্ক নিশ্চয়ই চলতে পারে—তাহলেও হ'ত; যদিও তাতেও প্রথম আপত্তি থেকেই যেত)।

রবীন্দ্রনাথ 'যুগবতী' লেখেননি এ-কথা অবশ্য আমরা ততটা জোরের সঙ্গে বলতে পারি না যতটা জোরের সঙ্গে আপনি বলেছেন যে 'যুগবতী'ই আদি ও অকৃত্রিম। 'কিন্তু তিনি এত বাধাগ্রস্ত হয়ে—"অর্থহীন" প্রয়োগ ক'রে, exception-এর কথা ভেবে চিন্তে, রসিকতা বোঝবার জন্য পাঠক অভিধান দেখবে ধ'রে নিয়ে—কথাটি প্রয়োগ করেছিলেন কি না ভেবে দেখা যেতে পারে।

আলোচ্য প্রবন্ধটি কবিতায় বেরিয়েছিল ব'লে, বইটি ছাপবার আগে, 'কবিতা'র 'যুগবতী' পাঠ ঠিক আছে কি না আপনার কাছে এই সংশয় প্রকাশ করি। এই উপলক্ষে যে আলোচনা হয় তার কোনো কোনো মন্তব্য আপনি আষাঢ় সংখ্যায় আপনার সমালোচনার অঙ্গীভূত করেছেন। এই আলোচনা সম্ভবত এই সংখ্যাতেই সমাপ্ত হবে, তাই সে-সম্বন্ধে আর যা বক্তব্য আছে তা লিখি।

আপনি লিখেছেন:

১। "যুগবতী ব্যাকরণসঙ্গত নয় সেটা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য।" (রাজশেখর বাবুর মত ঠিক বুঝতে পারিনি—তিনি লিখেছেন "ব্যাকরণসঙ্গত হলেও"—তার অর্থ দুইই হ'তে পারে—"ব্যাকরণসঙ্গত, কিন্তু…", বা "ব্যাকরণসঙ্গত যদিবা হয়")।

'যুগ' শব্দের উত্তর 'বতুপ' প্রত্যয় ব্যাকরণে নিষিদ্ধ এ-কথা কেউ বলেনি। ঐ প্রত্যয় প্রয়োগ করলে সাধারণত ('সাধারণত' বলছি এই জন্য যে, হয়ত exception আছে, বা অন্যরকম ব্যবহারও কিছু আছে), 'এঁর এইটি আছে' এইরকম বুঝি।

যথা 'গুণবতী'—যাঁর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তাঁর গুণ আছে। অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। 'যুগবতী'র অর্থ এইভাবে দাঁড়ায়, 'এর যুগ আছে'। অর্থাৎ 'যুগবিশিষ্ট গোরু', 'যুগের গোরু' নয়। 'যুগবিশিষ্ট' অর্থ আপনি করতে চাচ্ছেন না, 'যুগের' বলতে চাচ্ছেন, অতএব প্রত্যয়টি অপপ্রযুক্ত হয়েছে—এই অর্থে শব্দটি ব্যাকরণসম্মত নয় বলতে পারা যায়।

২।"…তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] হাতের লেখায় যুগবতী পেয়েছিলাম"…

রবীন্দ্রনাথ রেফ যোগ করতে ভুলে গিয়েছেন এটা অসম্ভব নয় এ-কথা পূর্বে লেখা হয়েছে। একটি কথা আপনাকে মৌখিক জানিয়েছিলাম সেটি এখানে পাঠককে জানানো যেতে পারে—রবীন্দ্রনাথের লেখার যে ছাঁদ ছিল তাতে রেফ যোগ করলেও সেটা দীর্ঘ ঈকারে বিলীন হওয়া বা হঠাৎ নজরে না পড়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

৩।…"সামান্য কোনো ছাপার ভুল হলেও তৎক্ষণাৎ সেইটা উল্লেখ ক'রে চিঠি লেখা তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] অভ্যেস ছিল "…

কোনো একটি কাগজে বহুবৎসর ধ'রে প্রতি মাসেই রবীন্দ্রনাথের লেখা বেরত, কিন্তু অনেক অসামান্য ছাপার ভুলের প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি, এ-রকমও দেখেছি।

বিনীত

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

[আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ যুগবতী-ই লিখেছিলেন, তার কারণ আষাঢ় সংখ্যাতে বলেছি। 'তর্ক দ্বারা আপাতত প্রমাণ না-করা যায় এমন কোনো জিনিসই প্রায় নেই—এ-ধরনের সমস্তার কোনো অদ্বৈত সিদ্ধান্ত অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। তবু একটা কথা বলা দরকার। শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবু 'যুগবতী'তে 'ছাপাখানার ভূতের উপদ্রব' দেখতে পেয়েছেন। আমি সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে 'যুগবতী'র জন্য যে-ব্যক্তি দায়ী, রীতিবিরুদ্ধ হ'লেও তাকে সম্পাদকীয় ভূতই বলতে হয়। কবির হস্তাক্ষরে আমিই যুগবতী পেয়েছিলাম এবং ছেপেছিলাম। ভুলটা রবীন্দ্রনাথের না আমার না বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের কে বলবে?

আর এক কথা। পুলিনবাবু স্বীকার করেছেন যুগবতী মানে 'যুগবিশিষ্ট'। যুগবিশিষ্ট' আর 'যুগের' সমার্থক হ'তে বাধা নেই। 'আমি এই যুগের' না-ব'লে যদি বলি 'এই যুগ আমার' তাহ'লে ব্যাকরণেরও ভুল হয় না, অর্থবোধেরও বাধা ঘটে না। 'আমাদের যুগ' 'আপনাদের যুগ' ইত্যাদি তো চলতি বুলি।

এ-বিষয়ে আর কোনো আলোচনা 'কবিতায়' প্রকাশিত হবে না—সম্পাদক]

সমালোচনা

মেঘদূত—রাজশেখর বসু সম্পাদিত। বিশ্বভারতী, ১॥০

যে ক'খানি সংস্কৃত গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সমাদর লাভ করেছে 'মেঘদূত' তাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু কালিদাসের এ খণ্ড-কাব্যখানি পাশ্চাত্য জগতে যে সম্মান লাভ করেছে তার বোধ হয় তুলনা হয় না। এ কাব্যখানির অনুবাদ পড়ে, সুবিখ্যাত জর্মন সাহিত্যিক শিলার (Schiller) এতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর Maria Stuart কাব্যে তিনি এ ভারতীয় রচনার প্রভাব স্বীকার করেছেন। শিলারের উল্লিখিত কাব্যে বন্দিনী রাণী মেঘপুঞ্জকে এই বলে অনুনয় করেছেন যেন, তারা দক্ষিণ দিকে উড়ে যাবার সময় একবার তাঁর প্রিয় জন্মভূমিকে তাঁর হ'য়ে অভিনন্দন জানায়। Maria Stuart ভালো করেই জানতেন যে, তাঁর পরম রমণীয় স্বদেশ ফ্রান্সে তিনি জীবদ্দশায় ফিরতে পারবেন না। এ কারণে তাঁর মেঘসম্ভাষণ বেশ গভীরভাবে করুণ রসের সৃষ্টি করেছে।

যে কাব্যখানি তার রচনাকালের কিঞ্চিদূন দেড় হাজার বছর পরেও ভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন সংস্কৃতিতে বর্দ্ধিত ব্যক্তিবিশেষকে এতখানি প্রভাবিত করেছে স্বীয় জন্মভূমিতে তার কেমন সমাদর হয়েছিলো সে সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বর্ত্তমানকালে সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত লোকে অনেকটা উদাসীন হলেও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্র সংস্কৃত কাব্যের সমাদর ছিল প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ সমাদরের

আতিশয্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলির সাহিত্যে আধুনিক কালের আগে
পর্য্যন্ত কোনো উচ্চাঙ্গের বা মৌলিক সৃষ্টি সম্ভবপর হয়নি। এ সুদীর্ঘ দেড়
হাজার বছরের সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগ কালিদাসের 'মেঘদূত' সম্বন্ধে প্রকটিত
হয়েছিল এক বিস্ময়করভাবে। 'মেঘদূত' রচনার প্রায় এক শতাব্দী মধ্যে
বৎসভট্টি নামক কোনো কবি তাঁর রচিত রাজপ্রশস্তিতে স্পষ্টত একাব্যের
অনুসরণ করেছেন। এবং তারপর প্রায় হাজার বছর ধরে ক্রমে
ক্রমে রচিত হয়েছে 'পবনদূত,' 'হংসদূত' 'কোকিলদূত,' 'ভ্রমরদূত'
ও 'পদাঙ্কদূত' শ্রেণীর অন্যূন ষাট খানি দূতকাব্য। এছাড়াও পরবর্ত্তী
কালের সংস্কৃত সাহিত্যের নানা গ্রন্থে 'মেঘদূতে'র প্রভাবের সুস্পষ্ট
পরিচয় আছে। অতএব একথা বললে বোধ হয় তা নিতান্ত অত্যুক্তি
বলে গণ্য হবে না যে, কালিদাসের এ-খণ্ড কাব্যখানি বিভিন্ন দেশকালে যে
সমাদর লাভ করেছে বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা একান্ত দুর্লভ। আর এ
ঘটনা থেকেই নিরতিশয় সত্য মনে হয় সেই সমালোচকের উক্তি যিনি
বলেছেন যে, কালিদাস যদি শুধু 'মেঘদূত' খানিই লিখে যেতেন তবু তিনি
প্রাচীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য হতেন।

এহেন সুসমাদৃত কাব্যখানিকে পুরোভাগে করে যে বিশ্বভারতী 'সংস্কৃত
সাহিত্য গ্রন্থমালা' প্রচারের অভিনব উদ্যোগ করেছেন তজ্জন্য তাঁরা
আন্তরিকভাবে ধন্যবাদার্হ। এ-গ্রন্থে মোটা বঙ্গাক্ষরে মূল 'মেঘদূতে'র শ্লোক-
গুলি আর তাদের সঙ্গে অনুবাদ দেওয়া হয়েছে; অনুবাদে যে সকল বিষয় ভাল
করে প্রকাশ করা যায় না ব'লে সম্পাদক মনে করেছেন পুনর্বার অন্বয়ের সঙ্গে
সেগুলির যথাযথ অনুবাদ ও তদানুষঙ্গিক টীকা দেওয়া হয়েছে। এরূপ
ব্যবস্থা যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকদের সুবিধার জন্য কল্পিত তা সহজেই অনুমেয়।
ভূমিকায় সম্পাদক আমাদিগকে সে বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর আশ্বাস
যে বৃথা হয়নি গ্রন্থখানি মন দিয়ে পড়লে তা বেশ বোঝা যাবে। কিন্তু এ
সত্ত্বেও বলতে হবে 'মেঘদূতের' উপস্থিত অনুবাদ খুব নিখুঁত হয়নি।

এর প্রথম ত্রুটি এই যে, অনুবাদের দুয়েকস্থানে মূলের অংশবিশেষ ছাড়
পড়েছে। যেমন ২৫ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে 'তীরোপান্ত-স্তনিত-সুভগং'
একথাটির অর্থ অনুবাদে একেবারেই স্থান পায়নি। (২) কোথাও কোথাও
অর্থকে অকারণে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে; যেমন, 'আপন্নার্তিপ্রশমনফলাঃ
সম্পদো হ্যুত্তমানাং' এর অনুবাদে সম্পাদক লিখেছেন: মহৎ ব্যক্তির ঐশ্বর্য
আপন্নের আর্তিনিবারণ করলেই সফল হয়। কিন্তু 'আপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির
আপৎ নিবারণ করাই উত্তম জনগণের সম্পদের একমাত্র ফল'
এরূপ লিখলেই হয়ত ভাল হ'ত (৩) অনুবাদের আর এক ত্রুটি
এই যে, এতে মাঝে মাঝে আনকোরা সংস্কৃত শব্দ (যে সকল শব্দ বাংলায়
সাধারণত চলে না) ব্যবহার করেও সম্পাদক অনুবাদকে একটু দুরূহ
করেছেন। যেমন, উল্লিখিত অনুবাদে 'আপন্নের' বা 'আর্তিনিবারণ' কথাটি

সাধারণ বাংলা পাঠকের নিকট দুরূহ বলে বিবেচিত হবে। এ-ছাড়াও অনুবাদক স্থানে স্থানে 'পথ' অর্থে 'মার্গ', 'মেঘ' অর্থে 'পয়োদ', 'কৃতবিশ্রান' অর্থে 'বিশ্রান্ত' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করেছেন; যাতে অনুবাদ প্রায়শ তার সহজবোধ্যতা হারিয়েছে। (৪) স্থানে স্থানে মল্লিনাথের প্রতি অতিশয় বিশ্বাসবশত অনুবাদক মূলের অর্থকে বিকৃত করেছেন। যেমন, 'আসীনানাং মৃগাণাং' এর অনুবাদে তিনি লিখেছেন, 'উপবিষ্ট [illegible]গণের'। হরিণ যে বসে, তা মল্লিনাথই দেখেছেন, অন্য কেউ হয়ত দেখেন নি। লেখা উচিত ছিল 'শায়িত মৃগগণের'; 'আস্' ধাতুর অর্থ 'শয়ন করা'ও বটে (আপ্টের সংস্কৃতইংরাজী অভিধান দ্রষ্টব্য)। এ-সকল ভুলভ্রান্তিসত্ত্বেও রাজশেখরবাবু মূল 'মেঘদূতে'র বাচ্যার্থ অর্থাৎ literal meaning মোটামুটি পরিষ্কারভাবে দিয়েছেন; কিন্তু এস্থলে উল্লেখ থাকা উচিত যে 'মেঘদূতে'র মত কাব্যের (যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থই প্রধান) ব্যঙ্গ্যার্থ না জানলে কাব্যের রস প্রায় অনাস্বাদিতই থেকে যায়। আশা করি ভবিষ্যতের সংস্করণে সম্পাদক এ অভাবটি দূর করবেন।

অনুবাদের পরেই মূলের সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলতে হয়। শ্লোকগুলি প্রায়শ নির্ভুলভাবে ছাপা হয়েছে। তবে ১০৭ম শ্লোকে 'ক্রয়াদেবং', স্থলে 'ক্রয়া এবং' ও ১১১শ শ্লোকে 'ক্রুরস্তস্মিন্' স্থলে 'ক্রূরস্তস্মিন' পড়তে হবে। আর 'অস্র' কথাটি পুনঃ পুনঃ 'অশ্র' রূপে (পৃঃ ৩৯, ১০, ৯৮, ১০১) ছাপবার কারণ কি বোঝা গেল না। 'মেঘদূতে'র কোনো সংস্করণে বা অভিধানে ঐ বানান দেখেছি বলে মনে হয় না। এ-সকল ত্রুটি বাদ দিলে সমালোচ্য গ্রন্থখানি প্রশংসার যোগ্য। এতে সম্পাদকের পরিশ্রম ও সাহিত্যানুরাগের বিশেষ পরিচয় আছে।

মনোমোহন ঘোষ

'চার অধ্যায়'

'চার অধ্যায়' রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস, 'দুই বোন' 'মালঞ্চে'র অনতিপরে রচিত। ঐ দুটি বইয়ের সঙ্গে এর সাদৃশ্য প্রথম নজরেই ধরা পড়ে। বইটি 'মালঞ্চে'র মতো প্রায় গোগাগোড়াই নাটকের চালে লেখা, চারটি অধ্যায়কে নাটকের চারটি অঙ্কে পরিণত ক'রে নিতে সামান্যই পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। 'ভূমিকা' অংশের প্রথম ক'পৃষ্ঠা ছাড়া আখ্যানরূপী রচনা নেই বললেই চলে। প্রথম অধ্যায় 'দৃশ্য—চায়ের দোকান' এই ব'লে আরম্ভ হয়েছে, হুবহু নাটকের মতো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়েরও প্রথম অংশ দৃশ্যবর্ণনা, শুধু চতুর্থ অধ্যায়

[illegible]রে কথোপকথনেই আরম্ভ, কারণ এখানে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের দৃশ্যেই ফিরে এসেছি, পুনঃবর্ণনা বাহুল্য। সমস্ত বইটিতে পাত্রপাত্রী কেবল কথা ব'লে যাচ্ছে, অবিশ্রান্ত, অনর্গল, অফুরন্ত কথা, ঘটনার সংঘাত, চরিত্রের ব্যঞ্জনা, এবং এ-বইয়ের যা মূল বিষয়, ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের দ্বন্দ্ব, সবই প্রকাশিত হয়েছে মুখের কথায়। পাত্রপাত্রী বলতে অবশ্য প্রধানত এলা-অন্তকেই [illegible]চ্ছ। ব্যাকরণের ভুল ক'রেও অন্তকে বাণী-বন্যা বলবো, এলা তার [illegible] নির্ঝরিণী নিশ্চয়ই। প্রথম অধ্যায়ে ইন্দ্রনাথের জাদুকর কথা শুনতে-শুনতে মনের মধ্যে নবরসের নৃত্য চলতে থাকে, কিন্তু সরকারের পেন্সনভোগী প্রাক্তন-দারোগা ও অধুনা-বিপ্লবী কানাই গুপ্তর মুখ দিয়ে যখন কথার আশ্চর্য তুবড়ি ছুটতে থাকে তখন সদ্য-ডাঙায়-তুলে-আনা মাছের মতো আমাদের মন দু' একবার খাবি খায় বইকি, আর শেষ পর্যন্ত বটুও যখন ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম ও আর্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে বর্ণবান বাঁকা কথা বলে, তখন স্রেফ মুখ বুজে চুপ ক'রে থাকতে হয়। মনে-মনে বলি, সকলকে দিয়ে সব কথা রবীন্দ্রনাথই তো বলাচ্ছেন, কথার উপর তাঁর এমনই দখল যে তিনি যাকেই রচনা করেন সে-ই কথার রাজ-কারিগর হ'য়ে পড়ে।

বলা বাহুল্য, কথোপকথনে ভাষার এই অপরূপ চাতুরী রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের লেখায় পাওয়া যায় না। প্রাক্-'পয়লা নম্বর' গল্পগুচ্ছে, 'চোখের বালি'তে, 'নৌকাডুবি'তে পাত্রপাত্রীরা মোটা-মুটি সংসারের পাঁচ-জনের মতো ভাষাতেই কথা বলে; গোরা-পানুবাবুর দীর্ঘতম তর্কেও ভাষা শুধু সেটুকুই পরিমার্জিত যতটুকু বিদ্বান চিন্তাশীল লোকের মুখে স্বভাবতই হ'তে পারে। এমনকি, 'চিরকুমার সভা', 'শেষ রক্ষা'র কথোপকথনের এমন যে মনোহর উজ্জ্বলতা তাও বাস্তবজীবনের সম্ভাব্যতা অতিক্রম করেনি। ভাষার অনন্যসাধারণতা আরম্ভ হ'লো 'ঘরে-বাইরে'তে ('চতুরঙ্গে'ই বলা যায়), তার চরম রূপ প্রকাশ পেলো 'শেষের কবিতা'য়, এবং তার পর থেকে 'তিন সঙ্গী' পর্যন্ত তাঁর গল্প কি প্রবন্ধ সকল গদ্য লেখাতেই 'শেষের কবিতা'র হীরক-দ্যুতি ক্ষণে-ক্ষণে আমাদের চোখ ঝলসিয়ে দেয়।

গল্পে-উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর মুখে এই ধরনের ভাষাপ্রয়োগের বিরুদ্ধে যে-সব আপত্তি তোলা হয়েছে তার উত্তরে 'শেষের কবিতা'র আলোচনাপ্রসঙ্গে কিছু বলেছিলাম। এটা সমর্থনযোগ্য দুটো কারণে: প্রথমত, এই ভাষাটাই একটা স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম, যা গল্পের গল্পত্ব অতিক্রম ক'রে নিজস্ব দীপ্তিতে আমাদের মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে, দ্বিতীয়ত, যাদের মুখে কথাগুলো বসানো হয়েছে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমনই উচ্চস্তরের বাসিন্দা যে তাদের পক্ষে মুখে-মুখে মণিমুক্তো ছিটোনো সম্ভব হ'লেও হ'তে পারে বা। কিন্তু এ-যুক্তি [illegible]াই গুপ্তর কাছে এসে ভেঙে পড়ে, স্বীকার করতেই হয় যে যে-মানুষের মুখে 'জনবৃষভের পুষ্যি বাছুর' কিংবা 'নিশ্চয়ই অ[illegible]ক্ষিত এদের [illegible]

এ-ধরনের গল্প বেরোতে পারে, তার পক্ষে জীবনের কোনো সময়েই পুলিশের সাবেোগা হওয়া সম্ভব ছিলো না।

'চার অধ্যায়ে' বাস্তবিকতা থেকে ব্যতিক্রম এইটেই একমাত্র নয়। সমস্ত চায়ের দোকানটাই কবিকল্পনা। এটা নিশ্চিত যে রবীন্দ্রনাথ কখনো কোনো দিশি পাড়ার চায়ের দোকানে ঢোকেননি, এবং জনশ্রুতি ও কল্পনা মিশিয়ে যে-চায়ের দোকান তিনি বানিয়েছেন তা আর যেখানেই থাক, কলকাতার শহরে নেই। কথাটা তুচ্ছ, কিন্তু এইরকম বৈসাদৃশ্যেই আমাদের প্রত্যক্ষদর্শনের সম্মোহনে চিড় ধরে। যেমন কিনা অখিল সম্বন্ধে আমাদের মনে হ'তে পারে যে সে না-এলেও কোনো ক্ষতি ছিলো না। কিন্তু এলোই যখন, ঘটনা-বিন্যাসে কোনো একটা ক্ষুদ্রতম অংশও যে সে গ্রহণ করলো না এতে আমাদের মনে ক্ষুদ্রতম একটু অতৃপ্তি জাগে বইকি। অখিল তার বয়সের পক্ষে অত্যন্ত বেশি ছেলেমানুষ, তার হাবভাব কার্য-কলাপের বর্ণনায় তাকে আট-দশ বছরের ব'লে মনে হয়, ষোলো কিংবা আঠারো ব'লে তাকে কল্পনা করাই শক্ত। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে অখিলের মতো এমন অনর্থক চরিত্র আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বোঝা যায়, অন্ত-এলার প্রণয়কথনের রুদ্ধশ্বাস নিবিড়তার মধ্যে মাঝে-মাঝে পাঠককে হাঁফ ছাড়বার অবকাশ দেবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ ছেলেটাকে এনেছিলেন, কিন্তু ফল উল্টো হয়েছে, অখিল অন্তুর পক্ষে যতখানি ছন্দ-পতন আমাদের পক্ষেও তা-ই। এখানে 'relief'-এর কোনোই দরকার ছিলো না।

কেন ছিলো না বলি। 'চার অধ্যায়ে'র আকৃতি নাটকের মতো, 'রাষ্ট্রবৈপ্লবিক রোমান্সে'র নাটকীয় উপাদানও এতে প্রচুর, এমনকি জায়গায়-জায়গায় মেলোড্রামার চড়া গলাও শোনা যায়, তবু এর আত্মা নাটকেরও নয়, নভেলেরও নয়, গীতিকবিতার। এমন সুতীব্র লিরিক 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' কোনোটিই নয়; সমস্ত দ্বিতীয় অধ্যায়টা একটি দীর্ঘ উত্তপ্ত প্রেমের কবিতা, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ও প্রধানত তা-ই। এলা-অন্তুর প্রণয়োপাখ্যানেই 'চার অধ্যায়ে'র মহিমা। লিরিকের স্বভাবই এই যে বাস্তব জীবনের নানা অবান্তরতাকে তা কল্পনার রসে এমনভাবে গালিয়ে নেয় যে তাদের অস্তিত্বই যেন আর থাকে না। যখন 'হে নিরুপমা' কবিতা পড়ি, তখন বৃষ্টির ছাঁটে নায়িকার শাড়ির আঁচল ভিজে যাচ্ছে কিনা এ-প্রশ্ন মনে ওঠা বর্বরতা, কিন্তু কোনো গল্পে আঁচল-ভেজার কথাটা অত্যন্ত সুসঙ্গত ক'রেই বলা যেতে পারে। 'হে নিরুপমা' বিশুদ্ধ লিরিক; 'চার অধ্যায়', প্রকৃতিতে তা-ই, কিন্তু আকৃতিতে নয়, গল্পের বাহ্যরূপের খাতিরে এতে অন্য নানা জিনিস এসেই পড়েছে, অথচ তার ফলে সব সময় গল্প জ'মে ওঠেনি, মাঝে-মাঝে লিরিকের উন্মাদক সুর গেছে কেটে। অখিল এই বেসুরের দলে, কিন্তু এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ পাওয়া যাবে তৃতীয়

অধ্যায়ে, যেখানে পুলিশ-পলাতক অতীন্দ্রের অজ্ঞাতবাসের বর্ণনা। রিয়ালিস্টিক' করতে চেষ্টা ত্রুটি করেননি কবি, 'নানা রঙের দাগ-লাগা অনেকগুলো ময়লা গামছা' পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু অতীন্দ্রের পরিবেশকে শক্ত মাটির স্তরে নামিয়ে আনবার যতই চেষ্টা করেছেন চেতন-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ততই তাঁর ভিতরকার দুর্দমনীয় কবি, পারদর্শী কল্পনার স্পর্শে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে স্বপ্নলোকে। শেষটায় যেন তিনি মরিয়া হ'য়েই এমন সব ঘটনার আমদানি ক'রে ফেললেন যাতে মেলোড্রামার মাত্রাটা একটু হয়তো অতিরিক্ত হ'য়ে পড়লো, হুইস্‌লের তীক্ষ্ণ শব্দ, ইলেকট্রিক টর্চ হাতে ইন্দ্রনাথ, 'ঝুরি-নামা বটগাছের অন্ধকার তলায়' হঠাৎ ট্যাক্সির আবির্ভাব—সবটা মিলিয়ে যেন ভিন্ন অর্থে স্বপ্নের মতো। লিরিকের ধ্যানভঙ্গ হ'লো, অথচ ঘটনার অনিবার্য গতিতে মন নিবিষ্ট হ'লো না, পাঠকের লাভ হ'লো না কোনোদিকেই।

বাংলার সন্ত্রাসবাদের রক্তবর্ণ পটভূমিকায় দুটি তরুণ-তরুণীর প্রেমের উন্মেষ, উন্মীলন ও আত্মঘাতী পরিণতি: এই হ'লো 'চার অধ্যায়'। একজন স্বভাব-সাহিত্যিক, স্বভাব-আভিজাতিক যুবক রাজনৈতিক গুপ্ত চক্রান্তের আবর্তে প'ড়ে কেমন ক'রে তার স্বধর্ম থেকে চ্যুত হ'লো, বরণ ক'রে নিলে 'জীবিকাবর্জনের দুঃখ', নিজের 'স্বভাবকেই হত্যা ক'রে সব হত্যার চেয়ে পাপ' ক'রে বসলো, এই নিদারুণ ট্র্যাজিডিই 'চার অধ্যায়'। অতীন্দ্রের এই আত্ম-বিনাশের মূল কারণ অবশ্য এলার প্রতি তার অদম্য আকর্ষণ, এবং শেষ পর্যন্তও সে যে ঐ ভয়াবহ চক্র থেকে বেরিয়ে এলো না, তারও কারণ এলা। প্রহরশেষের আলোয় রাঙা চৈত্রমাসে যে-চোখ অতীন্দ্রকে টেনেছিলো, সেখানে যে সত্যি-সত্যি তার চরম সর্বনাশের বাণীই লেখা ছিলো তা কি তখন সে কল্পনাও করেছিলো! 'যদি দুঃখ না মানতুম তা হোলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে, কিছুতে বুঝতে না তোমাকে কতখানি ভালোবেসেছি। সেই কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বোলো না ওটা দেশকে ভালোবাসা।' কিন্তু অতীন 'ভাঙলো তার স্বভাবকে', এলা 'ভাঙতে পারলে না তার পণকে যার মধ্যে সত্য ছিল না।' ঘটনার যে-ঘাত-প্রতিঘাতে এ-দু'জনের দেখাশোনা ও ভালোবাসার লীলা, শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো সেটা একটা অন্ধ গলি, তার মধ্যে মিলন অসম্ভব, এবং তা থেকে বেরোবারও উপায় নেই।

নিষ্ফল ব্যর্থতার এই কাহিনীতে পুরো মাপের উপন্যাসের কিংবা নাটকের উপাদান নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু 'চার অধ্যায়'কে সে-রকম কোনো রচনা ক'রে তোলবার সংকল্প রবীন্দ্রনাথের প্রথম থেকেই ছিলো না। [illegible] ঘনপিঙ্গল রক্তিমাকে তিনি নেহাৎ পটভূমি হিসেবেই.

…করেছেন, তার দু'একটা টকটকে রেখা যেখানে ছিটকে এসে পড়েছে তা শুধু …ন্দ্রের ব্যর্থতার বাঁকা রাস্তাটি এঁকে দেবার লাল …টুকু যখন উদ্দেশ্য, যখন এলা-অন্তর প্রালয়িক প্রণয়ই এখানে প্রধান, তখন এ-গল্প ব্রাউনিঙীয় স্বগতোক্তিতেই বলা যেতো, কিংবা 'কচ ও দেবযানীর মতো কাব্যালাপে কিংবা 'ক্যামেলিয়া'র মতো গদ্য কবিতায়। কবিতা ক'রে প্রকাশ করলে এর কিছুই ক্ষতি হতো না, বরং কাব্যের স্বল্পপরিসরে এমন অনেক জিনিস ঝ'রে যেতো যা এখানে ঢোকানো হ'… নেহাৎই উপন্যাসের কাঠামোটাকে অন্তত আপাতদৃষ্টিতে বজায় রাখতে।

'চার অধ্যায়ে'র এই বৈশিষ্ট্য কবি নিজেই অবশ্য জানতেন। 'কবিতা'র এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত একটি চিঠিতে তিনি বলছেন: 'চার অধ্যায়ের যে দিকটা আমাদের পাঠককে ভোলায় সে ওর কবিতা অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি জাদু, সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিষটা পায় সেটা ঠিক গদ্যের বাহন নয়। অন্ত আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা—নবেলের নির্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয়তো দেরী হবে।' যেমন অন্য অনেক ক্ষেত্রে, তেমনি এখানেও, তিনি নিজের যথার্থ সমালোচনার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। গদ্য পড়বার, গল্প পড়বার যে-সুখ সেটা 'চার অধ্যায়' থেকে আশা করাই অন্যায়, কবিতাহিশেবে দেখলে তবেই এর সত্য বিচার হ'তে পারে, এবং কবিতাহিশেবে পড়তে-পড়তে যে-সব অংশ অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয়, মনে-মনে সেগুলি বাদ দিয়ে নিলেও ক্ষতি নেই।

এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো **গদ্য** রচনায় স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়বাসনার এমন তীব্রতা এমন স্বচ্ছ হয়ে প্রকাশ পায়নি, যেমন পেয়েছে 'চার অধ্যায়ে'। তাঁর গদ্যবইয়ের মধ্যে একমাত্র এখানেই তিনি স্বীকার করেছেন যে 'ভালোবাসা বর্বর'। এলা অন্তর ভালোবাসার অভিব্যক্তিতে যদি কোনো অসম্পূর্ণতা থেকে থাকে তার জন্য দায়ী সমস্ত কথা ওদেরই মুখের কথায় জানিয়ে দেবার কৌশল। কখনো-কখনো এ-কৌশল ত্যাগ ক'রে সোজাসুজি আখ্যায়িকা করলেই ভালো হ'তো। নায়ক-নায়িকাদের প্রথম পরিচয়ের কাহিনীটা, ইষ্টিমারের ফর্স্টক্লাস ডেক্-এর সেই জন্মান্তর-নামী ঘটনাটা ওরাই পরস্পরকে শোনাচ্ছে। এ-প্রসঙ্গ আরম্ভ হ'লো দ্বিতীয় অধ্যায়ে, হঠাৎ অখিল এসে খামকা বাধা দিলে, শেষ হ'লো তৃতীয় অধ্যায়ের মাঝামাঝি। দু'অংশে ভাগ হ'য়ে যাওয়াতে সমস্ত ঘটনাটি যথোচিত প্র… সঙ্গে আমাদের মনে এসে ধাক্কা দিতে পারে না। তারপর কাহিনীটি বলা হয়েছে অত্যন্ত বিস্তারিত অলঙ্কৃত ভাষায়, স্পষ্টই বোঝা যা… উদ্দেশ্য পা… পাত্রীর …বর্তমান … ততটা নয় যতটা পাঠকদের অতীত … জানানো।

মাধবীর জন্য
প্রতিভা বসু

কয়েকটি প্রেমের গল্প

'লেখিকার প্রথম গল্পের বই পড়ে বিস্মিত হতে হয়। তার কারণ ভাষার সৌকর্য্য স্বকীয়তা এবং ঘটনা জমাবার শিল্প অসামান্য পরিণতরূপে দেখা দিয়েচে।…বাঙালি মেয়ের ছবিতে ভরা ছয়টি গল্প।…আধুনিকার মর্মকথা দৃঢ় রেখায় আঁকা পড়ল, অথচ রঙে রসে রচিত নবযুগের চিত্রণে একটি পরিবেদনশীল সূক্ষ্মতা আছে যা সাম্প্রতিক হলেও চিরকালের।…মেয়েদের অনন্যতাই গল্পগুলির প্রধান উপকরণ। 'বিবিধ মানসিক আর্থিক সমস্যার যোগে তাদের চরিত্রচিত্রণে লেখিকা অন্তর্দৃষ্টিশক্তি দেখিয়েচেন। মনস্বিনী তেজস্বিনী এমন বাঙালি মেয়ের পরিচয় আধুনিক সাহিত্যে বিরল। গৃহদীপে যে অগ্নিশিক্ষা আছে পুরুষেরা যদি তা ভোলে, দীপ্তির নূতন প্রকাশে তাদের ভুল ভাঙুক; অতি দুঃখের মধ্যেও গৃহরক্ষার সেইটে উপায়। প্রাণপ্রজ্বলন্ত নারীর মূর্ত্তি দেখে ধন্য হই।…"অনর্থক" গল্পের "আমি" আশ্চর্য সৃষ্টি; ঐ যে সাধ্বীর শক্তি অথচ বান্ধবীরূপেও দ্বিধা বাল্যবন্ধুকে কষ্ট দিতে—তবু কষ্ট দেওয়াই কম কষ্টের সত্য পথ—কী সুন্দর তা ফুটেচে।

…ছোটো গল্পের উৎকর্ষ আধুনিক বাংলা রচনার অন্যতম ঘটনা, "মাধবীর জন্য" বইখানি সেই সৃজনধর্মী ঘটনার বার্তা বিশিষ্ট নূতন আগন্তুক।'

…চক্রবর্তী—'**প্রবাসী**'.

…প্রচ্ছদপট: উপহারের উপযোগী। …টাকা বারো আনা

…ভবন

ছোটোগল্প
গ্রন্থমালা

'এক পয়সায় একটি' কবিতা-গ্রন্থমালার অনুরূপ একটি ছোটো-গল্প গ্রন্থমালা প্রকাশ করতে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। এই পুস্তকগুলি আকারে ও পৃষ্ঠা-সংখ্যায় হুবহু 'এক পয়সায় একটি'র মতোই হবে—অর্থাৎ ডিমাই ⅛ আকারে ১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এক-একটি গল্পে এক-একটি সংখ্যা চার আনা মূল্যে প্রকাশিত হবে। এই গ্রন্থমালায় বাংলার প্রসিদ্ধ লেখকদের অনেকেরই গল্প প্রকাশ করতে পারবো ব'লে আমরা আশা করছি। প্রথম সংখ্যা ১লা অগ্রহায়ণ কিংবা তার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।

ছোটোগল্প গ্রন্থমালায় প্রকাশের জন্য নবীন লেখকদের গল্প আমন্ত্রণ করা যাচ্ছে। গল্পগুলি কাগজের এক দিকে চলতি ভাষায় লেখা এবং যথোচিত দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং সম্পাদকের সিদ্ধান্ত জানবার জন্য উপযুক্ত স্ট্যাম্পযুক্ত ঠিকানা লেখা খাম সঙ্গে থাকা অত্যাবশ্যক।

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ,
কলকাতা

…সর বিনোদনের পর ভুলে' যাবার মতো পত্রিকা নয়,
বারবার পড়বার এবং পড়ে মনে রাখবার মতো
অপূর্ব সংগ্রহ

দিগন্ত

অজিত দত্ত সম্পাদিত শ্রেষ্ঠ পূজা-বার্ষিক
প্রকাশিত হোলো। এ সংখ্যায় আছে :
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ত্রিবর্ণ ছবি, রবীন্দ্রনাথের দু'টি
অপ্রকাশিত কবিতা এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এবং শিল্পাচার্যের
স্বহস্ত চিত্রিত একটি সম্পূর্ণ যাত্রার পালা।
তা ছাড়া আছে :
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভা বসু,
প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, মণীন্দ্রলাল বসু, সরোজকুমার রায়-
চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ, শিবরাম চক্রবর্তী, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প ;
অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, লীলাময় রায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের প্রবন্ধ ;
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি সম্পূর্ণ নাটিকা ;
ভূপতি চৌধুরীর স্মৃতিচিত্র 'কল্লোলের দিন' ; প্রায় সমস্ত বিখ্যাত
কবির কবিতা এবং
রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীদের পাঁচখানি অপূর্ব কাঠখোদাই।
দাম আড়াই টাকা
প্রাপ্তিস্থান : এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ লিঃ
১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা
ও সমস্ত স্টল

…দেবযানীর স্মৃতিমন্থনের মধুরতার সুর এখানে লাগেনি। জীবনের বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে অতীতের …া প্রবলভাবে মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু যে-দুজন ব্যক্তি সেই অতীত কাহিনীর কুশীলব তারাই পরস্পরের কাছে সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত পুনরাবৃত্তি করে না, কেননা তারা দু'জনেই তো সবই জানে। একজন একটু বললেই অন্যের মনের স্মৃতিস্রোতে জোয়ার জাগে। এ-অংশটা রবীন্দ্রনাথ ওদের মুখে না-বলিয়ে নিজেই কেন বললেন না, এ-কথা ভেবে আমাদের মনে আক্ষেপ না-জেগে পারে না। অতীন্দ্র নিজেই নিজেকে নাট্যরূপ দিচ্ছে, নিজের অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদিরও বর্ণনা ক'রে যাচ্ছে, তাও মনে-মনে নয়, সরবে, নিজেরই প্রিয়তমার কাছে, এতে কোথায় যেন একটা অসংগতি আছে, যার ফলে মাঝে-মাঝে আত্ম-সচেতনতার আতিশয্য, এমনকি আত্মকরুণাও তার চরিত্রে দেখা দিয়েছে, যদিও লেখকের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই তা ছিলো না। তৃতীয় অধ্যায়ে অতীন্দ্র বলছে, 'ঐ আঙিনায় রসে-বিগলিত নানা রঙের লীলা সমানে চলবে দিনের পর দিন, অতীন্দ্র বিলীন হয়ে যাবে পাণ্ডুবর্ণ দূর দিগন্তে।' কথাটা আশ্চর্য সুন্দর, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুখে, অতীন্দ্রের মুখে নয়।

শুধু কথোপকথনের, এবং প্রধানত এলা-অন্তর কথোপকথনের ছলে সমস্ত গল্পটা প্রকাশ করবার প্রয়াসে সমগ্র রচনায় ঈষৎ অসংলগ্নতা এসেছে। রবীন্দ্রনাথ বারে-বার আপন কথার তোড়ে গল্পকে ছাড়িয়ে কোথায় চ'লে এসেছেন, তারপর ফিরে যখন গেছেন, ঠিক মুখে-মুখে জোড়া লাগেনি। এদিক-ওদিক অনেক বাড়তি সুতো ছড়িয়ে আছে। অন্তুর জীবন-কাহিনী তারই মুখে পাঠক শুনছে, তাই এলা মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন করে, অন্তুকে দিয়ে আরো খানিকটা বলিয়ে নেয়া ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য যার নেই। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ে অন্তু যখন তার পলাতক জীবনের কথা ভারি সুন্দর সরস ক'রে বলছে, হঠাৎ এলা ঘরের কোণের সিন্দুকটার বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করলে। এমনিতে এ-কৌতূহল কিছুমাত্র অবৈধ নয়, কিন্তু ওখানে হঠাৎ যেন সুর কেটে গেলো। এবং এলার কৌতূহলের যাথার্থ্যে সন্দেহপাত …য়েই পারে না, যখন দেখি তার প্রশ্নের উত্তরে অন্তু … বললে তাতে তার …কার জীবিকাপদ্ধতি সম্বন্ধে আরো অনেক খবর জানলুম। …বে … বিশেষ রীতির বিশেষ প্রয়োজনরূপে মেনে নেয়া যায়, কিন্তু …সন্ন সর্বনাশের মুখে, প্রেমের চরমতম মুহূর্তে ২০১৫ যখন …নোকার জন্মদিনের উৎসব বৃত্তান্ত ব…তে শুরু করে, …রে, স্মৃতির ভাবোন্মাদনার …ীর গম্ভীর সুরে নয়, … গল্প বলবার ধরনে, তাও একবার নয়, দু'বার

এবং প্রসঙ্গক্রমে তার অন্ত নামের ইতিহাসটাও না শুনিয়ে ছাড়ে না, [illegible] কেমন একটা ভোঁতা দুঃখ মনের মধ্যে গুমরোতে থাকে, কোনো মহান পরিপূর্ণতার কাছে এসেও তাকে না-পাওয়ার দুঃখ। এই মৃত্যু-মুখী মহীয়া প্রেমের উচ্চতম মুহূর্তটিতেই যদি দরজায় ধাক্কা পড়তো, তা'হলে ঝনঝন ক'রে উঠতো আমাদের বুকের পাঁজরা। কিন্তু জন্মদিনের বৃত্তান্তে সুরটা আগে থেকেই অনেকটা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে ব'লে এ-আঘাতের বেদনাটা যেন ততখানি নিবিড় হ'তে পারেনি। অথচ বৃত্তান্তটার নিজস্ব রসগৌরব যথেষ্ট আছে, তাকে ছাড়তে চাই না, যথাস্থানে যথাসময়ে লেখকের মুখ থেকে তাকে পেতে চাই।

অবশ্য আমার ইচ্ছামতো কোনো বইয়ের চেহারা-বদল হবে না; এবং পূর্বেই বলেছি 'চার অধ্যায়'কে মনে-মনে কবিতা ক'রে নিয়ে পড়লে এ-সব আপত্তি স্বতই মিলিয়ে যায়। কবিতা যেমন ক'রে পড়ি এ-বই তো তেমনি ক'রে পড়বার। এক-একটি বাক্য; বাক্যাংশ, এক-একটি শব্দ বার-বার চেখে-চেখে পড়ি, তার সম্পূর্ণ স্বাদ-সৌরভ গ্রহণ করতে সমস্ত মন নিয়োজিত হয়, গল্পের পরবর্তী গতি সম্বন্ধে উৎসুক্যের স্থান থাকে না। 'রাষ্ট্রবিপ্লবী রোমান্সের অঙ্গারে আঁকা ছবি,' 'দেহে-মনে শৌখিনতার রং লেগে ছিল দেউলে দিনান্তের মেঘের মতো,' 'যেন আকাশ থেকে কোন এক অপরাধী পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনকে.' 'খবরের কাগজের পাতাগুলো ফরফর ক'রে এধারে ওধারে উড়ে বেড়াচ্ছিল,……মনে হচ্ছিল মূর্তিমতী জনশ্রুতির এলোমেলো নৃত্য'—এই ধরনের কথাগুলি শুধু ছাপার অক্ষরে প'ড়ে মন তৃপ্ত হয় না, একেবারে মুখস্ত ক'রে মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে ইচ্ছে করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে বলেছেন, 'কবি যদি ত্রিসীমানায় থাকে তাকে চাপা দেয়া অসম্ভব।' অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষে [illegible] এটাও উল্লেখযোগ্য যে 'গোরা' পর্যন্ত গল্পে উপন্যাসে তাঁর প্রবল কবি-[illegible] আপন উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে কিন্তু আখ্যানকে আচ্ছন্ন করেনি; 'চতুরঙ্গ' থেকে আরম্ভ হ'লো গদ্যের মহাদেশে কবির জয়যাত্রা, এবং যত দিন যেতে লাগলো ততই তিনি যেন আরো অদম্য, আরো অবিশ্বা[illegible] ক[illegible] হ'তে লাগলেন, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, এমনকি ছন্দ কিংবা বিজ্ঞান[illegible] আলোচনাকেও, এক কথায় সমগ্র গদ্যভূমিকে তিনি তাঁর [illegible] গীতধ্বনিত, ইঙ্গিতচ্ছটাময় নির্ভার স্বচ্ছতায় বিগলিত ক[illegible] সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বোধ হয়, 'ছন্দ' কি 'বি[illegible] ও-সব বই প'ড়ে কি ছন্দ কিংবা বিশ্ববিজ্ঞান শিখবো, [illegible] মুগ্ধ হবো, রূপকবৈচিত্র্যে আত্মহারা হবো, না কি [illegible]

মনে-মনে সেই গান শুনবো? তাঁর শেষের দিকটার কোনো গদ্য বই বেশই তাড়াতাড়ি প'ড়ে যাওয়া যায় না, ভাষাবিন্যাসের অপূর্বতা পদে-পদেই আমাদের মনোযোগ হরণ ক'রে নেয়।

রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে আর একটা কথা আমার মনে হয়। 'গোরা'র আগে পর্যন্ত তাঁর সমস্ত চরিত্র খুবই 'সাধারণ,' অর্থাৎ তারা সেই জাতের মানুষ যাদের আমরা প্রতিদিনের জীবনে আশে-পাশে দেখতে পাই। এই সাধারণ মানুষকে অবলম্বন ক'রে যে-সব সাধারণ ঘটনা গ'ড়ে ওঠে তারই ভিতর দিয়ে জীবনের কোনো গভীর সত্য দিক আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করা—এইটেই প্রকৃত গল্প লেখকের কাজ। প'ড়ে মনে হবে—'আহা তাই তো। এ-রকম আমারও চোখে পড়েছে, কিন্তু লক্ষ্য তো করিনি।' গল্পগুচ্ছের প্রায় সব গল্পই এই ধরনের। 'গোরা'তে তিনি প্রথম আনলেন অ-সাধারণ চরিত্র- অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গেই। আনন্দময়ী অতুলনীয়, গোরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। 'চতুরঙ্গ' 'ঘরে-বাইরে'তে প্রধান চরিত্র সকলেই অ-সাধারণ। 'শেষের কবিতা' থেকে 'তিন সঙ্গী' পর্যন্ত আগাগোড়া তা-ই। পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক বিপ্লবী কবি, বাণীসিদ্ধ তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিদুষীর ভিড়। (মধুসূদন ওর একটাও নয়, তবু অসাধারণ, কুমু বিদুষী না হোক, তার গভীরতা ও স্বাভাবিক পবিত্রতা অসামান্য।) এতগুলি অ-সাধারণকে ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়। বিশেষত লেখক যখন তাদের গুণগরিমার কথা নিজেই আগে থেকে বিশেষভাবে ব'লে দেন তখন পাঠকের মনে যে-প্রত্যাশা জাগে তার পূর্ণতাসাধন গল্পের ক্রম-বিকাশের গতিতে হয়তো না-ও হতে পারে, এবং বিভিন্ন লেখায় বিভিন্ন নামে ও [illegible] ই ছাঁচ দেখা দেবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। 'চার অধ্যায়ে'র ইন্দ্রনাথে [illegible] সন্দীপের আভ[illegible]স পাওয়া যায়, এলার গলায় মাঝে-মাঝে লাবণ্যর স্বর শুনি। [illegible] অনিবার্য গতিতে ততটা জেগে ওঠেনি, যতটা ফুটেছে [illegible] বর্ণনায়। এত বেশি অসামান্যতার ভার বইতে গিয়ে এরা যেন ঠিক মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে নি। বরং অতীন্দ্রকে একটা জীবন্ত মানুষ ব'লে চেনা যায়, [illegible] কারণ তার অসামান্যতা ছাপিয়ে উঠেছে তার বাসনার উদ্দামতা, তার [illegible]র বুক-ফাটা আর্তস্বর। এলা-অন্তর প্রেম যদিও অমিত-লাবণ্যর [illegible] প্রথমদর্শনজাত, এবং মোটরঅ্যাক্সিডেন্টের ফলে না [illegible]ক; [illegible] নেহাৎই দৈবক্রমে এদেরও প্রথম দেখা, তবু এই দুই [illegible]তেরই তফাৎ। 'চার অধ্যায়ে'র 'একমাত্র [illegible]খ্যানবস্তু… ভালোবাসা'—এই ভালোবাসারই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে [illegible]নি চেয়েছেন', তাঁর 'দরদ [illegible]লা অন্তর ব্যক্তিগত [illegible] রবীন্দ্রনাথের নিজের মত। সমগ্র রবীন্দ্র-

সাহিত্যে নর-নারীর প্রণয়ের উন্মুক্ত, উন্মত্ত অভিব্যক্তির ছুটি শিখর আমাদের চোখের সামনে আছে 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রথম অংশ ও 'শ্যামা' গীতিনাট্য। এর পাশে কেউ যদি 'চার অধ্যায়'কে স্থান দিতে চায় তার আবেদন কালের বিচারে হয়তো না-মঞ্জুর হবে না।

বুদ্ধদেব বসু

সাহিত্যে ও শিল্পে চিরন্তনতা

জ্যোতির্ময় রায়

সাহিত্যের মূল্যবিচার সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল না তার মধ্যে একটা সর্ব্বকালীনত্ব আছে তা নিয়ে আজ নতুন ক'রে প্রশ্ন উঠেছে। এতো [illegible] 'সত্যম শিবম সুন্দরম' সাহিত্যের সংজ্ঞা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে এবং সত্য ও শিব যেহেতু নিত্য বস্তু কাব্যরসও গণ্য হয়েছে কালমালিন্যের উর্দ্ধে। আধুনিক বাস্তববাদীরা ও-জাতীয় ধোঁয়াটে সংজ্ঞায় বিশ্বাসী নন, তাঁরা বস্তুটাকে লোকোত্তর থেকে লোকায়ত স্তরে নামিয়ে এনে বাস্তব ব্যাখ্যায় পরিচ্ছন্ন ক'রে দেখতে চান। তাঁরা বলেন সাহিত্য হ'লো সমাজসঞ্জাত বস্তু—সংঘাতের ভেতর দিয়ে সময়ের সঙ্গে সমাজের কাঠামো বিবর্তিত হচ্ছে এবং সে-বিবর্তনই নিয়ন্ত্রিত করছে সমাজ-মানসের সত্য কল্যাণ এবং রসবোধকে—অর্থাৎ সত্য শিব এবং সুন্দর সময়োচিত। রুচি-কল্যাণ রীতি-নীতি এবং রসবোধই যখন পরিবর্তনশীল তখন এক যুগের [illegible] কাব্য অন্য যুগে 'মমি'রই মতো মৃতজীবনের সাক্ষ্য দেবে মাত্র। অনে[illegible] [illegible] খাও বলেন, যে-সাহিত্যের সৃষ্টি আদর্শবাদের আওতায়, যার ভিত পর[illegible] আধ্যাত্মিক আস্থায়—যখন জানা গেল পরম ব'লে কিছুই নেই, [illegible] সই পরিবর্তনশীল তখন এই নবচেতনার আলোতে অজ্ঞতাপ্রসূত সেই আনন্দ-লোক অর্থহীন হ'য়ে যেতে বাধ্য।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য্য সত্য ব'লে [illegible] করি, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার এ-জাতীয় প্রয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি [illegible] যথেষ্ট অবকাশ আছে বলেই মনে হয়। যাঁরা জীবনদর্শনের পা[illegible] প্রাক্তন এবং [illegible]ক্তনপ্রভাবিত আধুনিক সাহিত্য[illegible] অর্থাৎ যাঁরা গাণিতিক নিশ্চয়তার সঙ্গে বলেন এ[illegible] সাহিত্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী জীবনদর্শনের জগতে [illegible] কোনো আবেদনই থাকতে পারে না, [illegible] ভিত ধ'সে

দাঁড়াবে কিসের ওপর—তাঁদের জবাবটা খুব সহজেই দেওয়া যায়। প্রকৃতির চরিত্র মানুষের বিশ্লেষণ বা তত্ত্ব আবিষ্কারে নির্ভরশীল নয়। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব বাতিল হ'য়ে গেলে বস্তুর পতনপ্রকৃতি পাল্টে যাবে না, পদার্থবিজ্ঞানের পূর্ব্বতন ধারণা অনুযায়ী বস্তু ও শক্তির বিভেদ আধুনিক মতে লোপ পেয়ে গেছে তাতে প্রাকৃতিক হালচাল কিছু বদলে যায় নি। তা ব'লে তত্ত্বজ্ঞানের পরিবর্তন মানুষের জীবনে নিষ্ক্রিয় এমন কথা আমি বলছি নে। বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এ খুবই বড় কথা, প্রকৃতিকে আয়ত্তে এনে যাঁরা প্রয়োজনে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চান। সাহিত্যিকের কারবার কি ভাবে ঘটছে তার বিচার-বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে নয়, তার বিষয়বস্তু মানুষের মৌলিক ভাবাবেগের বিভিন্ন বিকাশ নিয়ে—নৈসর্গিক বা পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনশীল ঘটনা নেহাৎই তার কাছে অবলম্বন মাত্র। স্বাভাবিক প্রয়োজন আর বৈজ্ঞানিক এ দু'য়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এই অবলম্বন তার রসসৃষ্টির যেখানে যতটুকু জুড়ে বসে ততটুকুর মূল্য যে স্থায়ী নয় সে-কথাও সত্যি।

বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন চলছে, নিমেষের জন্যে তা বন্ধ হ'লে বিশ্বটা রবীন্দ্রনাথের 'বামি'র মতোই চেঁচিয়ে উঠতো 'হারিয়ে গেছি আমি' ব'লে। এই পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে হেরাক্লিটস পাওনাদারের দেনা অস্বীকার করার মতো বাতুলতাও ক'রে বসেছিলেন—সত্যোপলব্ধির প্রথম উচ্ছ্বাসে তার প্রয়োগের এ-জাতীয় বাড়াবাড়িও হ'য়ে গেছে। পরিবর্তনও কতকগুলো অপরিবর্তনীয় বিধি মেনে চলে ব'লেই নিজেকে এবং বহির্জগতকে প্রতিমুহূর্তে নতুন ক'রে আমাদের চিনে নিতে হয় [illegible] প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন চলছে তা পরিমাণগত, এই পরিমাণগত [illegible] পুঞ্জীভূত হ'য়ে একদিন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। [illegible] রসবোধের আপেক্ষিক চিরন্তনতায় বিশ্বাসী নন তাঁদের [illegible] গুণগত পরিবর্তন আমাদের সমাজমানসে এসে গেছে, [illegible] তাকে আমূল বলা চলে না। যদি প্রশ্ন করা যায় প্রাচীন [illegible] কাব্য প'ড়ে আজও আমরা রস পাই কেন তাহলে তাঁদের জবাবটা হ'য়ে পড়ে 'মানতি পারি না' রকমের। আমরা রস যে পাই নে সেটাও নাকি [illegible]—ওটা নাকি বিশুদ্ধ সাহিত্যরস নয়; ঐতিহাসিক কৌতূহল, পুরাতনের [illegible] ইত্যাদির মুখরোচক একটা মিশ্রিত পানীয় মাত্র। আনন্দ পেলেও [illegible] মতে [illegible] পাইনি তবে সে-ক্ষেত্রে তর্ক না তোলাই শ্রেয়। তবে [illegible] কাব্যের মূল্যবিচারে প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিক মনের [illegible] ঘটে নি। বাল্মীকি, হোমার, কালিদাস, শেক্সপিয়রকে [illegible] কবি ব'লে গণ্য করি—কালপ্রবাহে অপরিবর্তিত এই [illegible] বিচারক।

সাহিত্যের কারবার মানুষের চিত্তবৃত্তি নিয়ে, অতএব সেখানে পরিবর্তনের প্রভাব কতটা পড়ে সেটাই আগে বিচার্য। সেদিক দিয়ে মানুষ যেদিন থেকে আবেগকে ব্যক্ত করতে পেরেছে উপযুক্ত ভাষায় তার পর থেকে আজ অবধি তার চিত্তধর্মে পরিবর্তন ঘটেছে তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রেম-ঈর্ষা-স্নেহ-দ্বেষ-কাম-ক্রোধ সেদিন যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, বদলেছে শুধু আবেগগুলোকে উদ্রিক্ত করার উপকরণ আর উদ্রিক্ত আবেগের প্রকাশভঙ্গী। এককালে যে ভাষা বা ভঙ্গীতে মনে প্রেম সঞ্চারিত হতো আজ হয়তো তা ক্রোধ বা হাস্যরসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপকরণ ও পারিপার্শ্বিকে এ ধরণের ক্রান্তিকারী পরিবর্তন হয়েছে অসংখ্য কিন্তু সে-পরিবর্তন মানুষের আদি চরিত্রকে স্পর্শ করে নি—কবে করবে আজও তা আমাদের ধারণাতীত। পশু বিবর্তিত হয়ে মানবীয় স্বাতন্ত্র্যে পৌঁছতে প্রয়োজন হয়েছে কল্পনাতীত কাল—মানুষ দেহে বা মনে বিবর্তিত হ'য়ে কবে চরিত্রান্তরকারী অন্য কোনো স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে বা [illegible] করবে কিনা সে-সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করার মতো সম্বল আজও আমাদের হাতে জমা হয় নি। ক্রমবিবর্তনে বানর মানুষ হয়েছে আবার বানর বানরই থেকে গেছে অতএব আকৃতি-প্রকৃতিতে নতুন শ্রেণীউদ্বোধক পরিবর্তন আসবেই জোর ক'রে বলা চলে না। যদি কোনো দিন আসে তবে সেদিন হয়তো আজকের চিত্তবৃত্তির চাহিদা তখনকার চিত্তধর্মের কাছে একেবারেই অর্থহীন হ'য়ে যাবে—এমন কি অনুক্রমের যোগসূত্রটুকু কোথাও ছিন্ন ও লুপ্ত হ'লে আমরা যে তাদের পূর্ব্বপুরুষ সেটাই অবিষ্কার করতে হবে গবেষণা দ্বারা। কিন্তু আশার কথা এই, বিবর্তনের ইতিহাসে মানুষের বয়সটা নিতান্তই নগণ্য এবং তার মূল আকৃতি-প্রকৃতির ওপর [illegible] প্রভাবটা শীতলতামুখী সূর্য্যেরই মতো নির্ভাবনায় গ্রহণ করা [illegible]

সাহিত্যরসের সার্থকতায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা [illegible]তিবড় [illegible] দোহাই দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে সমর্থন করেন না, তাঁরা বলেন [illegible] বস্তু সমাজবিবর্তনের সঙ্গে বিবর্তিত হ'তে বাধ্য। যুক্তি তাঁদের গ্রাহ্য হতো কাব্য ও শিল্পের একমাত্র অবলম্বন হতো যদি সমাজের পরিবর্তনশীল বহিরঙ্গ। বহিরঙ্গ সেখানে উপকরণ মাত্র, তাই এই উপকরণের [illegible] সর্বকালীন শিল্পের একটা প্রধান লক্ষণ। শিল্প উপকরণ সংগ্রহ ক[illegible] তহবিল থেকে, এক প্রকৃতির আর মানুষের। প্রকৃতির তহবিল থেকে উপকরণ সংগৃহীত হয় সে দেয় অমরত্ব, মানুষের তৈরি [illegible] যে [illegible] আসে সে ক'রে তোলে ততটা অনিত্যধর্মী। আদি যুগ [illegible] প্রকৃতির দেওয়া উপকরণকে অবলম্বন ক'রেই। সুর আ[illegible]

উপকরণ আশ্রয় পায় কিন্তু একমাত্র অবলম্বন হ'য়ে সম্পূর্ণরূপে তাকে দেশগত, জাতিগত বা কালগত ক'রে তোলার মতো প্রতিপত্তি ছড়াতে পারে না। যন্ত্রসঙ্গীত সঙ্গীতের সর্ব্বকালীনত্ব এবং সার্ব্বভৌমিত্বের অবিসংবাদী পরিচয়। এই সুরলোক বিভিন্ন স্থান-কালের বিভিন্ন ভাব-ভাষা-ঢং-চাল আশ্রয় নিয়ে আমাদের রুচিকে যতই বিভ্রান্ত করুক, আপাত বিচারে তাকে যতই দেশ বা কালগত ব'লে মনে হোক মৌল সত্তায় সর্ব্বকালীনত্ব তার অক্ষুণ্ণই থাকে। কেউ হয়তো বলতে পারেন সঙ্গীতে আবার সার্ব্বভৌমিকত্ব কোথায়, জাপানী গান বা বাজনায় তো তার হাসি বা বিরক্তির উদ্রেক হয় মাত্র। তা হবারই কথা। সঙ্গীতের রসটাই সার্ব্বজনীন ভাষাটা নয়। বিজাতীয় ভাষাও হাসির কারণ হয় কিন্তু সেই ভাষার দেয়াল ডিঙিয়ে অন্দরস্থ ভাবের মুখোমুখী দাঁড়ানো মাত্র তাকে অন্তরের আত্মীয় ব'লে চিনে নিতে মুহূর্ত্ত দেরি হয় না—শাব্দিক কৌতুকের সুড়সুড়িটুকুও হয় তখন অন্তর্হিত। ভাবই সার্ব্বভৌমিক কিন্তু ভাষাটা নয়। প্রত্যেক শিল্পেরও তেমনি একটা আনন্দ-বাহী ভাষা আছে যার সঙ্গে অপরিচয় আনন্দলোকের পথরোধ ক'রে থাকে। ও রকম আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেল স্বজাতীয় শিল্পকলায়ও সার্ব্বজনীনতার সাক্ষাৎ মিলবে না। প্রতি শিল্পের উন্নত স্তরের ভাষা বিশেষ একটা শিক্ষার দাবি করে—রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা যামিনী রায়ের ছবিও বহু লোকের কাছে অর্থহীন বা হাস্যকর। কিন্তু যখনই দেখা যায় কোনো শিল্পের ভাষার সঙ্গে একবার পরিচিত হ'লে তার বিশেষ পদ্ধতি বিশেষ এক জাতীয় আনন্দ যে-কোনো লোকের মনেই সঞ্চার করতে পারে তখন মানতেই হবে সব শিল্পের মৌল শিল্পত্বেই সার্ব্বভৌমিকত্ব বর্ত্তমান। ব্যাপ্তভাবে মানবচিত্তে [illegible]ই ঐক্য আছে ব'লেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীর মধ্যে একই জাতীয় শিল্পের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। অবশ্যি কোনো-কোনো শিল্পের কতকগুলো [illegible] ভাষায় স্বভাবতই একটা সার্ব্বজনীনতা বিদ্যমান—যেমন চিত্রকলায়। [illegible] আকৃতি, প্রকৃতির ভাণ্ডারের এই দুটি উপকরণই নিত্য বস্তু। কালোপযোগী অভিব্যক্তি এবং পরিবর্তনশীল সমাজোপকরণ যতই [illegible] আশ্রয় করুক তা গৌণই থেকে যায়—সেখানে আনন্দলোক সৃষ্টি করে রেখাবদ্ধ বা বর্ণবিন্যস্ত বস্তুসত্তা। বস্তুসত্তার রূপায়ন সার্থক হ'লে চিত্র-চিরন্তন হয়েই বেঁচে থাকে। গুহাবাসীর চিত্রও অতিআধুনিক চিত্র-সমালোচকের নয়নকে নন্দিত করার ক্ষমতা রাখে—গুহা থেকে [illegible] অভ্যর্থনা ক'রে তাকে এনে আসন দিতে হয় সভ্যজগতের সুউন্নত চারুভাণ্ডার [illegible]ভাণ্ডারে। মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্র বা অজন্তার গুহাচিত্র আধুনিক শ্রেষ্ঠ [illegible] পাশে অণুমাত্র ম্লান মনে হবে না। [illegible] আধুনিকতম বিষয়বস্তুর পাশে অণুমাত্র ম্লান মনে হবে না। [illegible] কিছুটা অংশের রস সময়ের সঙ্গে ফিকে হ'য়ে যায় কিন্তু মহাচিত্রের [illegible] যৌবনের মতোই কালস্পর্শহীন। এ দিক দিয়ে শিল্পের [illegible] চিত্রের সর্ব্বকালীনত্ব এবং সার্ব্বভৌমিকত্ব সর্ব্বাধিক।

সঙ্গীত এবং চিত্রকলার বিষয়বস্তু এবং রীতিপদ্ধতি সমাজজীবন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় বটে তবু সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের মূল্য পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায় না। কারণ এ ছুটি শিল্পের কোনোটিরই সমাজজীবনের উপকরণকে সবিস্তারে বা স্থূলভাবে অঙ্গীভূত করার ক্ষমতা নেই। পরিবর্ত্তনশীল উপকরণ সূক্ষ্ম হ'তে গিয়েই সময়ের উর্দ্ধে চলে যায়। কাব্যেও এ গুণ বর্ত্তমান, যদিও সঙ্গীত বা চিত্রের মতো অতখানি নয়। কাব্যে চিত্তবৃত্তি তার প্রকাশের অবলম্বন হিসেবে সমাজজীবন থেকে যদিও উপকরণ আহরণ করে তথাপি পুরোপুরি বস্তুনির্ভরশীল নয়—বিশেষ ক'রে লিরিক কবিতায়—পরিবর্ত্তনশীল উপকরণের নির্য্যাসকে শাব্দিক ব্যঞ্জনা এবং ইঙ্গিতময়তার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করাই তার ধর্ম্ম। উপাখ্যান-কাব্যের উপাখ্যানভাগকে ম্লানিমার হাত থেকে বাঁচায় তার ছন্দের ঝঙ্কার, শাব্দিক ব্যঞ্জনা এবং ইঙ্গিতময়তার আনন্দলোক। কিন্তু উপন্যাস বা গল্পসাহিত্যের বেলায় সমাজজীবনের পরিবর্ত্তনশীল উপকরণগুলোই সবিস্তারে মুখ্য অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় চিত্তবৃত্তিকে নাড়া দেবার। গদ্যের অবাধ আতিথেয়তায় তৎকালিক সমাজজীবনের রীতি-নীতি-সমস্যা সব এসে ভিড় জমিয়ে বসে কথাশিল্পের আসরে, তাতে ক'রে সমসাময়িকের অভ্যর্থনায় অতিশয়তাই দেখা দেয় কিন্তু পরবর্ত্তীকালের পাঠকের কাছে তার রূপ ও রস বহুলাংশেই ফিকে হ'য়ে যায়—কারণ তখনকার সমাজজীবনের রীতি-নীতিই হয়তো গেছে পাল্টে, সেদিন যা ছিল সমস্যা তা হ'য়ে এসেছে সহজ—তাই অত জাঁকিয়ে অত কথা বলার কোনো সার্থকতাই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু এই পরিবর্ত্তনশীল ঘটনার ভেতর দিয়েই মানুষের চিত্তবৃত্তির কতকগুলো অপরিবর্ত্তনীয় অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় এবং তারই জোরে গদ্যসাহিত্য সময়ের পিচ্ছিল পথে ঢ'লে পড়লেও একেবারে গড়িয়ে যায় না। পল্লীসমাজের সমস্যাগুলো এ কালের কিন্তু রমা-রমেশের সম্পর্কের মাধুর্য্যটুকু সর্ব্বকালের।

কবিতা এবং কথাশিল্পের তফাৎটা হোমিওপ্যাথিক আর অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের মতো। হোমিওপ্যাথিক ওষুধে বস্তু তার স্বাদ-গন্ধ-রূপ হারায় বটে কিন্তু বৈশিষ্ট্যটুকু তার পুরোমাত্রায়ই বজায় থাকে সূক্ষ্মতম সত্তায়, অ্যালোপ্যাথিক-এ বস্তুর স্থূল অস্তিত্বের অংশও অনেকটা পরিমাণেই থেকে যায় এবং গ্রহণকালে আপাতরুচিতে সেই স্থূল অস্তিত্বটাই স্বাদ-বিস্বাদের অবতারণা করে। কিন্তু একবার উদরস্থ হ'লে শরীর-ক্রিয়ায় দুটোরই সমান। জীবনপ্রবাহের উপকরণের নির্য্যাস নিয়ে গ'ড়ে ওঠে কবিতা আর কথাসাহিত্যের অবলম্বন তাদেরই স্থূল প্রকাশ—যার বহিরঙ্গের ওপর পড়ে কালের ছাপ। তবু বিগত যুগের কথাশিল্পেও মনটাকে একবার প্রবেশ করতে

দিলে রস আমরা সেখানেও পাই, তবে কিনা সেটা অবিচ্ছিন্ন এবং অনাবিল নয়, পরিবর্ত্তিত সমাজজীবনের উপকরণগুলো প্রতিপদে রসবোধকে ব্যাহত করতে চায়। কিন্তু শিল্পমাত্রেরই এমন একটা গুণ আছে যা আমাদের বস্তুসত্তাকে সাময়িকভাবে স্তম্ভিত ক'রে মনটাকে তুরীয় অবস্থায় উন্নীত করার ক্ষমতা রাখে—অলঙ্কারশাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে বিচ্ছিত্তিরস। মানুষের মৌল চিত্তবৃত্তির প্রবাহে আজও কোথাও ছেদ পড়েনি ব'লেই যে-কোনো কালের সুখ-দুঃখ হর্ষ-বিষাদ তার বাহু বিস্তার ক'রে এসে স্পর্শ করতে পারে যে-কোনো কালের মনকে—সমধর্ম্মের এ এক অপূর্ব্ব সম্প্রসারণক্ষমতা যা আপাতবৈষম্যের বাধাকে অতিক্রম ক'রেও আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করে। রূপকথার অলৌকিক নর-নারী বা জীব-জন্তুর মধ্যেও সমধর্ম্মী চিত্তবৃত্তির পরিচয় যেই মাত্র পাই অমনি আত্মমনের প্রক্ষেপণ দিয়েই সেই কল্পলোককে আমরা আপনার ক'রে তুলি এবং তা থেকে আনন্দও পাই প্রচুর। চিত্তবৃত্তিতে মিল পাওয়া মাত্র কল্পনাই সাহায্য করে মনকে অতিক্রান্ত বা অনাগত যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। 'প্রগতিশীল' সাহিত্যের অনাগত কালের কল্পনায় যদি আমরা আনন্দ পাই তো বিগতদিনের সত্যের সংস্পর্শই বা আমাদের আনন্দকে উদ্বুদ্ধ করবে না কেন—দুটোর কোনোটাই উপস্থিত জীবনে সত্য নয়। অনাগতের দিকে আছে যেমন কৌতূহল আর আগ্রহের আকর্ষণ তেমনি পুরাতনের ওপর থাকে প্রাণের এক অনির্ব্বচনীয় মোহ, তাই নতুনকে পেতে আমাদের যতখানি আগ্রহ পুরাতনকে ছাড়তেও পাই ততখানি বেদনা।

সাহিত্যে চিরন্তনতার সবচেয়ে বড় পরিচয় তার সার্ব্বজনীনতায়। ভাষার প্রাচীর ঘেরা জাতীয় আয়তনে আবদ্ধ থেকেও সুযোগ পাওয়া মাত্র অনুবাদের গবাক্ষপথ দিয়েও সে তার আত্মীয়তা ঘোষণা করে বিশ্বমানবের সঙ্গে। যা সার্ব্বজনীন তা-ই সর্ব্বকালীন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিচিত্র পরিবেশ যে ঐক্যে দাগ কাটতে পারে নি কালের বৈচিত্র্যও তাকে যুগবৈষম্যের রেখায় বাঁধতে পারবে না। তাই কথাশিল্পকেও স্বল্পায়ু আমি বলবো না, বলবো তার বহিরাঙ্গিক যৌবন দীর্ঘ নয়। মানুষ যতকাল মানুষ থাকবে ততদিন তার সৃজিত কোনো সার্থক শিল্পকর্ম্মেরই মৃত্যু নেই, যৌবনোচিত রূপ-রস কমবেশি ফিকে হ'য়ে যেতে পারে মাত্র।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

Us, A People's Symposium : Edited by Hiren Mukerjee. Rs. 2/-

হীরেন মুখার্জি রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। তাঁর সম্পাদিত এই প্রবন্ধ-গল্প-কবিতার সংগ্রহটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। প্রবন্ধগুলি চিন্তাকে উত্তেজিত করে, সর্বত্র মতে না-মিললেও লেখকদের তাই সাধুবাদ দিতে হয়। অশোক মিত্র কৃত সোমেন চন্দ-র 'ইঁদুর' গল্পের অনুবাদ ও সমর সেনের কবিতার স্বকৃত অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

একটা প্রশ্ন। বইটিকে 'People's Symposium' বলা হয়েছে। কোন অর্থে? লেখকদের মধ্যে কেউই জনগণশ্রেণীর নয়। বইটি ইংরেজি, সুতরাং ভারতীয় জনগণের জন্য উদ্দিষ্টও নয়। 'People' বিষয়ে কতগুলি লেখা আছে, কিংবা 'People'-এর সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনা করবার ইচ্ছা আছে, সেইজন্যেই এই নাম?

ভ্রম সংশোধন

গত আশ্বিন সংখ্যা 'কবিতা'য় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাটির নাম 'চন্দ্রকরোটী' ভ্রমক্রমে 'চক্রকরোটী' ছাপা হয়েছে। কবিতাটির ভিতরে যেখানে 'চক্রকরোটী' আছে সেখানেও 'চন্দ্রকরোটী' পড়তে হবে।

কবিতা

নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা পৌষ ১৩৫০ ক্রমিক সংখ্যা ৪০

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ও বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত]

Villeneuve

ওঁ

২৬

কল্যাণীয়েষু,

. . . ইটালীতে খুব হট্টগোলের মধ্যে কেটেচে। এখন এতটা আমার সহ্য হয় না। তাই ট্যুরিনে আবার আমার বুকের অসুখটা বেড়ে উঠেছিল। এখানে এসে ভাল আছি।

ভারি সুন্দর জায়গা। লোকের ভিড়ও নেই। রোমাঁ রলাঁ আমাদের প্রতিবেশী। রোজই তাঁর সঙ্গে দেখা ও আলাপ আলোচনা চলচে।

চিঠি লিখতে ভারি একটা বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। সব সুদ্ধ ভয়ঙ্কর একটা কুঁড়েমিতে পেয়ে বসেছে। অথচ কাজ যথেষ্ট করতে হচ্ছে। যারা স্বভাবতই কুঁড়ে তাদেরই অস্বাভাবিক রকম খাটতে হয়, পৃথিবীর এই নিয়ম। যারা কাজের লোক তাদের জন্যে দশটা চারটে, আর যারা অকাজের তাদের জন্যে ঘণ্টা গণনা আর চলে না। . . .

আজ রাত হল অনেক, শরীর ক্লান্ত, ঘুম পাচ্ছে। ইতি ৩০ জুন ১৯২৬

স্নেহানুরক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

দক্ষিণ ফ্রান্স

Cap Martin
Alpes Maritimes

(এই চিঠির প্রথম অংশ 'কবিতা'র গত কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো। অবশিষ্ট অংশ পুরোনো 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় প্রকাশিত হ'য়ে গেছে, তবু এ-সময়ে আবার প্রকাশিত হওয়ার নানা দিক থেকেই সার্থকতা আছে ব'লে মনে করি।—সম্পাদক)

...এখানকার যে সব মনীষী বিশ্বমানবের সমস্যা বড় রকম করে চিন্তা করচেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েচে। এঁদের সঙ্গে আলাপ হলে মন মুক্তি লাভ করে। কেননা, মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্চে ভাবের ক্ষেত্র—সেইখানে স্বার্থলোকের সমস্ত নিয়ম উল্টে যায়—সেইখানে মানুষ নিজের সুখ দুঃখের, নিজের ভোগ সম্ভোগের অতীত হ'য়ে বিচরণ করে—সেখানে বর্ত্তমানের বন্ধন তাকে ধরে রাখতে পারে না, সেখানে আশার আলোকে সমুজ্জ্বল সীমাহীন ভবিষ্যতের মধ্যে আত্মার বিহার। মানুষের মধ্যে যারা সেই ভাবীকালবিহারী তারাই অমৃতলোকের অধিবাসী, কেননা মৃত্যুর ক্ষেত্র হচ্ছে বর্ত্তমান, এইখানেই পদে পদে ক্ষয়, এইখানেই যত আঘাত, যত নৈরাশ্য—এই সঙ্কীর্ণ বর্ত্তমানের মধ্যেই সমস্ত চেষ্টাকে আবদ্ধ করে মানুষ পীড়িত হয়—কেননা মানুষ হচ্চে "অমৃতস্য পুত্রঃ," মানুষ হচ্চে দিব্যধামবাসী। সেই দিব্যধাম হচ্চে অসীমকালে, খণ্ডকালে নয়। আমাদের যথার্থ বন্ধন কালের বন্ধন। যখন আমরা কোনো ব্যথা বোধ করি তখন সেই ব্যথা আমাদের মনকে সেই ব্যথার কালের বাইরে যেতে বাধা দেয়—সেই ব্যথা বর্ত্তমানের খুঁটির সঙ্গে আমাদের জোর করে বেঁধে রাখে। সেই হচ্চে দারিদ্র্য যা উপস্থিতের ভাবনা দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখে, ভবিষ্যতের দিকে যার আশার জানলা খোলা নেই। সেই হচ্চে অকিঞ্চন, কালের ক্ষেত্রে যার ঘর মাত্র আছে কিন্তু আঙিনা নেই। আধুনিক ভারতবর্ষের লোক অতি ক্ষুদ্র বর্ত্তমানের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ। তার দীনতা এত বেশি যে বর্ত্তমানের সব দাবীও সে পুরাপুরি মেটাতে পারচে না। সম্পূর্ণ নিজের সামর্থ্যে তার দিন চলচে না, ঋণের প্রত্যাশায় সে ধনীর দ্বারে ধন্না দিয়ে বসে আছে। কিন্তু যার বর্ত্তমানের সম্বল স্বল্প সে

আপনার ভবিষ্যৎকে বাঁধা দিয়ে তবে ঋণ পায়—আমরা যতই পরের কাছে হাত পাতচি ততই নিজের ভবিষ্যৎকেই বিকিয়ে দিচ্চি। আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ, আমাদের সম্মুখে ভাবীকাল বাধাগ্রস্ত, এইজন্যেই আমাদের মন বড় করে ভাবতে পারচে না, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করচে। তুমি তোমার কলেজের ছাত্রদের কলুষ সম্বন্ধে যা লিখেচ তার কারণ হচ্চে মন যখন মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে পাপের উত্তেজনা থেকে তৃপ্তিলাভ করতে চেষ্টা করে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শুনেচি যে আমাদের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা তাদের সতীর্থ ছাত্রীদের অপমানিত করবার জন্যে ক্লাসের বোর্ডে অতি কুৎসিত কথা লিখে রাখে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সকল পরিবার থেকে এই সব ছাত্র আসে তারা আত্মার দীনতার দ্বারা পীড়িত। মন যেখানে কেবলি ছোট ভাবনা ভাবতে বাধ্য, ছোট কর্ম্ম করতে নিযুক্ত, সেইখানে এই আত্মার দীনতা ঘটে। সঙ্কীর্ণ ঘর যদি বদ্ধ হয় তাহ'লে বাতাস দূষিত হয়ে ওঠে। "কালোহ্যয়ং নিরবধি" আমাদের পক্ষে সত্য নয়, "বিপুলা চ পৃথ্বীঃ" সেও আমাদের পক্ষে মিথ্যা। মানুষ যখন তার কীর্ত্তির জন্যে বৃহৎকালের ক্ষেত্র না পায় তখন সে নিজের মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করতেই পারে না, সে আপন অভাবকে হীনতাকেই ব্যক্ত করে। নিরন্তর যে দেশে কেবল এই অভাব এবং দুঃখ দুর্গতিই প্রকাশ পাচ্চে সেখানে আত্মার উপরে মানুষের শ্রদ্ধা চলে যায়—পরস্পরের কুৎসাবাদে ঈর্ষ্যাপরতায় সেই শ্রদ্ধাহীনতা মানুষের আত্মাবমাননাকে উদ্ঘাটিত করতে থাকে। আমাদের দেশের লোককে বারবার জানাতে হবে যে আমরা "অমৃতস্য পুত্রা", আমরা দিব্যধামবাসী। কি করে জানাতে হবে? ত্যাগের দ্বারা। চিরন্তনকালের প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে সেই ত আনন্দের সঙ্গে বর্ত্তমানকালকে ত্যাগ করতে পারে—এবং সেই চিরন্তনকালই আত্মার অমৃতধাম। পশ্চিম দেশ বড় হয়ে উঠেচে, অর্থ সংগ্রহের দ্বারা নয়, আত্ম-বিসর্জ্জনের দ্বারা। এত বহুলোক এখানে ভাবের জন্যে বস্তুকে ভাবীর জন্যে উপস্থিতকে ত্যাগ করচে যে তার সংখ্যা নেই। সেই রকম অনেক লোককে দেখেচি। যতই দেখচি ততই মানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাচ্চে। জগতে যত কিছু উন্নতি ঘটেচে, মানুষের সেই আত্মদানের দ্বারা— ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা নৈব নৈব চ। কোনো রিফর্ম বিল্ আমাদের দুঃখসমুদ্র পার করাতে পারবে

না। আত্মার বন্ধন কখনই বাইরে থেকে ঘুচবে না—ভারতবর্ষ এই আত্মার বন্ধনের দ্বারাই জর্জ্জর—মণ্টেগ্যু সাহেব তাকে বাঁচাবে কি করে? উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। ইতি ২৮ অগষ্ট ১৯২০

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তুমি জান চারিদিকের সঙ্গে আমার মনের স্পর্শের যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। যাই বলি না কেন বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রেরণাকে অতিক্রম করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার পথের বাঁকচুর সে ঘটিয়েছেই সব সময়ে জানতে পারি বা না পারি। আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে আধুনিক দেখা দিয়েছে পুরাতন বাসাতেই, আমি বাসা বদল করি নি—বোধ হচ্চে না করবার কারণ এই যে আমার বাসায় জায়গা ছিল যথেষ্ট। জগদীশ বলতেন সাহিত্যের জলচর আমি যদি না হতুম তাহলে বিজ্ঞানের ডাঙায় আমি মাথা তুলে বেড়াতুম। আমার মানসিক চালচলনে বিজ্ঞানের ঝোঁক ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠচে। আমার হালের লেখার মধ্যে তার প্রভাব প্রবেশ করেছে বলে সন্দেহ হয়, সেই প্রভাবটা যদি ভিতরকার জিনিষ হয় তাহলেই সেটা অকৃত্রিম হতে পারে। তুমি জানো আমি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলুম তখন আমাদের পরিবার ছিল এদেশের সমাজ থেকে নির্বাসিত—আমরা ছিলুম দ্বীপে রবিনসন ক্রুসোর মতো, হাতের কাছে তৈরি জিনিষ কিছুই পাইনি, সব আপনারা তৈরি করে নিয়েছি—সেই নিজের তৈরি আত্মরচনার মধ্যে বেড়ে উঠেছি সুদীর্ঘকাল ধরে। মনে আছে ছেলেবেলা প্রায় শুনতুম পিরিলি বাড়ির ভাবভঙ্গী ভাষা বেশভূষা আচার ব্যবহার নিয়ে পরিহাস, তারা ভাবতে পারত

না এই জিনিষটাই অকৃত্রিম, আমাদের স্বভাবের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে, বাইরে থেকে সাজানো নয়। আমাদের মধ্যে এই যে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা ঘটেছে এটা কাজ করেছে আমার জীবনের সকল বিভাগেই। এমন কি যে ধর্মশিক্ষার মধ্যে জীবন আরম্ভ করেছি সেই ধর্মকেও যতক্ষণ না আপন স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতি দিয়ে রূপান্তরিত করতে পারলুম ততক্ষণ তাকে গ্রহণ করতে পারিনি। প্রথম বয়সে কাব্য আরম্ভ করেছিলুম অনুকরণে, বিহারীলালকে অক্ষয় চৌধুরীকে রেখেছিলুম সামনে, কিন্তু অল্প বয়সেই একদিন কখন বেড়া ভেঙে বেরিয়ে পড়লুম; তেতলার ঘরে দুপুরবেলার সেই হঠাৎ মুক্তির প্রবল আনন্দের কথা আজও মনে পড়ে—অথচ যে কবিতাটা সেদিন আমার নবীন লেখনীকে কুলত্যাগিনী করেছিল তার কাঁচা ছেলেমানুষি আজকের দিনে কোনো শ্রেণীর কবির পক্ষেই গৌরবের বিষয় হতো না। আমাকে আমার স্বভাবের পথ ধরিয়ে দিয়ে নিজে সে কোথায় করেছে অন্তর্ধান। মনে আছে যে প্রবল বেদনায় সেই লেখাটা হঠাৎ উৎসারিত হয়েছিল সেটা অত্যন্ত আমার অন্তম, ভিড়ের লোকের হাতে দিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল—একলা ঘরে বসে সেটা লিখেছিলুম স্লেটে, এবং মুছে ফেলেছিলুম। তার পর থেকে আমার কাব্যস্বরূপ আপন দেহকে প্রকাশ করেছে আপন প্রাণশক্তির প্রবর্তনায়। এর মধ্যে স্বাভাবিক পরিবর্তন চলে কিন্তু অনুকরণ চলে না। এই ডাঙার শরীর যদি কোনো খেয়ালে জলে সাঁতার দিতে চায় তবে মানুষরূপেই দেয়, রুই মাছ সেজে দেয় না। দেশ বিদেশ থেকে নানারকম ভাবের প্রেরণা এসে পৌঁছেচে আমার মনে এবং রচনায়, তাকে স্বীকার করে নিয়েছি, তা আমার কাব্যদেহকে হয়তো বল দিয়েছে পুষ্টি দিয়েছে কিন্তু কোনো বাইরের আদর্শ তার স্বাভাবিক রূপকে বদল করে দেয় নি। ভিতরের দিক থেকে ভাবগ্রহণ করবার মানসিক আধার প্রশস্ত, কিন্তু বাইরের দিকে যে দেহরূপ আছে তার স্বাভাবিক গঠন একটা চেহারার সীমায় বাঁধা, সেই সীমার মধ্যেই কিছু কিছু তার বাড়া কমা, কিছু কিছু তার অদল বদল চলতে পারে—কিন্তু আগাগোড়া রূপ বদল দেখলেই বুঝি সেটা আদর্শকে গ্রহণ করা নয় সেটা আদর্শকে নকল করা। এই জিনিষটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারিনে। এই দেখ না কেন, যাচনদার এখনকার কোনো ছবিকে ওরিয়েন্টাল মার্কা দিয়ে যদি হাটে চালান দেয় তাহলে

বুঝব সেটা ম্যুজিয়মের জিনিষ ; কোনো এক সময়কার যে প্রাচ্য আর্ট সত্য ছিল সজীব ছিল তারি ছাঁচে ঢালা নকল পদার্থকেই আজ ওরিয়েন্টাল বলে। অবনের মধ্যে যদি প্রাচ্য শিল্পের প্রেরণা থাকে সেটা ভিতর থেকেই কাজ করবে, তাঁর চিত্রদেহের বাইরের রূপ যদি কেবলি অজন্তা কাংড়া ভ্যালি আর মোগল আর্টেরই দাগা বুলোনো হতে থাকে তাহলে ব্যবসায়ী যাচনদারেরা তাকেই ওরিএন্টাল আর্ট বলে খাতির করবে বটে কিন্তু তাকে স্বভাবসিদ্ধ আর্ট বলা চলবে না। অবনের আর্টের যদি স্বাভাবিক প্রাণগত অভিব্যক্তি থাকে তবে তাকে একান্ত বিশেষ শ্রেণীগত মার্কার বেষ্টনীভুক্ত করা চলবেই না। তেমনি আমাদের দেশে হাল আমলের কাব্য, যাকে আমরা আধুনিক বলচি যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি তাহলে তাকে সাহিত্যিক জীবসমাজে নেব কী করে? যে কবিদের কাব্যরূপ অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়মপথে চলেছে তাঁদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হতে পারে সনাতনীও হতে পারে অথবা উভয়ই হতে পারে, কিন্তু তার চেহারাটা হবে তাঁদেরই, সে কখনোই এলিয়টের বা অডেনের বা এজরা পাউণ্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হতেই পারে না। সজীব দেহের আপন চেহারার পরিচয়েই মানুষকে সনাক্ত করা চলে, তার পর চালচলনে তার ভাবের পরিচয় নেওয়া সম্ভব হয়। যে কবির কবিত্ব পরের চেহারা ধার করে বেড়ায় সত্যকার আধুনিক হওয়া কি তার কর্ম?

তোমাকে আমি এত কথা বললুম তার মূলে আছে আমার নিজের কাব্যরূপের অভিব্যক্তির অভিজ্ঞতা। সেই অভিব্যক্তি নানা পর্বে নানা পথে গেছে কিন্তু সব নিয়ে স্বতই তার একটা চেহারার ঐক্য রয়ে গেল। যুগধর্মের তিলক-লাঞ্ছিত হবার লোভে সেটাকে বদল করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

তুমি এখনকার ইংরেজ কবিদের যে সব নমুনা কপি করে পাঠাচ্চ পড়ে আমার খুব ভালো লাগচে,—সংশয় ছিল আমি বুঝি দূরে পড়ে গেছি, আধুনিকদের নাগাল পাব না—এই কবিতাগুলি পড়ে বুঝতে পারলুম আমার অবস্থা অত্যন্ত বেশি শোচনীয় হয়নি। তুমি যদি এই সময়ে কাছে থাকতে তোমার সাহায্যে বর্তমান সাহিত্যের তীর্থ-পরিক্রমা সারতে পারতুম।

আমার পূর্ব চিঠির উত্তরে তুমি যে চিঠি লিখেছিলে সেটা পড়ে খুব খুসি হয়েছি।

আমার বড়ো বড়ো বহরের চিঠি দেখে মনে কোরো না আমার অবকাশের Waste land বুঝি বহুবিস্তৃত। একেবারেই তার উল্টো। আমার জীবনের এই একটা প্যারাডক্স, যখন টানাটানি হয় বেশি তখনি ছড়াছড়ি হয় বিস্তর।

২৩।২।৩৯ তোমাদের **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়,···আমার এখানকার পালা সাঙ্গ হল। পুরানো শিলাইদহে সবই তেমনি আছে—বাড়ির দক্ষিণ দিকে সিসুবীথিকায় অবিশ্রাম মর্মরধ্বনি চল্‌চে, পূব দিকের আম বাগানে দুই কোকিলে সমস্ত দিন কুহুধ্বনির কবির লড়াই চলেইচে, চষা মাঠের মাঝে মাঝে গ্রামগুলি অবগুণ্ঠিতা গ্রামবধূর মত বেণুবনের ছায়ায় ঢাকা দাঁড়িয়ে আছে, পুকুর পাড়ে দুটো একটা গোরু আলস্য-মন্থর ভাবে চরে বেড়াচ্চে, বাগানের পাঁচিলের ধারে নারকেল আর সুপুরি গাছ ঠিক যেন শিশুর মত আকাশের দিকে কেবলি হাত নাড়চে,—আকাশের নীল স্তব্ধ, আর পৃথিবীর সবুজ চঞ্চল, এই উভয়ের মধ্যে দিন রাত কেবলি রঙের ইসারা চল্‌চে, দিনগুলো খেলার নৌকোর মত কেবলমাত্র পাখীর গান, কনকচাঁপার গন্ধ, বেণুবনের মর্মর আর আলোছায়ার ঝিকিমিকি বোঝাই হয়ে আকাশের পূব ঘাট থেকে পশ্চিম ঘাটে পারাপার করচে—সবই তেমনি আছে কেবল আমার চিরপরিচিত পদ্মা শিলাইদা ছেড়ে দূরে কোথায় চলে গেছে তার আর নাগাল পাবার জো নেই। আমার পক্ষে এই বিচ্ছেদটি সামান্য নয়—যেন অলকাপুরীতে ঐশ্বর্য সবই আছে কেবল স্বয়ং লক্ষ্মীই নেই—সোনার নূপুরগুলি রয়েচে পড়ে, মুরজ মুরলী মৃদঙ্গ কিছুরই অভাব নেই, কেবল যে পা দুখানি নিরন্তর নৃত্য করে বেড়াত তারাই গেছে কোথায় চলে। যেখান থেকে কিছুদিনের জন্যেও চলে যাই ঠিক সেখানটিকে কিছুতেই আর পৌঁছতে পারিনে—রেলের ষ্টেশন ঠিক আছে, রেলগাড়িও চল্‌চে কিন্তু আসল জায়গাটি লুকিয়ে লুকিয়ে কোথায় যে সরে যায় তার ঠিকানা পাবার জো থাকে না।

আজ সন্ধ্যের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চি। তার পরে দুচারদিন বাদেই তোমাদের ওখানে উপস্থিত হব। ইতি ২৩ চৈত্র ১৩২৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৃহস্থ বিলাপ

সমর সেন

যদিবা পাঠালে পৃথিবীতে
তবে কেন দিলে এত ব্যর্থতা ঠাকুর !
শুনেছি পঞ্জিকা মতে
শুভক্ষণে জন্ম অভাগার,
সে লগ্নে গৃধিনীমুখে বাজেনি অশুভ চিৎকার,
কিম্বা অদৃষ্টের ব্যঙ্গে
অতি ধূর্ত কাক সহসা কর্কশ ডাকে
ভাঙেনিক জননীর প্রসব আবেশ।
সপ্তম সন্তান আমি ;
কিন্তু সন্তানের জন্ম আর সর্বনাশ
সমার্থক তখনো হয়নি।

আমাদের বংশে
গ্রাম ছেড়ে পিতামহ প্রথম সহরে আসেন।
রক্তে তার কিছু ছিল নদীর উদ্দাম বেগ,
সাক্ষী তার ষোড়শ সন্তান !
গুজব আছে যে গৃহত্যাগকালে
দেবী তাঁকে স্বপ্নে করেছেন বরদান :
দুধে ভাতে বাঁচিবেক তোমার সন্তান।
সুতরাং
সবুজ চশমা চোখে আমরণ ছিল,
সে সবুজ আদি ভিটের জমিজমার,
কিছু বা আপন পৌরুষের।

২

এ কী ভিক্ষামূর্তি প্রভু !
ভদ্রভাবে দিনগুজরান অসম্ভব আজ।

কোঁচার পাটে ময়লা জমে,
টেরীও থাকে না ঠিক,
ষোড়শোপচার ব্যঞ্জন কমে।
রাত্রে স্বপ্নহীন ঘুমে
উদ্যত উৎকণ্ঠা জাগে মানস শিয়রে।
যে জাদুতে কাগজ-হকার
গিয়েছে একদা লাটের মন্ত্রণাগার,
সে যাদুতে আমরা বঞ্চিত।
ভেবে দেখো, কিছুদিন আগে
জ্বর থেকে উঠে অল্পক্লান্ত রুগী
পেয়েছে অন্তত পান্তা ভাত,
পাশে যার লাল্‌চে নুন,
মনোহর কাঁচালঙ্কা বঙ্কিম সবুজ।
আজ তাকে দেখি বেলা দ্বিপ্রহরে
ফ্যান্ খুঁজে ধোঁকে গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে
বিরাট নগরে।
একাগ্র ক্ষুধার জ্বালা
দেহ জীর্ণ ক'রে চোখের অঙ্গারে জমে ;
নীড় নেই, মারী দিগ্বিজয়ী,
স্ত্রী কন্যা গিয়েছে অন্য পথে
নিরুদ্দেশ নরকে,
সবে ধন নীল মণি ! কঠিন শরীর
ভেসেছে নদীর জলে।

৩

কুকুর যখন নরভুক্,
হেমন্ত সন্ধ্যায় মাঠে বাটে শকুনের ধ্যান,
ন্যায়ধর্ম দেশান্তরী, শঠতার জয়,
পৃথিবীর এলোকেশী বেশ,

রক্তে কি তখনো বাজে পুরোনো নদীর গান ?
সুচন্দন বৃক্ষশোভা
বিষবৃক্ষ কখনো কি ধরে !
আমাদের শ্রেণী লবেজান,
শ্রোণীভারানত সুন্দরীর কালিদাসী সন্ধ্যা
আমাদের নয়,
নয় ওঠা নামা প্রেমের তুফানে ,
বদ্ধ কঙ্কণঝঙ্কার, চোখেতে কাজল।
রাত্তিরে গভীর ঘুমে
ক্ষীণ সুত্রে বাঁধা খড়্গের মত
সর্বনাশ সমুদ্যত মাথার শিয়রে।

৪

অনেক ফিরেছি ধনীর পিছনে,
দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে।
বড়লোকে আস্থা নেই আর,
দেখেছি দেশের দুর্যোগে
কী উপায়ে কাঁচা টাকা ভাঁড়ু দত্ত করে।
মাঠে মাঠে সোনার ধান,
কোথায় ধান !
সোনা জমে তাদের ভাণ্ডারে।
শবগর্ভ অন্ধকারে
রাস্তায় কঙ্কাল যদি জমে
তারা বলে : সবি মায়ার ছলনা,
কে বাঁচে কে মরে কেউ জানে না,
হরিই চরম সান্ত্বনা।
ভবের ব্যাপারে তিনি ব্যাপারী,
খরনদীতে তিনি কাণ্ডারী,

আমরা অধম চালের ব্যাপারী,
দিনে রাতে সই কত লাঞ্ছনা।
ধান যদি চেপে রাখি লোকের গঞ্জনা,
মাল ছেড়ে দিলে হয় ক্ষতির যন্ত্রণা,
যোগেতে লাঞ্ছনা, ভোগেতে লাঞ্ছনা,
হরির চরণ সান্ত্বনা।
চাল চেপে রেখে শত্রুনাশ
তাঁরি ত মন্ত্রণা।

অকাল মরণ শেষে এ কাল সমরে !

তোমাকে জানাই বন্ধু :
পথে বাধা পর্বত আকার,
ঘুনধরা আমাদের হাড়,
শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু
আশা আছে বাঁচবার।
যারা মাঠে খাটে,
উদ্দাম নদীতে জাল ফেলে
মাছ ধরে যারা আনে হাটে,
ধান জল বিদ্যুৎ কয়লা -
আনে যারা নগরিয়া ঘরে ঘরে,
সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা,
তাদের মিতালি খুঁজি।
তাদের জীবন কর্কশ কঠিন,
হয়ত মলিন
নিরক্ষর অতীতের জগদ্দল চাপে,
তবু তারা কালের সারথি,
তাদের দোস্তি, তাদের গতি
আমার পরমা মতি।

সোনার চাঁদ ছেলে সব

গোলাম কুদ্দুস

যাদের স্বার্থের স্বপ্নে চেতনা উদ্ধত একখানি
তারা সব জরাগ্রস্ত খণ্ডিত ভয়ার্ত স্তব্ধ প্রাণী,
ভগ্ন-অংশ মনুষ্যত্ব। বুকে হিংসা, বুকে নেই বুক;
চোখে ক্ষুধা, চোখে নেই চোখ; এ দুর্ভিক্ষে বায়ুভুক,
তবু তার ফণা কই? দংশনের বিষভরা দাঁত?
শীতের সাপেরা যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে দিনরাত
সরু গর্তে অন্ধকারে নিদ্রা যায় উত্তপ্ত বৈশাখে।
ভাঙাচোরা মানুষের দুর্বল প্রাণের পাকে-পাকে
প্রাপ্তি আর প্রতিশোধ স্পৃহা যত কিছুক্ষণ পরে
অর্দ্ধ বৎসরের মত প্রতি উত্তেজনা শেষে মরে।

এই দেশে, এই রুগ্ন নিরানন্দ দ্বন্দ্বভীরু দেশে
পচা ডোবা মাঝে মাঝে সমুদ্রের উজ্জ্বল আবেশে
কেঁপে ওঠে, নেচে ওঠে, আকাশে যখন ওঠে চাঁদ!
চাঁদ তারা, লক্ষ্মীছাড়া জীবনের বজ্রআশীর্বাদ
যাদের বর্দ্ধিত বুকে দিয়ে গেছে সূর্যের সংবাদ
ধূসর উষর পথে পথে, স্বাচ্ছন্দ্যের নির্বিবাদ
জীবনে যাদের এলো মৃত্যুপণ প্রতিজ্ঞার জ্বালা
এলো নিরাপদ অন্ধ বন্ধ নীড় ভাঙবার পালা।
এই দেশে, এই চির জাগ্রত রাত্রির মহাদেশে
অবিশ্রান্ত অন্ধকারে আসে তবু শূন্য হ'তে ভেসে
কয়েকটি চাঁদমুখ—দীপ্ত প্রাণসূর্যের আয়না!

রেখাহীন একাকার স্তব্ধ রাত্রি নাগাল পায় না
অকস্মাৎ জেগে ওঠা অস্তিত্বের, কত দিকে কত
অভাবিত দ্বীপপুঞ্জ, অসংখ্য সঙ্গত অসঙ্গত
প্রাণের চাঞ্চল্যচিহ্ন! তবে সে আলোয় জেগে ওঠে

ভীরু এক রুক্ষ হাসি পর্বতমালার কালো ঠোঁটে।
সহস্র জীবন হ'তে রস শুষে যারা নিষ্করুণ,
যারা উচ্চ গিরিশৃঙ্গ, চাঁদ নয় বজ্রের আগুন
জ্বলার অপেক্ষা রাখে তাদের নির্জন শৈলবাসে।

চাঁদ আসে চাঁদ হাসে সমুদ্রের অগাধ আকাশে।
সমুদ্রের স্তব্ধ বুকে জাগে তীব্র বন্যার আস্বাদ!
জন-সমুদ্রের প্রাণ জোয়ারের জ্বালায় উন্মাদ!

সুবিন্যস্ত সমাজের স্বপ্ন নিয়ে সুস্নিগ্ধ জীবন
হেলায় পিছনে ফেলা প্রলয়ের বীজাণু-বপন,
পরশ পাথর সৃষ্টি। ওঠে ঝড়, স্পর্শমাত্র সোনা
কুৎসিত লোহার দল! একটি চাঁদের প্রবর্তনা
ধূলায় হাজার চন্দ্রে হাসে। চাঁদ হওয়া ছিল আগে
আকাশে ওঠার নাম, এখন সবার পুরোভাগে
জর্জরিত ধূলিতলে নেমে আসা চাঁদের প্রমাণ।

পাতালে নামার পথে গড়ে যারা প্রথম সোপান
আকাশে ওঠার ভিত্তিভাবে, তারা জানে কোন্ দিন
পূর্ণিমার কোন্ রাত্রে জনতার সমুদ্রে সঙ্গীন
বিপ্লবের সম্ভাবনা যদি চন্দ্রে লাগায় গ্রহণ।
সে-স্বপ্নসম্বলমাত্র বর্তমানে যারা সারাক্ষণ
জীবন বন্ধক রেখে এক মনে কাজ করে যায়
তারা যদি-মণি হয়ে জ্বলে দেশদশের মাথায়!

ট্রেনে

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

নানা দেশের শ্মশানসীমা ছাড়িয়ে এলাম
কী বা পেলাম, কী-ই বা পেলাম।

একদা কোন্ চাষীর ঘরে জন্মেছিলাম,
সবুজ-সোনা ধানের শীষে রক্ত দিলাম,
খামারভরা জীবন পরিবর্তে নিলাম,
সঙ্গে তবু আকাল এলো—এলো তুফান,
দেখে এলাম, জীবন শেষে হারিয়ে গান
হ'ল শ্মশান!

অনেক পায়ে-চলা-পথের প্রান্তে এসে
পৌছে গেলাম—মাঠের শেষে—সহর দেশে,
যেখানে কারখানায় ধোঁয়া রক্তে মেশে;
সেখানে হায় ব্যর্থ-শ্রমে সুখী হওয়ায়
হঠাৎ যুগসন্ধ্যা দেখি আকাশে চায়
ঝোড়ো হাওয়ায়!

তুমি ছিলে যখন আমার পূর্ণ মরাই
দু'হাত দিয়ে পূর্ণ-প্রাণের আশা ছড়াই;
তুমিই আমার সঙ্গে ছিলে যখন লড়াই
বেধে গেছে সহরে রাজপথের বুকে:
বেঁচেছিলাম তখন বাঁচার প্রবল সুখে
হৃদয় ঠুকে।

জীবন দোলায় দুলে দুলে আপন-ভোলা—
আজও দোলা, ডাইনে-বাঁয়ে শুধুই দোলা;
তবু কখন্ হৃদয়ে নীল ফেনিয়ে তোলা,
স্মৃতির নীলে আলো ফেনায় ধূসর ইথার

কালের টেলিগ্রাফের তারে সেতু বাঁধার
আশাটি যার!

আজকে এ-প্রান্তরে তোমার ছায়া পড়ে:
তোমার দেহ—অন্ধকারে—মনের ঘরে
আঁকে নিটোল ঠোঁটের রেখা হাসির পরে;
জীবন চলে ধূ ধূ ধূসর, কেবলি ক্ষয়;
তবু তোমার চোখের চাওয়া—আশা তো নয়?
কেবলি ভয়!

কালের টেলিগ্রাফের তারে তোমার হৃদয়
খবর পাঠায়—এলো পথের প্রান্ত-সময়!
আমার সারা রক্তে কাঁপে আশা, না ভয়?
টানো আমায় রক্তে আবার জোয়ার হেনে
আজকে যখন শ্রান্ত এ-মন চলছি টেনে—
চলতি ট্রেনে!

ধমনীর সংকেত

জগন্নাথ বিশ্বাস

এখনো অপেক্ষা করো শীর্ণ দেহে শান দিয়ে, আসে শেষ ডাক,
লাঞ্ছিত সৈনিক সব লাঙলে-কঠিন হাতে ধরো হাতিয়ার,
সীমান্তে ঘনায় আঁধি, প্রাসাদের অন্ধকার হতাশে নির্বাক,
অপ্রত্যাশা ভেঙে সব সৈন্য আসে, প্লাবিত কান্তার।

সব দুঃখ সেঁচে-সেঁচে বাঁচে প্রাণ। প্রস্তুতেরা হয়েছে অস্থির,
সময় হয়নি জানি; হ'লে নিজেদের শীর্ণ পঞ্জরের তলে
পাবে শব্দ সংকেতের, হে দেশনায়কদল, আত্মধমনীর;
এখন অপেক্ষা করো, আসুক না মৃত্যু-ঢেউ সাগরের জলে।

সংশয়ের বাধা ভাঙো, স্থির জেনো সর্বদেশে সর্বহারা সেনা,
অগ্রগতি রুদ্ধ আজ হবেনাক' পৃথিবীর শৃঙ্খলিত অমোঘ বিধানে,
উঁচুর পতন আজ সমাগত, শেষ ক'রে যাবে সব দেনা,
এদিকে ওদিকে তাই গুপ্তচরী নানা বাধা শেষ মৃত্যু হানে।

আজ তাই ক্ষণস্থায়ী অপেক্ষাকে উজ্জীবিত করো কালো রাতে,
দৈন্যাহত মেরুদণ্ড সোজা হবে আঁকাবাঁকা ইস্পাতের পাতে।

মোহানায়

মুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মদিরোচ্ছল জনসমুদ্র বারে বারে আজ ডাকে ;
মরীচিকা ঘেরা স্বপ্ননিবিড় আমার নীড়ের ফাঁকে
জলন্ত জল বারে বারে আজ ক্ষণদীপ্তিতে আঁকে
সোনার লিখন আমার আকাশময়।

সহসা এলো এ ভরা জোয়ারের ইশারা দুর্নিবার,
চকিতে আমার বিদ্যুতে বাঁধা তারে দিল ঝংকার—
হবে উত্তাল তরংগে আজ আমার এ অভিসার,
মাধবীকুঞ্জে বাসর রচনা নয়।

খেয়ালী খুশীতে চলেছিল একা আমার নির্ঝরিণী,
নিরালা পথের উপলে বেজেছে মৃদু তার কিঙ্কিণী ;
কঠিন বাসরে সিন্ধুর ডাকে তাই হ'ল শঙ্কিনী,
গোধূলি মায়ায় তাই জাগে মনে ভয় ;

তাই বুঝি আজ নিভৃত-চারণ জীবনের সন্ধ্যায়
তটিনী আমার ভীরু সংকোচে ক্ষণে ক্ষণে শিহরায় ;
দুরুদুরু বুক অভাবনীয়ের পুলকে আশংকায়—
প্রিয় মিলনেও তাই মনে দ্বিধা হয়।

তবু জানি আজ শেষ হ'ল মোর আত্মরতির দিন—
শেষ হ'ল মোর অমরাবতীতে স্বপ্ন প্রদক্ষিণ ;
গোপন কাননে অলিগুঞ্জন ওই হয়ে আসে ক্ষীণ,
শেষ হ'ল আজ বনে মধু সঞ্চয়।

কুঞ্জবিলাসী জীবন আমার পিছনে এসেছি ফেলে,
আত্মাহুতির মরণ বরণ করব যে অবহেলে—
সম্মুখে ওই জনসমুদ্র উদ্যত বাহু মেলে,
ঝাঁপ দিতে তবে কেন আর সংশয় ?

দেশান্তর

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

চলো এক নতুন জগতে—এসো মোরা দুজনেতে যাই—
হাতের নাগালে আছে, যাওয়া যায় এক পা বাড়ালে।
কবি আর ঋষি আর পথিকের কথায়-কথায়
জানা গেছে সে জগত এখানেই রয়েছে আড়ালে।
এই ধূলিপথ দিয়ে যেতে যেতে, থমকে দাঁড়ালে,
আকাশ কুসুম ধরে' যাওয়া যায় তারায়-তারায়।

যাওয়া যায় তারার আলোয় ! একটি পলকে ছায়াপথ !
এখানে যা মিনিটে মিনিটে কেটে চলে—এই যে সময়—
সেখানে তা মুহূর্তে উধাও ! সে-জগৎ শুধু আলো নয়,
নয় শুধু মৃত্তিকারো—সেই এক আশ্চর্য জগৎ !
অন্য লোকে মন্দ বলে—তবু মন্দ নয় ভালো নয় ;
স্বপ্ন নয়, তবু তারে জেগে দেখা যায় স্বপ্নবৎ।

স্বপ্নের মতন দেখা যাবে, জেগে জেগে, তোমাকে আমাকে।
মহাকাল পার হয়ে সেথা যেতে একটি নিমেষ !
একটি নিমেষ লাগে পার হয়ে যেতে এত দেশ—
এত স্মৃতি—এত কথা—এত বাধা—এই জনতাকে।

অপরূপ সে জগতে সকলই অপূর্ব আর বেশ—
যতোবার যাওয়া যায় নতুন নতুন লেগে থাকে।

সমস্ত নতুন লাগে যেন—সবই তার যদিও তো চিনি—
তোমাকেও চিনি নাকি? তথাপি আরেক পরিচয়
আছে যেন সে জগতে: যেন আগে তোমাকে দেখিনি।
হেথা যা আশ্চর্য লাগে সেখানে তা নহে বিস্ময়।
সেথা তারা বাধ্য হয়ে পড়ে, এখানে যা বাধা চিরদিনই—
সেখানে উত্তর হয়ে আসে এখানে যা প্রশ্ন মনে হয়।

কাছাকাছি আছে সে জগত—এ-পথেরই কোনো এক বাঁকে—
একটু উন্মন হলে আভাস আসে যে সৌরভের!
এই যেন ছোঁয়া যায়, এই যেন পাওয়া যায় টের,
চকমকি চোখে পড়ে, নক্ষত্রের ঘ্রাণ লাগে নাকে।
কোন্ তারকার আলো—কত লক্ষ আলোক বর্ষের
দ্যুতিপথ-পার-হ'য়ে আসা যেন দেখায় তোমাকে।

'নমস্কার! আছেন কেমন?' 'ভালো আছি, আছেন তো বেশ?'
ভদ্রতায় মাখামাখি অমায়িক মোদের জগত—
হেথা হতে—বাঁধা-ধরা—পদে-পদে বাধা—এই পথ—
হেথা হতে বহুদূরে—চ'লে যাই, এস না! বিশেষ
দূর নয়। এক পা বাড়ালে সেই ঠাঁই। আসে রথ
পুষ্পকের। নিয়ে যায় উড়িয়ে—নিমেষে নিরুদ্দেশ!

কাঁটা চামচের ঠুন্‌ঠুনি: তপ্ত কফি: 'বিল্ আনো, বোয়!'
এরই মাঝে সে জগত কোনোখানে রয়েছে লুকানো:
আকাশকুসুমে বাঁধা—হাতের নাগালে লট্‌কানো:
তোমার চোখের পাশে—এখানের বাতাসে ঘুমোয়,
সে জগত। এই দণ্ডে এখুনই জাগানো যায় জানো?
এখুনই নামানো যায় তাকে—এইখানে—একটি চুমোয়।

সামূহিক

সুরেশচন্দ্র সরকার

আচমকা বাদা থেকে উড়ু ফুলের বুনো গন্ধ আসে।
তুরপুনে পোকার শব্দ স্পষ্ট শুনি কখনো কাছে, কখনো দূরে।
শুদ্ধ পুকুরে
ধাতব, যেন কিম্ভূত কিঙ্কিণী-স্বরে,
নির্জন হাঁসের ক্বচিৎ ডাক প্রসারিত হাওয়ায় ভাসে।

ঘাটে রোগা মেয়ে অবাক্ চেয়ে
গা ডুবোয় ঘিন্‌ঘিনে সবুজ জলে।
ধূসর স্যাটে পুরোনো হাতব্যাগের বিলিতি মুটে
পথ চলে।
যদ্দুর যায়,
গিরগিটির প্রায়
ধুক্‌ধুকে মেয়েটি তার সরু গলাটি বাঁকায়;
নিষ্প্রাণ কৌতূহলে তাকায়।
কে জানে, যাবে কোন খানে;
নতুন হাকিম হবে, কি, জমিদারের সেজো জামাই।

ধান নেই। ধার নেই। শীর্ণ
গোলাঘর জীর্ণ;
সারাবার খড় নেই।
কেবল নতুন দরমা চড়েছে দাওয়ায়; কারণ
ক'দিন থেকেই দেখা যায়,
তালপাতার ভিন্‌দেশী সেপাই
লেপ্‌ রাই, লেপ্‌ রাই,
হেঁকে যায় সদর রাস্তায়।
বাইশ বিঘের ধানজমি জুড়ে
পেল্লায় ছাউনি পড়েছে, খুড়ো দেখে এসেছে,
শিবানীপুরে।

পথ চলি। পাড়াগাঁর বিষণ্ণ দুপুর
শ্বাসরোধী জীবন্মৃত্যুর বৈরাগ্য হানে।

আদায়পত্তর কিছু নেই ভাঁড়ে মা ভবানী'র অধিষ্ঠানে।
সম্মুখ সমরে সগৌরবে ধ্বসে গেল বিগত কয় সাল;
করাল বন্যার মুখে আগামী দুই সাল
এখনো উত্তুঙ্গ যদিচ অনিশ্চিত, জাঙাল।
ফুঁকোর ব্যবস্থাও অবস্থার বার।
কৃশকায় করুণ ঘটোঘ্নীর স্বল্প পীতাভ ক্ষীর
এখন রক্তেমেশা গাঢ় লাল।

তিমিরহননের গান

জীবনানন্দ দাশ

কোনো হ্রদে
কোথাও নদীর ঢেউয়ে
কোনো এক সমুদ্রের জলে
পরস্পরের সাথে দু দণ্ড জলের মত মিশে
সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে
আমাদের জীবনের আলোড়ন—
হয়তো বা জীবনকে শিখে নিতে চেয়েছিল।
অন্য এক আকাশের মত চোখ নিয়ে
আমরা হেসেছি,
আমরা খেলেছি;
স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
একদিন ভালোবেসে গেছি।
সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মত তবু—
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।

সেই জের টেনে আজো খেলি।
সূর্যালোক নেই—তবু—
সূর্যালোক মনোরম মনে হ'লে হাসি।
স্বতই বিমর্ষ হয়ে ভদ্র সাধারণ
চেয়ে দেখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশী কালো কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসাব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাথ থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাথে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে।
এরা সব এই পথে;
ওরা সব এই পথে,—তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন,—অন্তহীন বেদনার পথে।
কিছু নেই,—তবু এই জের টেনে খেলি;
সূর্যালোক প্রজ্ঞাময় মনে হ'লে হাসি;
জীবিত বা মৃত রমণীর মত ভেবে—অন্ধকারে—
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।
আমরা তো তিমির-বিনাশী

বৃদ্ধেরা

আবুল কালাম শামসুদ্দিন

স্বপ্ন তো ভেঙেছে বহুদিন
আজ দিন সম্ভাবনাহীন.........
তাই মাঝে-মাঝে তুচ্ছ অতীতেরে স্মরি'
ক্ষণমাত্র-সাফল্যের রোমন্থন করি ;
প্রাণের স্পন্দন ধীরে হয়ে আসে ক্ষীণ
তবু স্মৃতি ডেকে যায়—ছিল একদিন—
ছিলো আকাংক্ষা নবীন
ছিলো বসন্ত রঙীন।

পুরোহিত

আবুল কালাম শামসুদ্দিন

বিধাতা আমার, তবু কি আহুতি আরো, আরো দিতে হবে
পুরোহিত কোথা? যে সাজাবে ধরা কল্যাণ উৎসবে'?

অন্ধকার রাজপথে দুই পাশে কেঁপে গেল ভিত
মৃত্যুর ঘোষণা শুনিলাম—'আমি সেই পুরোহিত।'

হোসন্‌-বানুকে

আবুল কালাম শামসুদ্দিন

তুমি আমাকে পড়চো
পড়্‌তে পড়্‌তে হয়তো ঝিমিয়ে যাচ্ছো
অথবা হয়তো আমার কবিতা তোমার ভালো লাগচে না, কিন্তু
তোমার সামনের ঐ জানালার ফাঁক দিয়ে
নদীর চরের ঐ যে হোগলা আর শরবনটা দেখা যাচ্ছে
ওর দিকে তাকালে
কিংবা ঐ যে ঝিল্‌মিল্‌-করা-দিগন্তে, ওর দিকে তাকালেও
একটু বিষণ্ণতা-মাখা আনন্দ
তোমার মনে জাগে না?
সহস্র কাজের ফাঁকেও—পল্লীগ্রামের ভিটার গাছের ডালে
কোনো নিদাঘদুপুরে-ডাকা-ঘুঘু
হঠাৎ ডেকে ওঠে না?
তোমার সব আছে, সুখ আছে আনন্দ আছে
তবুও দূর নদীর বাঁকে
বড়ো বড়ো পালতোলা নৌকো আকাশ ছুঁয়ে
মিশিয়ে যাচ্ছে দেখে
তোমার দীর্ঘশ্বাস বেরোয় না, এ সব কিছুর দিকে
তাকিয়ে থাকতে গেলে তোমার চোখ বুক
একটা অব্যক্ত জ্বালায় ভ'রে ওঠে না?
মনে হয় না, কী যেন চাই—কী যেন চাই, কী যেন হারাচ্ছি,
কী যেন ফিরে পাবো না,
কিংবা কিছুই পাইনি! এমনি কিছু?

শ্রীমতী

প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ঝিকিমিকি নীল রাত আলুগোছে পড়ে আছে যেথা,
অনেক ছায়ায় মোড়া চেতনার সিঁড়িগুলি বাহি,
হে শ্রীলেখা দেবী, আমি তোমারে খুঁজেছি কতো সেথা,
তোমার রুক্ষ স্রোত, আবর্ত পিচ্ছিল তারা চাহি,
অনেক অনেক দিনে, অনেক অনেক রাত্রে হায়,
নিদ্রাহীন চলিয়াছি সময়ের সুঁড়িপথে একা,—
যেথায় সুরেলী রাত্রে ঝরা ফুল মাটিরে কাঁদায়,—
শীর্ণ-মায়ানদীতীরে—সেথা যদি পাই তব দেখা।
দু'একটি ফুল পড়ে খ'সে
শ্রীমতীর নৈশ আকাশের,
ঘ্রাণ লই আনমনে বসে—
ঈগল-শ্বসিত বাতাসের।

স্বপ্নেতে দেখেছি যার লাল কেশ, বিদ্যুৎ-লিখন,—
গ্র্যানাইট আত্মার গন্ধ কঠিন সুখের মতো হায়,—
পরিষ্কার দিবালোকে মেঘ হ'য়ে সে কেন কাঁদায়!
ঝিকিমিকি জীবনের রঙীন বালুর স্রোত দীপশালা কতো না সাজায়,
তারপর আরো আছে,—জীবন-তরঙ্গ বাজে, কতো লোক আসে আর যায়;

কতো তাপ-বিকীরণে ধরা হ'ল বিচিত্র মোহন,—
ধূলিতে সঙ্গীত বাজে,—আমি শুধু সব ভুলে গেছি,—
একটি নেশায় লুব্ধ চলি ঘুমে প্রেতের মতন।

প্রত্যাগমন

মণীন্দ্র রায়

বৈপ্লবিক চিন্তাজালে পিষ্ট আমি দিবস রজনী।
এ জীবনে শান্তি নেই, নানা ছাঁদে রুদ্ধ অবকাশ।
তবু কেন কেঁপে ওঠে নিপীড়িত আদিম ধমনী,
শীতার্ত বনানী ছেয়ে জ্বলে কেন অবাধ্য পলাশ?
আমি যে বিমুক্ত! নেই পলায়নে সে রম্য আশ্রয়
হৃদয়ের অলিগলি পরিচিত বস্তির মতন
নিরানন্দ ছকে ঘোরে; প্রতি পদে ব্যাহত বিস্ময়।
তবু এ রহস্য কেন স্বপ্নায়িত করে তনুমন?
কেন আনে আবিষ্ট উল্লাস? আমার রয়েছে কাজ,
আছে চিন্তা, বিরোধ অনেক—প্রশ্ন সর্বাধিক।

এ দুই জিজ্ঞাসু চোখে জীর্ণ লাগে স্থাবর সমাজ;
সংগ্রামসংকুল পথে চলি আমি উদ্বিগ্ন পথিক।
আমার বিশিষ্ট মন স্বতন্ত্র স্বপ্নের পরিসর
পায় নি' কখনো! তাই প্রেম ছিল বাহির দুয়ারে।
সার্বজন্য আবেগের মিছিলে ছেড়েছি নিজ ঘর;
জেনেছি সে স্বার্থপর যে-খোঁজে একান্ত আপনারে
যুগান্তিক এ দুর্যোগে। তবু আজ এ কি বিপর্যয়!
জাগে মনে বেদনার রোমাঞ্চিত নিবিড় সুবাস।
সীমান্তপ্রবাসী সৈন্য শিবিরে কেন যে জেগে রয়,
রক্তাক্ত প্রান্তরে সে কি স্বপ্নে দেখে আপন আবাস,
প্রিয় পরিজনে ঘেরা প্রত্যাগত শান্তির সুদিন?
আমার বেগান্ধ দৃষ্টি শুধু অগ্রস্থতির নেশায়
গতির সার্থক সীমা কোথা ভুলে ছোটে লক্ষ্যহীন।
জটিল পথের বিঘ্ন টানে যেন দুর্বোধ্য ভাষায়,
মুছে যায় যাত্রাবিন্দু, দূর হ'তে দূরে চলি ভেসে।

সহসা বুঝি বা তাই প্রস্তরিত হৃদয়ের ফাঁকে
আনন্দিত কিশলয় জেগে ওঠে অপূর্ব উন্মেষে ;
নিবিড় শ্যামল ছন্দে মৃত্তিকার স্নেহবন্ধে ডাকে
ভ্রষ্টনীড় বিহঙ্গকে। মিশে যায় পৃথিবী-আকাশ
সে নব আশ্রয় শাখে। সীমাশূন্য স্বাক্ষরের দাবী
শান্ত হয় সে জগতে। জাগে বুঝি তারই পূর্বাভাষ ?
জানায়, সকল ধ্বংসে থাকে এক সৃজনের চাবি,
সংগ্রাম নির্বোধ, যদি না থাকে জীবনে ফিরে আসা।
সর্বাঙ্গে শিহর তুলে এ দুরন্ত উল্লাসের সাড়া
জাগায় প্রেমের স্বপ্ন, বিপ্লবের পূর্ণতম আশা।
যেখানে বাহির মেশে , বাহিরে যে ঘর পায়-ছাড়া,
হে দৃঢ় গহন মুষ্টি! দিলে-কি সে মুক্তির ইসারা ?

দিনান্তে

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আয়ত চোখের দিন ফুরালো
এবার তবে চলো
বাকি জীবনের মোড় ঘোরালো,
আসল কথা বলো ।

ক্ষণায়ু গালের লোভনীয় ফাগ
শুভ্র হাসির মিষ্টত ।
আর, চোখের মণিতে পদ্মরাগ
লঘু মানসের ধৃষ্টতা।
নম্র চাহনি, কম্প্র ওষ্ঠ অর্থহীন
যদি মননের নিটোল গড়ন
না ধরে সত্য রূপের ফলন
উঁচু-নীচু শুধু জৈব সীমায় সত্তা অন্তরীণ।

হৃদয়ে সমান স্থির স্বচ্ছার গাহনে যদি
শান্তি না মেলে—তৃপ্তির জ্বালা নিরবধি,
সেথা অলগ্ন বিশ্বাস, প্রতিপদেই শোষণনীতি
শীতল আরাম, শিথিল জীবন, বুর্জোয়া প্রেমরীতি।

তরল চোখের জল আর মোরে পারবে না ভোলাতে
কাজের বুকেতে কতো বাজে দাগ কেটেছো, ভাবো !
অন্য পৃথিবী ডাকছে যে আজ। সাঁঝবেলাতে
ঝুটো গোধূলির ঝিকিমিকি খেলা কেন বা চা'বো ?

যে লাল মেঘের প্রখর চুমায় ফোটে ফাগুন
যেখানে নিত্য কর্ম্ম-দ্যুতি
ঘোরে চারধারে বিশাল গোলার শ্রম-আগুন
কে চায় সেখানে কৃপণ তারার সখের স্বর্গচ্যুতি !

বুড়ো মহাকাল হাসে আর বোঝে সব
স্বত্ব-বোধের চিতায় পোড়ে কিতব ।

দিনান্ত

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

যে-সব সায়াহ্ন ভরে হৃদয়ের অনেক ভাবনা
জানলায় কুমারীর চোখের মতন হয়ে কথা কয়ে যায়
সেই সব মুহূর্তের সাদা পথে আকাশের তলে
প্রথম প্রেমের কথা মুঠো-মুঠো তুলে নিয়ে আকাশ উড়ায়
তারপর চেখে দেখে মনের মতন হোলো কিনা
অঘ্রাণ-পোষের দিনে, হৃদয়ের কুয়াশার জলে।

আরো এক কথা ছিলো। সব কথা হয়নি তো বলা
সে-কথা তোমার নয়, কার কথা তাই বসে ভাবি।
কী-যে কথা! আজ তার খোসা পড়ে আছে
ধানের রঙের মতো দিগন্তের হলুদ কিনারে—
ভেসে-ওঠা বারবার কারুর চোখের মতো বোবা।

রাত্রিগুলি একবার জলে উঠে উঠে
পউষ শীতের দিনে শিশিরের সাদা এক ঘ্রাণে
নিভে যায়।
কতবার প্রেম আসে, ভুলে যায় মন
মুছে যায় কত মুখ সুদূরের তারার মতন।
হৃদয়ের কুয়াশার জলে সূর্য জলে ওঠে
নরম মোমের মতো বিকেলের আলো কলকাতায়
আপেলের মতো লাল দিগন্তকে সূর্য ঠোকরায়
তারপর রাত নামে। কেরাণীরা ফেরে। প্লেনের গুঞ্জন ক্ষণে-ক্ষণে:
পেয়ালায় তামাটে চা, তামাকের গন্ধ আর
আড্ডা জমে কবিতা-ভবনে।

প্রাসাদ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

শীতল শিশির রাতি: হিজল বনের পিছে আঁকা নীল চাঁদ—
হীরা ঝরে মাঠে, বনে—মাঠে, বনে, বাগানের পুকুরের জলে;
বাঁকা বাঁকা শিঙ তুলে হরিণেরা খেলা করে ফিকে ছায়াতলে
আর দেহে মেখে চাঁদ নিথরে ঘুমায়, হায়, আমার প্রাসাদ।
ডা না মেলে অবিকল পাষাণ-পরীটি থির, খাঁ খাঁ করে ছাদ:
তারো দূর ওপরেতে বেগুনী তারকা এক মূক কুতুহলে
চেয়ে আছে মুখে মোর; মুখে মোর পুরাতন আলো নাকি ঝলে?
আলো কিছু চেনা চেনা: স্মরণের ওপারের ধূসরিত স্বাদ!

ছাড়িয়া নগরী দূর তাই ত' তোমাকে ফের দেখিতে এলাম।
হে প্রাসাদ! মনে পড়ে: দিনে দিনে অবলীন আরেক বছর—
রঙীল বাসক-রাতি কোনো কেউ যেপেছিলো প্রকোষ্ঠে তোমার?
এই সে বিজন তিথি: যখন বনের পিছে নিমীল, সুঠাম
এসেছে আবির চাঁদ; আর তারা, হরিণেরা, হীরার লহর—
হে প্রাসাদ, বলো শুধু মনে আছে, মনে আছে: শুনি একবার!

মেহেদির জন্য কবিতা

আবুল হোসেন

তোমাকে চাই তোমাকে চাই ওগো দুর্লভা বল্লভা আমার
রূপ নয় সাজ নয়, সায়াহ্নের অন্ধকারে অস্পষ্ট আধো আধো
পরিচয় স্বপ্নের মতো, রহস্যনিবিড় বসন্তের লাবণ্যবিলাসে-
তৃপ্ত দেহ আকাশে মেলে পাখা, সে প্রণয় আমার তো নয়।
তোমাকে জড়াবো বুকে নিবিড় আলিঙ্গনে, রোমাঞ্চিত
জঘনে গলে যাবে গলে যাবে থরথর কপোতী শরীর।
সোনাছড়ানো দীপ্ত গোধূলিতে জ্যোৎস্নাজলা বোর্খাহীন রাতে

প্রতি মুহূর্তে দেখেছি তোমাকে, দিইনি তাকে রূপক; বলেছি
শেষ হোক শেষ হোক আভরণ রঙিন কুহক আর বিচিত্রিত
তনিমা লেপন। জড়াক জড়াক পাকে পাকে গুরুভার
নিতম্বের উদ্ধত নর্ম তোমাকে সমস্ত শরীর বেয়ে।
রাত্রির দু'কূল ছাপিয়ে ছলছল জলকল্লোল দুরন্ত জোয়ারে
ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে বারেবারে যে তটরেখায় তোমার
সেখানে আমার অভিজ্ঞান। থরথর দেহ শিহরিত প্রাণ।

পৌষ ১৩৫০

ঝরে যায় মরে যায় আঙুরদোলানো এই ভেঙে পড়া
যৌবনের দিন দুঃসহ একাকীত্বে, নিদ্রাহীন দীর্ঘ দীর্ঘ রাত
বেদনায় বাসনায় ছলছল আর সময়ের প্রাচীন পাহাড়
পিষে মারে সুকুমার প্রাণের সবুজ, স্মরণের সোজা পথে
নিসঙ্গ দেওদার, শূন্য শূন্য ঝর্না দ্রাক্ষালতাগুল্মহীন বালু
তপ্ত হাওয়ায় ওড়ে আকাশমনে, জ্বলে যাই জ্বলে যাই
অসহ্য তাপে, ওগো দুর্লভা বল্লভা আমার তোমাকে চাই।

হে প্রিয়তমা, ক্ষমা নাই ক্ষমা নাই, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আসে
আঙুলের ছোঁওয়া শিশিরধোওয়া শেফালিতনুর ঘ্রাণ
পল্লবঢাকা চকিত আলোর রাত আছে আমার অঙ্গীকার,
শিহরিত আমি কম্পিত আমি, থরথর রাঙা বিহ্বল যৌবন।
ঘন অনুরাগে ফেটে পড়ে পড়ে পরম পরাগে তোমাকে ঘিরে।
রাত্রির তিমির ছিঁড়ে হে জলন্ত জোৎস্না এসো আমার শরীরে।
ওগো দুর্লভা বল্লভা আমার তোমাকে চাই তোমাকে চাই।

কবিতাভবনের

উদ্যোগে

নাট্যাভিনয়

বুদ্ধদেব বসু-র

মায়া-মালঞ্চ

(লেখকের 'কালো হাওয়া' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত)

পরিচালনা : বুদ্ধদেব বসু

শীতের শেষে কলকাতায় আত্মপ্রকাশ করবে

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

কঙ্কাবতী

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো। এই সংস্করণে ১৪টি নতুন কবিতা সংযোজিত হয়েছে। রয়াল আকারে পাইকা অক্ষরে ছাপা, বোর্ডে বাঁধাই সুদৃশ্য মলাট। দাম দুই টাকা চার আনা

সদ্যপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

দময়ন্তী

আড়াই টাকা

অভিনব কাহিনী কবিতা

বিদেশিনী ॥০

সব-পেয়েছির দেশে

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো। দাম ১৸০

কবিতাভবনের নতুন উদ্যম

প্রতিভা বসু সম্পাদিত

ছো টো গ ল্প

গ্রন্থমালা

এই গ্রন্থমালায় প্রতি মাসে একটি ক'রে ছোটোগল্প প্রকাশিত হবে। বাংলার বিখ্যাত লেখকের রচনা এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হবে, তাছাড়া নবীন লেখকরাও এতে আমন্ত্রিত। প্রতি সংখ্যা চার আনা, বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা। পৌষে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বার্ষিক গ্রাহক পৌষ সংখ্যা থেকেই হ'তে হয়। বইগুলির আকার ও আকৃতি কবিতাভবনের 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অনুরূপ, শোভন দ্বিবর্ণ মলাট।

এলিয়টের নূতন কবিতা

অমিয় চক্রবর্ত্তী

সাদা পাথরকে স্তবকে স্তবকে পুষ্পিত ক'রে তোলা আশ্চর্য কবি-কারিগর এলিয়টের সাধ্য। এমনতর বাক্যের প্রত্যক্ষ মাধুর্য যে-কোনো দেশের সাহিত্যে দুর্লভ।

When the short day is brightest, with frost and fire,
The brief sun flames the ice......
A glare that is blindness in the early afternoon.
And glow more intense than blaze of branch, or brazier,
Stirs that dumb spirit: no wind, but pentecostal fire
In the dark time of the year......

বলা যেতে পারে এ তো বরফের ফুল, পাথরের নয়, কিন্তু শিল্পীর মনের সাদা জলন্ত আগুন প্রকাশিত হয়েছে কত কঠিন, কত সংহত লীলায়িত কথার বৃন্তে।

..... Now the hedgerow
Is blanched for an hour with transitory blossom
Of snow, a bloom more sudden
Than that of summer......
Where is the summer, the unimaginable
Zero summer?

কেবলমাত্র এই মন্ত্রধ্বনিত কাব্য, বিরল দৃঢ় চিত্রণের ভাষা মনে ধারণ ক'রেই এলিয়টের নবতম কবিতাটিকে উপভোগ করা চলে।

কিন্তু জানি চতুষ্কোণ হীরের মতো চারটি কবিতায় একক এই প্রকৃষ্ট রচনায় বিশেষ একটি নিগূঢ় তত্ত্বের আলো ঠিক্‌রেছে। নিরবধি কাল এবং প্রতি মুহূর্ত, এই দুয়ের অবাঙমানসগোচর মর্ত্যযোগে আমরা আছি; এরি রহস্য এলিয়টকে এই নূতন বিচিত্র কাব্যদর্শনে প্রবৃত্ত করেছে। বোধ করি তাঁর বিশেষ নির্দ্দিষ্ট প্রতীতি সৃষ্টির রহস্যময়তাকে অতিক্রম ক'রে স্থিরদৃষ্টির সাক্ষ্য দিতে চায়; কাল ও মহাকালের দ্বন্দ্ব তিনি স্বীকার করেন না, অতএব রহস্যকেও নয়; কিন্তু তাঁর বাক্য যে-সঙ্কল্পই প্রকাশ করুক, আমাদের কাছে কাব্যের আভাময় বিস্ময়টুকু উপভোগ্য।

কালের পরমতত্ত্ব এই চারটি কবিতাকে ছেয়ে আছে। ছোটো ছোটো গ্রামের নামে এই কবিতাগুলি রচিত—**Burnt Norton, East Coker The Dry Salvages, Little Gidding**;—তার চতুর্দ্দিকে বৎসরে বৎসরে এলিয়ট তাঁর ভাবনার আকাশ বিস্তার করেছেন। মোটামুটি একই ভাবের নানারঞ্জিত প্রয়োগ এই রচনাধারায় দেখতে পাই। আমরা যেখানে আছি তার একদিকে শেষ, একদিকে নূতন আরম্ভ; অথচ সমস্ত মহাকালের মধ্যে আরম্ভও নেই, শেষও নেই। বসন্তের

গোলাপ, শীতের তুষার ফুল, হেমন্তের রাঙা ঝরা পাতা—দূরে নদীর রৌদ্র জল—এরই ধার দিয়ে আমরা চলেছি। মনে হয় চলেছি। আসলে চলা আর স্থিরতা দুইই এক আকাশে বিধৃত; যার মধ্যে দিয়ে চলছি তা আছে, এবং ছিল, শেষ হবে না। কিছুই তাই হারায় না, হারাবে কোথায়? চেয়ে দেখো অবচেতনার স্তরে স্তরে জড়ানো সময়কে, সেখানে ভাঙা চাঁদের আলোয় দেখা হাড়, পায়রা উড়ছে উজ্জ্বল দুপুরের হাওয়ায়, সিঁড়ি থেকে দেখা যায় বাগানের সবুজ, কাকে কী বলেছি বা মনে করেছি যে বলেছি; শামুক, ঝিনুক। মনের রঙ্ দিয়ে চাইলে কোনোটা সত্য, কোনোটা মায়িক, ভালো বা মন্দ, কিন্তু এই সবই স্রোতের ঢেউ, স্রোতের গতি কিছুতেই নির্ভর করে না। আবার বলছেন, মহাকাল বা মহাকাশ তার স্বরূপ কী; আমাদের মন-গড়া কম বেশি স্থিতি বা পরিমাণের বিচারে তা ধরা পড়ে না,—

The moment of the rose and the moment of the yew-tree
Are of equal duration.

পরেই যোগ করলেন,

for history is a pattern
of timeless moments.

অর্থাৎ চৈতন্যের ভাস্বরযোগে সময় আরো একটি মহাকালকে উদ্‌ঘাটিত করে, সেইটেই হোলো আসল ইতিহাস।

এতটা এগিয়ে পাঠকের মন ব'লে উঠতে পারে, তবে তো কিছুই করবার নেই। সমস্তই ঘুরছে, স্থির হয়ে আছে "at the still point of the turning world"; অনন্ত আবর্তন। অন্যায়কে দূর করব না, সুন্দর করব না পৃথিবীকে, চাষ করব না মাটি, সংসার এগোবে না বীর্যের দিকে? Eliot তো বলতে চান করাও যা, না করলেও তাই, সব হয়েই আছে। চিরন্তন স্বর্গীয় আমাদের এই সৃষ্টির জেলখানা। অথচ স্বর্গই বা একে বলি কী ক'রে; স্পষ্টই দেখছি পাপ বেড়ে উঠল সংসারে, এলিয়টের দেশও সংহারী যুদ্ধে লিপ্ত, সকলের মুখেই ধর্মের নাম। সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই আমাদের চৈতন্য জাগবে স্বাধীন সমাজ রচনার কাজে, চক্রাবর্তন ছেড়ে আমরা নামব সৃষ্টির কাজে। তাই তো পেয়েছি আমার হাতে জোর, মনে শক্তি, নিকৃষ্টতার বিরুদ্ধে রুদ্র রাগ। শিল্প এবং কাব্যও তো সেই সক্রিয় চলোর্মি-মুখরিত প্রাণের বাহন।

এলিয়ট হয়তো কিছুই অস্বীকার করবেন না। এই কাব্যে তিনি বলছেন, "still point"-এ চেয়ে দেখো। তার পরে কী হবে তা স্পষ্ট ক'রে তিনি বলেন নি। কিন্তু আজ তিনি যা জানাতে চান, তাঁর ব্যাখ্যাত সেই আত্মসাধনার চরম দাবীর সঙ্গে বিশ্বগত কল্যাণসাধনার বিরোধ নেই। "Miracle"-এর জন্য অপেক্ষা ক'রে লক্ষ বুভুক্ষু আতঙ্কিতের দল চকিতে

রক্ষা-কবচ পাবে বিশেষ কোনো ধর্মনেতার স্বেচ্ছামৃত্যুতে—এই ছিল তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রামাণ্য বিষয়। এখন একটু বদ্‌লে বলছেন।

And all shall be well and
All manner of things shall be well
When the tongues of flame are in-folded
Into the crowned knot of fire
And the fire and the rose are one—

এখানে খৃষ্টীয় ধর্মসাধনার বিশেষ উল্লেখ আছে; দ্বাদশ ভক্তের জীবনে "pentecost"-এর দিব্যাগ্নি যখন পৌঁছল তাদের জ্বলন্ত জীবনে বেদনা ও করুণার দান এক হ'য়ে উঠল, মানুষের সেবার দুরূহ কাজে তখন তাঁরা পথে বেরোলেন। প্রেমের নবীন মঞ্জরিত গোলাপ এবং রাঙা আগুনকে এক ক'রে দেখে যে-অনন্তদৃষ্টি, তারই কাছে পথের বাধা ঘুচে যায়। পূর্বতনদের সঙ্গে যোগও হয় সেই মুক্ত দর্শনের ক্ষেত্রে; প্রাচীন সংস্কৃতির হাওয়া যে-তীর্থে আজও সহজ হয়ে জেগে আছে সেখানে গিয়ে নিজের দীক্ষাকে জ্বালিয়ে নিতে হবে তাহলে খুঁজে পাবো সোজা রাস্তা। এলিয়ট বরাবরই ট্রাডিশনে বিশ্বাসী, অত্যন্ত আধুনিক হয়েও তিনি জেনেছেন,

the communication
Of the dead is tongued with fire......

এবং এই "communication"-এর সন্ধানে তিনি উপস্থিত হলেন Little Gidding নামক পূর্ব ইংলণ্ডীয় গ্রামে, যেখানে প্রথম সম্রাট চার্লস্-এর সময়ে বিশেষ একটি মিস্‌টিক ধর্মসম্প্রদায় একত্র হয়ে নিভৃতে তাঁদের উপাসনার কেন্দ্র রচনা করেন।* ভাঙা গির্জা আজো পড়ে আছে, বাহিরের ঐশ্বর্য আগেও ছিল না, এখন আরো নেই কিন্তু সেখানে বিত্তহীন মন্দিরহীন অনাড়ম্বর প্রার্থনার ঐশ্বর্যরূপ এলিয়ট আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ গ্রহণ করলেন।

You are here to kneel
Where prayer has been valid. And prayer is more
Than an order of words, the conscious occupation
Of the praying mind, or the sound of the voice praying... ..

এলিয়টের কাব্যে-নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিচার আমার উদ্দেশ্য নয়। তার মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ধর্মানুষ্ঠান, প্রতীক-প্রবণতা, বিজ্ঞান দর্শন ঐতিহাসিক উল্লেখের সংমিশ্রণ আছে যা বাহিরে রাখতে চাই। কেবলমাত্র মূল ভাবনায় গ্রথিত শিল্পরূপটির স্বল্প পরিচয় এখানে দেওয়া চলে। অন্তর্ভাবিত সেই রূপটি অতি সূক্ষ্ম আনন্দিত মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে; এলিয়টের কাব্যের গড়ন অপূর্ব ভায়ায় সমন্বিত সেই কথাই বলতে চাই।

(১) এই তথ্য রেডিয়োতে বলা E. M. Forsterএর মন্তব্য হতে সংগ্রহ করেছি।—লেখক

Only by the form, the pattern,
Can words or music reach
The stillness, as a Chinese jar still
Moves perpetually in its stillness.
Not the stillness of the violin, while the note lasts,
Not that only...... (Burnt Norton)

সচেতন শিল্পের এই রকম বিশিষ্ট সুযৌক্তিক অথচ কল্পরঞ্জিত বাক্য, দৃঢ়বদ্ধ গদ্যকাব্যধর্মী প্রাঞ্জল এই ছন্দের অন্তর্লীন তরঙ্গ মনে একটি অপূর্ব নিবিষ্টতা সঞ্চার করে; পূর্বতন কাব্যে এর ঠিক তুলনা নেই। একেই য়েটস্ একজায়গায় বলেছেন আধুনিক কবিদের প্রবর্ত্তিত the precision of good prose, যা কাব্যে প্রবেশ ক'রে তাকে নূতনতর নির্মিতির মাধুর্য দিয়েছে। ("No poet of my generation would have written "moderate" exactly there...the close of a long period, the ear expecting some poetic word checked, delighted to be so checked, by the precision of good prose") য়েটস্-এরই কথায় বলা চলে "the true poetic movement of our time is towards some discipline"—এই "heroic discipline" চরম প্রকাশ পেয়েছে এলিয়টের শেষ চারটি কবিতায়।

সময়ের বিস্ময়মন্ত্রে আমরা সকলেই দীক্ষিত কেননা এই যুগের বিজ্ঞান-দৃষ্টি লক্ষকোটি বিগত বৎসরকে লুকোনো ভূ-স্তরে, কঙ্কালের হারানো পুনরাবিষ্কৃত যোগসূত্রে, আদিম তারা থেকে অণুতম কণিকার আকাশে ব্যক্ত করেছে—ইতিহাসের মানসিক মহাকালও চতুর্দিকে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। এক হিসাবে যতই আমরা এগিয়ে চলেছি ততই পিছনেরও অতি কাছের খবর আমাদের কাছে ধরা পড়ল, পূর্বতর যুগের মানুষ পূর্বতমদের কাছ থেকে আরো দূরে ছিলেন। মনের কাল তাই আমাদের আজ আরো ব্যাপক, এবং একই কালে বৃহৎ বিশ্বের বৈচিত্র্য কতরূপে প্রকাশিত হয়ে চলছে সে-সম্বন্ধেও আমরা সচেতন। সুতরাং আমাদের কবিতায় গল্পে কালের নূতন দৃষ্টি এসে পৌঁছল; আপেক্ষিক কাল, প্রাণীদের মধ্যে চৈতন্যের ভিন্নতায় কালের ভিন্নতা; ঘুমের কাল এবং জাগরণের কালের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিকদের প্রমাণিত পার্থক্য—এই সকল বিষয় আজ কাব্যের অন্তর্গত। আমরা জানি বিশেষভাবে স্পেণ্ডর ঐতিহাসিক কালের কাব্যব্যাখ্যাতা, এমন কি তাই নিয়ে তিনি অতি সুন্দর লীরিক রচনা করেছেন যাতে বিস্ময়ের সহজতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ঘটনা; অডেন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি-পাওয়া, নানাজাতীয় ভাবনার সময়কে নিয়ে তিনি অদ্ভুত কাব্য বেঁধেছেন। কিন্তু যে "heroic discipline"-এর শিল্পদক্ষতায় কবি এলিয়ট সময়ের ভাবনাকে কাব্যে চিরকালীন রূপ দিতে পেরেছেন তার তুলনা পশ্চিম দেশের কোনো কাব্যেই পাওয়া যাবে না। অভিনব বিষয়বস্তু বা আবেগের

অসংস্কৃত বেগ, এর কোনোটাই কাব্যে যথার্থ নূতনত্ব অর্থাৎ প্রাণসঞ্চার করতে পারে না—এলিয়ট কবি, তাই কাব্যের উপকরণ, বা শিল্পের বিজ্ঞানকে ছাড়িয়ে তিনি আধুনিক যুগের একটি অন্তরতম মনোধারাকে এমন আশ্চর্য্য প্রকাশ করেছেন। আধুনিক জীবনের অনেক দিক তাঁর কাব্যে অনভিব্যক্ত —তার জন্যে যেতে হবে অন্য কবির দরবারে, যাঁদের চিত্তের সঙ্গে আমাদের যোগ হয়তো নানা ভাবে ঘনিষ্ঠতর—কিন্তু এলিয়টের এই নূতন কবিতাগুলি বিশেষ অর্থে এবং সাধারণ অর্থেও কালধর্মী একথা স্বীকার করতে হবে।

এলিয়টের শেষ চারটি কবিতার মূল বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত অথচ চিত্রধ্বনিময় কয়েকটি ছিন্ন পদ এখানে উদ্ধৃত করি।

(ক) After the kingfisher's wing
Has answered light to light...... (Burnt Norton)

(খ) Now the light falls
Across the open field, leaving the deep lane
Shuttered with branches, dark in the afternoon...
(East Coker)

(গ) Where you lean against a bank while a van passes.
And the deep lane insists on the direction
Into the village, in the electric heat
Hypnotised. In a warm haze the sultry light
Is absorbed, not refracted, by grey stone,
The dahlias steep in the empty silence......
(East Coker)

(ঘ) The river is within us, the sea is all about us...
(The Dry Salvages)

(ঙ) At the source of the longest river
The voice of the hidden waterfall
And the children in the apple tree.... (Little Gidding)

(চ) Footfalls echo in the memory
Down the passage which we did not take
Towards the door we never opened
Into the rose-garden. My words echo
Thus, in your mind ... (Burnt Norton)

(ছ) What we call the beginning is often the end
And to make an end is to make a beginning.
The end is where we start from ... (Little Gidding)

(জ) If you came this way in maytime, you
would find the hedges
White again, in May, with voluptuary sweetness.
It would be the same at the end of the journey......
(Little Gidding)

(ঝ) So I find words I never thought to speak
In streets I never thought I would revisit
When I left my body on a distant shore.
(Little Gidding)

(ঞ) Here the intersection of the timeless moment
Is England and nowhere. Never and always.
(Little Gidding)

---

(২) উদ্ধৃতাংশ গ-র পঞ্চম লাইনে "insist" কথাটা লক্ষ্য করতে হয়। তা ছাড়া "electric heat," "absorbed," "refracted" এ সব কথার ব্যবহার বিশেষভাবে আধুনিক, এবং গদ্যের সুরে মনঃশীল।

সমালোচনা

অন্নদাও, অন্নদাতা, নিমন্ত্রণ, দূরের ভাই, ১৩৫০

অমিয় চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত

প্রতি কবিতা চার আনা, খামসমেত পুরো সেট ১।০

বাংলাদেশের গ্রন্থন-জগতে এই কবিতাগুলির প্রকাশ অভিনব ঘটনা। হাতে তৈরি দিশি মোটা রঙিন কাগজে কালিকা প্রেসের বড়ো বড়ো নতুন অক্ষরে এক একটি কবিতা সুচারুরূপে ছাপা; যামিনী রায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও বি উটেথ-এর আঁকা মনোরম প্রচ্ছদপট; দেখতে, সাজিয়ে রাখতে, নাড়াচাড়া করতেও ভালো লাগে। একটি ক'রে কবিতা একটি সুদৃশ্য পুস্তিকাকারে প্রকাশ সাম্প্রতিক ইংরেজি সাহিত্যে দেখা গেছে, আমাদের সাহিত্যে এ ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম। চার আনা দাম প্রথমটায় বেশি মনে হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যশৌখিন ব্যক্তি এর আকৃতিবৈশিষ্ট্যের জন্যই খুশি হয়ে চার আনা দেবেন, তাছাড়া লেখক যখন বলে দিয়েছেন যে কবিতাগুলি অন্নার্থীর সাহায্যকল্পে বিক্রি করা হবে, তখন তো এ বিষয়ে কোনো কথাই ওঠে না।

নিরন্ন বাংলার বেদনা স্পর্শ করেছে এই কবিতাগুলিকে। বুভুক্ষুবাহিনীকে লক্ষ্য করে তিনি বলছেন :

পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর
জন্মে না কিছু অন্ন—
এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য ?
* * *
গ্রামে যাও, গ্রামে যাও,
এক লাখ হয়ে মাঠে নদীধারে
অন্ন বাঁচাও, পরে সারে সারে
চাবে না অন্ন, আনবে অন্ন ভেঙে এ দৈত্যপুরী,
তোমরা অন্নদাতা।
জয় করো এই শান-বাঁধা কলকাতা ॥

অন্নহীন অন্নদাতার হাহাকারের সুর লেগেছে 'অন্ন দাও' কবিতায়। 'রাতের কান্না দিনের কান্না ঘুরে ঘুরে ওঠে অন্ন দাও।' এদিকে

অন্ন আছে
লোভের মাড়াইয়ে ধ্বংস গোলায় অন্ন আছে,
* * *
ঝকঝকে ঘরে ঝড়ে মারীতেও—নেই কি অন্ন।
লক্ষ কলের অন্ন আছে।
সহর-গ্রামের কোটি জনতার
নেই শুধু চোখে সবুজ অন্ন,
সোনার অন্ন।

এ প্রার্থনা শুধুই দেহের ক্ষুধার জন্য নয়। প্রাণ শুকিয়ে গেছে—

অন্ন দাও—
প্রাণের ক্ষুধায় একটু অন্ন দাও।

'নিমন্ত্রণ' লঙরখানার ভিখিরি ভোজনের বর্ণনা। এই অমানবিক দৃশ্য দেখতে সাগর-পারের লোককে তিনি আহ্বান করছেন :

বাপ-মায়ের মূর্ছাদেহ, পাশেই খেলে শিশু
শীর্ণতায় চমকে শিখা প্রাণের,
দোকানে রং, চেয়ে দেখছে, চলছে গাড়ি,
উঁচু বাড়ীতে নীল পর্দা,
সেপাই ঘোরে বড় দরজায়—
দূরে, দূরে, দূরে।
দেখতে দেখতে ক্লান্ত হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে,
চোখের সামনে লক্ষ লোকের
—ফুটপাতেই ফুরোয় নেমন্তন্ন।

'দূরের ভাই' কবিতাটি তাদের উদ্দেশে, যারা এই ঝড়ের মুখে সাগর পার থেকে বাংলাদেশে এসে ছিটকে পড়েছে। অন্য ক'টির মতো, এটিও বিশেষভাবে স্বদেশপ্রেমেরই কবিতা, অথচ বিশ্ব-বোধ থেকে বঞ্চিত নয়। চলতি ইতিহাসের পরে উজ্জ্বল মন্তব্য হিশেবে এই কবিতাগুলো রইলো—কিন্তু শুধু তা-ই নয়, এ শুধু সুরম্য সাংবাদিকও নয়—বর্তমান বাংলার বুক-ফাটা বেদনা এখানে এমন একটি ভঙ্গিতে অথচ গভীর আবেগের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে যেটা সত্যিকার কবির পক্ষেই সম্ভব। উপস্থিত ঘটনা নিয়ে কবিতা লেখা সবচেয়ে দুরূহ, অমিয়বাবু সে-অগ্নিপরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

চিত্রলেখা, প্রতিমা দেবী। বিশ্বভারতী, ১৸০ ও ২॥০

নীল তুলোট কাগজে ছাপা, চমৎকার বাঁধানো এই বইটি গদ্যরচনা ও কবিতার সংগ্রহ, হাতে পেয়ে সুখী হওয়া গেলো। ছোটো ছোটো গদ্য রচনাগুলি 'লিপিকা' ধরনের; কবিতার অংশ কিছু গদ্যে, কিছু পদ্যে বাঁধা। সর্বত্র এমন একটি সুস্নিগ্ধ মৃদুতা, যা ভালো অর্থে মেয়েলি; ভাষার এমন একটি সৌকুমার্য যা রূপ নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের রচনাবলী থেকেই, অথচ লেখকের মনের করুণ কোমলতাটুকুকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়নি। যথাস্থানে প্রাপ্তিস্বীকার প্রতিমা দেবী অকুণ্ঠিতভাবেই করেছেন, গদ্য-পদ্য রচনার কলাকৌশল গুরুদেবের কাছে তাঁর হাতে কলমে শেখা। সে শিক্ষায় তিনি যে উপকৃত হ'তে পেরেছেন এ বইয়ে, বিশেষ ক'রে বইয়ের গদ্য অংশে তার প্রমাণ মিলবে। যা সেন্টিমেন্টাল হ'তে পারতো, তাকে তিনি রাবীন্দ্রিক সুমিতির শাসনে বেঁধে দিয়েছেন। গদ্য রচনাগুলির মধ্যে 'সতেরোই ফাল্গুন' উল্লেখযোগ্য ও সংকলনযোগ্য, তাতে 'বিচিত্রিতা'র একটি কবিতার ছায়া অবশ্য পড়েছে, তা পড়লোই বা। কবিতাগুলিতে ছোটো

ছোটো কথায় চলতি জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে; গোরুর গাড়িতে 'লণ্ঠনের ঝিকিমিকি দোল খাওয়া আলো' যেন কোন বিষণ্ণ-মধুর সুর মনে আনে; সাঁওতালি মেয়ের বর্ণনায় সমস্ত শান্তিনিকেতন চোখের সামনে জাগে, চকিতে দেখা দেয়—

বরন তাহার উজ্জ্বল শ্যাম
তন্বী মেয়ে
নরম হাওয়ার দোলন-খাওয়া
ঝুমকো লতা।

রচনাগুলি যে 'ambitious' নয়, সেইটেই এদের প্রধান গুণ, একটি স্বভাবকোমল সংবেদনশীল হৃদয়ের পরিচয় এখানে রইলো। রবীন্দ্রনাথের একটি গদ্য রচনা ও তাঁর হস্তাক্ষরে মুদ্রিত একটি কবিতা বইটির গৌরব বাড়িয়েছে।

'চিত্রলেখা' প্রতিমা দেবীর দ্বিতীয় গ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থ 'নির্বাণ' রবীন্দ্র-সংক্রান্ত সাহিত্যে সম্মানের আসন পেয়েছে। কিছুদিন আগে 'প্রবাসী'তে এবং সম্প্রতি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় তিনি যে স্মৃতি-কথা প্রকাশ করেছেন সেইটি সুসম্পূর্ণ ক'রে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করতে তাঁকে অনুরোধ করি; বিষয়-বস্তুর গৌরবে ও রচনাভঙ্গির লাবণ্যে তাঁর স্মৃতিকথা সর্বসাধারণের, বিশেষ ক'রে সাহিত্যিকের উপভোগ্য হবে।

বুদ্ধদেব বসু

ইঙ্গিত, মণীন্দ্র রায়। পরিচয় প্রেস। দাম আট আনা।

তরুণ কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে মণীন্দ্র রায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন তাঁর মৌলিকতার গুণে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নিজস্ব এবং সে দৃষ্টিকে প্রকাশ-কৌশলে প্রসারিত করবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

আলোচ্য বইখানি, রামায়ণের একটি অধ্যায় নিয়ে রচিত পঞ্চাঙ্কের নাটিকা। রামায়ণের একটি বিশেষ দিক আছে যা তার বিষয়বস্তুর মধ্যেই নিহিত এবং ভিন্ন যুগের কবি ও ঐতিহাসিকদের আকৃষ্ট করেছে, নানা রকমের রূপক সন্ধানে ও ব্যাখ্যানে অনুপ্রাণিত ক'রে এসেছে। আধুনিক কবি সাম্রাজ্যধর্মের প্রতীক রাবণের জয়লিপ্সা, ভোগেচ্ছা এবং তার পতনকে কেমন করে বর্ত্তমান জগতের শ্রেণিসংঘাতের সূত্রে আবদ্ধ করে কাজে লাগাতে পারেন, 'ইঙ্গিত' নাটিকাটি তারই সুন্দর ইঙ্গিত। অতীতের গান ক্ষান্ত হয় না, পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্যই করে। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার জটিল আবর্ত্তের মধ্য দিয়ে ইতিহাসচক্রের অমোঘ ঘূর্ণন এবং পরিশেষে বিপ্লবের সাহায্যে সাম্যের পরিণতি, এইটাই হ'ল নাটকের মূল বন্ধনী।

মার্কস্‌বাদীর কাছে পুরাণ ইতিহাসের এই যথার্থ রূপ দেখিয়ে দেওয়ার কৌশলটি মূল্যবান। মণীন্দ্র সে কৌশল ভালোভাবেই প্রয়োগ করেছেন।

সাহিত্যের ঐতিহ্যকে তিনি যে অস্বীকার করেননি তার প্রমাণ, এই মহাকাব্যের একটি নির্ব্বাচিত খণ্ডকে তিনি সেই পুরোনো অমিত্রাক্ষরেই বেঁধেছেন। কিন্তু তাঁর প্রকাশের বাহনকে কিছুটা নতুন সাজ দিয়েছেন। অন্তর্মিল এবং সমিল যুগ্মপদ রচনায়, সুন্দর বাক্যবিন্যাসের সাহায্যে বক্তব্যের অবাধ নাটকীয় গতিতে এমন একটি দ্রুতসঞ্চারী ভাব জমেছে যা উনিশ শতকের অমিত্রাক্ষর-প্রয়োগে ভালো ফুটতো। বিভিন্ন দৃশ্যগুলিকে মণীন্দ্র সংযোজনা করেছেন একটি অখণ্ড সুরের বিকাশে, যে সুর একেবারেই অধুনাতন।

যদি মণীন্দ্র নাটকের চরিত্রগুলিকে শুধুই কয়েকটি আদর্শের প্রতীক-হিসেবে ব্যবহার করতেন তাহ'লে তাঁর বক্তব্য হয়তো জোরালোই হ'ত কিন্তু শিল্পাত্মক কাজ অনেকখানি ব্যাহত হ'ত, একথা নিশ্চিত। তা যে হয়নি, সেইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। শ্রেণিচ্যুত বিভীষণ, সমাজচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ সরমা, আভিজাত্যে অনাস্থাবান্ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিরোধী আদর্শ নায়ক রামচন্দ্র, সমাধিকার-প্রত্যাশী অনার্য্য বানরের দল,—সকলেই দেশের প্রাণলক্ষীর উদ্ধারে যত্নবান্ এবং কৃতকার্য্য হয়েছেন এবং সেইসঙ্গে তাঁরা একটি করে নতুন চারিত্র্য লাভ করেছেন, সেইটেই মণীন্দ্রের আঙ্গিকের সাফল্য নির্দ্ধারণ করে।

আগামী বিপ্লবের ঝড়ে যে শোষণ-শতাব্দীর অবসান এবং স্বাধিকারের সিদ্ধি, ভবিষ্যচিত্র হিসেবে সে শুধু সুন্দর স্বপ্ন নয়, জনগণের আন্দোলনে, কর্ম্মে ও জয়ে তা প্রাণবন্ত। 'ইঙ্গিতে' এই কথাই বলা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে আগামী কাব্যশিল্পের একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত। যে কারণে বইখানি আমার কাছে অর্থপূর্ণ সেটি এই যে পুরাতনকে মণীন্দ্র বাদ দেননি, তাকে জেনে আয়ত্ত করে' তার ব্যবহার-মলিন, জীর্ণবেশ ও সংস্কার দূর করে' অতীতের মধ্যেই যে নতুন বীজ অঙ্কুরিত আছে তাকে পল্লবিত করেছেন এবং আভাস দিয়েছেন যে মার্কসবাদীর শিল্পকৌশল সত্যিই নতুন সৃষ্টিমূলক প্রক্রিয়া হতে পারে,—যার মূল্য শুধু প্রচার-সর্বস্ব মতবাদই নয়, মানবিকতায় গ্রহণযোগ্যও বটে।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

খোলা চিঠি (এক পয়সায় একটি গ্রন্থমালা)। সমর সেন। কবিতাভবন। দাম চার আনা।

আজকাল সমর সেনের নতুন লেখা পড়তে গেলে ভয় হয়। ভাবি, সত্যিকার ভালো লেখক যখন আত্মরোমন্থনের অমোঘ চক্রে ধরা পড়েন তখন তাঁর সে শোচনীয় পরিণতি তাঁর ভক্তদের কাছে বোধহয় এইরকম

অসহনীয়ই হয়। একদিন সমরবাবুর রচনায় পয়ারের গদ্যস্বাচ্ছন্দ্য ও প্রকাশভঙ্গির যে কঠিন দীপ্তি আমাদের মনে চমক এনেছে, কিছুকাল আগে থেকে তা-ই পর্যবসিত হয়েছে তাঁর অত্যন্ত ব্যর্থ মুদ্রাদোষে ; এবং যদিও তিনি বারবার বলেছেন যে, decadent সাহিত্যের লক্ষণই হ'চ্ছে তার ভাবগত নিঃস্বতা তবু বিজ্ঞানসম্মত প্রগতিশীল জীবনদর্শনে উত্তরোত্তর আস্থা রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কিন্তু তাঁর নিজস্ব সাহিত্যিক ইতিহাসের চক্ররেখাতেই ক্রমশ ধরা পড়ে গেছেন। এ-থেকে এইই বোধ হয় প্রমাণ হয় যে, কবিত্বের সঙ্গে অতিরিক্ত দার্শনিকতার মিশ্রণে যে-বস্তুটি কাব্যে তৈরী হয়, সে-টি একটি mechanical mixtureএর মতো কিছুটা কৃত্রিম, chemical compoundএর মতো নির্ভেজাল, খাঁটি জিনিষ সেটি হয় না।

'খোলা চিঠি' পড়তে গিয়ে তাই এই অস্বস্তিকে মন থেকে তাড়াতে পারিনি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার এই বইটি আমার অত্যন্ত ভালো লাগলো। এখানেও অবশ্য তাঁর সেই অতি-পরিচিত mannerismএর অভাব নেই, তবু এর বিলম্বিত পংক্তি-গুলিতে এমন একটা আশ্চর্য দীপ্তির সাক্ষাৎ মেলে, যা সমর সেনের রচনাতেও ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এ ছাড়া মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে মিলের সৌকর্যে মনটা খুশিই হয়ে ওঠে। লক্ষ্য করলুম, এ বইটিতে তিনি শুধু পংক্তির শেষে মিলই ব্যবহার করেন নি, অনেকক্ষেত্রে কয়েক পংক্তিতে পর্বের শেষে মিলও অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন এবং তা অত্যন্ত সার্থকও হয়েছে। এটা ভাবতে স্বভাবতই আশ্চর্য লাগে, সমরবাবুর রচনার নিরেট গম্ভীর কারুকার্যের মধ্যে পংক্তির মিল, এমন কি পর্বের মিলের অস্বাভাবিক চটুলতা কী ক'রে এমন নির্ভুল মানিয়ে গেলো! অথচ নিচে উদ্ধৃত, তাঁর রচনার বিভিন্ন জায়গা থেকে বেছে নেয়া, কয়েকটি পংক্তিতে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব পুরোপুরি বজায় থাকা সত্ত্বেও পর-পর পংক্তির মিল ও পর্বের মিল কী সুন্দর সার্থক হয়েছে দেখুন :

...বিমান ঘাঁটিতে হঠাৎ হাজিরা দেয় ; এখনো পড়েনি বাজ,
চলে কুচকাওয়াজ,
নিরপেক্ষ শূন্যে ঘোরে মজাদার হাওয়াই জাহাজ।
হাম্‌লা কি হবে শুরু, মেঘ ডাকে গুরু গুরু,
ঝোড়ো হাওয়া সারাদিন, মেঘে মেঘে আকাশ কঠিন।

(খোলা চিঠি)

কিম্বা,

...নদীতে ডেকেছে বান, পাখিরা গায় না গান,
একে একে লুপ্ত দেশ নারকীয় অন্ধকারে
তবুও আলোর চুম্বকস্তম্ভ এদিকে ওদিকে বাড়ে,...

(জাতীয় সঙ্কট)

এইরকম আরো অনেক উদাহরণ এ বইটিতে মিলবে। বইটির আর

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এর ভাষায় অন্যান্য প্রাদেশিক শব্দের প্রাচুর্য। বিশেষত দিল্লি-প্রবাসী সমরবাবু বাংলা কবিতায় যে-রকম স্বচ্ছন্দে অসংখ্য হিন্দি ও উর্দু শব্দের আমদানি করছেন, তাতে রীতিমতো বিস্মিত ও আশান্বিত হ'তে হয়। সত্যিই, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমাদের আধুনিক কাব্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও খাঁটি ইংরেজী শব্দ যতটা সহজে স্থান পায়, অন্যান্য বিশুদ্ধ প্রাদেশিক শব্দ সে তুলনায় কিছুই পায় না। সমরবাবু দেহে ও মনে এই সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে যে ঘোচাতে চেষ্টা করছেন, এটা অত্যন্ত সুখের বিষয়।

বইটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে সাহিত্যের সমালোচকের ঠিক বিচার্য নয়, সুতরাং এখানেও তা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক। তবে মোটামুটি এটুকু বলা যেতে পারে যে, বর্তমান রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্রান্তিকালে লেখক যে-জীবনাদর্শে অটুট আস্থা রেখেছেন তা অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং আশা করা যায়, অবশ্যম্ভাবীও। যদিও কখনো কখনো ঐতিহাসিক চেতনায় তাঁর অতি-প্রত্যয় চোখে পড়বার মতো, তবু তাঁর সামাজিক উপলব্ধির প্রসার ও পরিণতি কাব্যকে রক্তমাংসে জীবন্ত করেছে :

জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে,
চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়।

শেষ পর্যন্ত তাই যে-ভয় নিয়ে বইটি পড়তে আরম্ভ করেছিলুম তা কাটিয়ে উঠি। ভাবি, সমর সেনের কাছে এখনো অনেক-কিছু আশা করা চলে আর মধ্যবিত্ত মনের দুঃসহ অন্ধকারেও আর একবার নতুন ক'রে জীবনের প্রতি আস্থা রাখি। মানি :

ভুলে, ভ্রান্তিতে, উৎকণ্ঠায় নতুন জীবনের ছাপ
আমাদের চেতনায় পড়ে।

অন্ধকার। **পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।** দাম একটাকা আট আনা।
কালো হরফ। **অমল ঘোষ।** কবিতাভবন। এক পয়সায় একটি গ্রন্থমালা ; দাম চার আনা।
সূর্য্যপ্রণাম। **অবন্তী সান্যাল।** পূরবী পাবলিশার্স। দাম বারো আনা।
কালপুরুষ। **রমাপতি বসু।** দাম এক টাকা।
জনসমুদ্র। **প্রজেশকুমার রায়।** দাম চার আনা।

এগুলি বিভিন্ন আধুনিক কবির লেখা কয়েকটি কবিতার বই। সবগুলি বই পড়বার পর বারবার মনে হ'লো, বোধ হয় এতদিনে আমাদের আধুনিক কাব্য-পট-ভূমিতে স্নায়বিক সুস্থতার বনিয়াদ মোটামুটি একরকম কায়েম হ'য়েছে।

অতি-সাম্প্রতিক জাগতিক বিভীষিকার মধ্যেও আমাদের এইসব কবিদের মানসিকতায় সুস্থ মানবিকতার লক্ষণগুলি যে-রকম ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠছে, তা'তে মনে সাহস পেয়ে আরাম বোধ করি। যদিও এঁদের অনেকেরই প্রকাশভঙ্গীতে অপরিণতি, বিষয়বস্তুতে অতি-মাত্রায় technicality ও ভাষায় mannerism-এর ধূলো এঁদের যাত্রাপথকে আবিল ক'রে পাঠকের উপলব্ধিতে আপাতত বাধা জন্মাচ্ছে, তবু উৎকৃষ্ট কবিতার ক্ষেত্র যে মানসিক স্বাস্থ্য, তার সহজাত অধিকারী ব'লে এঁদের সততায় সহজেই আস্থা রাখি।

'অন্ধকার'-এর কবি পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে এই মানবিকতার লক্ষণ ধরা পড়েছে আশাবাদীর অস্পষ্ট অথচ অকুণ্ঠ আকুতিতে। ভাষা ও ভঙ্গীর দুর্বলতায় ('জগতেতে' 'রাতেতে', 'স্রোতেতে' প্রভৃতি পঙ্গু শব্দ ব্যবহারে) এবং একঘেয়েমিতে যদিও এঁর অধিকাংশ রচনাই অনুত্তীর্ণ তবু এই অচলায়তনের পিছনে যে একটি অত্যন্ত জোরালো কবি-মন সার্থকতার সাধনা করছে, হঠাৎ কখনো কয়েকটি কথায় কিম্বা পংক্তিতে তা আশ্চর্যভাবে রূপায়িত। সবচেয়ে সুখের কথা এই যে ইনি যে-কোনোরকম technicality থেকে একেবারে মুক্ত। আর সেইজন্যই এঁর সততায় সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি এখনো এই লেখকের মনে, কোনো পত্রিকা-সম্পাদকের নির্জলা কটুক্তিবর্ষণের ফলে এই জাগতিক বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে,—এরকম কোনো অস্পষ্ট ধারণা বা আশা থেকেও থাকে, তবু একদিন এই সাহিত্যিক দলাদলির চেয়ে বড়ো কোনো আত্মজাত প্রেরণার সন্ধান ইনি পাবেন আশা করা যায়।

'কালো হরফে' অমল ঘোষ কবিমানসের এই আত্মজাত প্রেরণায় আস্থা রেখেছেন, দেখতে পাচ্ছি। তাই তাঁর অল্প কয়েকটি হরফেই জটিল জীবনদ্বন্দ্বের আড়ালে প্রাণের আদিম অলৌকিকতা বারবার চমকে উঠেছে, যদিও এই মনন ও তার প্রতিফলনের কৃতিত্ব অনেকটাই অমিয় চক্রবর্তীর। কোনো কোনো মুহূর্তে তাই স্বকীয় অসতর্ক কলমের আঁচড়ে কাঁচা হাতের চিহ্ন লেখক লুকোতে পারেন নি। মনে হয়, অমিয়বাবু যে-প্রসাদে পরিণত—সেই প্রেরণার প্রসাদ অমল ঘোষ যদি লাভ ক'রে থাকেন, সেই তো যথেষ্ট; কিন্তু পরিণতির নির্জলা প্রভাব অপরিণতকে পথভ্রষ্ট করতে পারে, এ-বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। যাই হোক, এ-সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও আশা হয়, সহজ বুদ্ধি ও ঐকান্তিক সততায় নির্ভর রাখলে এই লেখকের কাব্যচেষ্টা একদিন সার্থক হ'তে পারে।

'জনসমুদ্র' প্রজেশকুমার রায়ের কয়েকটি সত্যিকার ভালো কবিতার সমষ্টি। এর উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা হ'লো এই যে, এর লেখক সব সময়েই সাহিত্যিক সততায় বিশ্বাসী, কোথাও নিজের শক্তিকে অতিক্রম করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন নি তিনি। সীমাবদ্ধ শক্তির অধিকারী হ'য়েও পাঠককে

হতবুদ্ধি করার মতো অশুভ বুদ্ধির উদয় যে তাঁর হয়নি, শুধু এইজন্যেই তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁর বইটি পড়তে পড়তে আমার বারবার মনে পড়লো প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা কথা। কয়েকবছর আগে তাঁর কবিতায় সাম্যবাদের যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্ব'লে উঠেছিলা—তার মধ্যে সাহিত্যিক সম্ভাবনা প্রচুর ছিলো; কিন্তু আমাদের এই কাব্যিক উত্তরাধিকারকে সম্প্রতি ছাই-চাপা দিতে বদ্ধপরিকর হ'য়েছেন কতিপয় লেখক—যাঁরা মুখ্যত রাজনীতিবিদ্। প্রজেশকুমার রায় প্রেমেনবাবুর প্রদর্শিত পথে এই লুপ্ত উত্তরাধিকার-কে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন দেখে সত্যিই অত্যন্ত স্বস্তিবোধ করলুম।

'সূর্য্যপ্রণাম'-এর অবন্তী সান্যাল ও 'কালপুরুষ'-এর রমাপতি বসু, এঁরা দু'জনেই প্রবল আশাবাদী, অবশ্য technical অর্থে। বিশেষত রমাপতি বসু কবিতার নামে তাঁর বত্রিশ পাতার যে-বিচিত্র 'ম্যানিফেস্টো'টি আমাদের উপহার দিয়েছেন সে-টি প'ড়ে, সত্যি কথাই ব'ল্বো, তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হ'তে পারিনি। বরঞ্চ তাঁর জীবনাদর্শের নমুনা—

> ধ্বংস হোক তোমাদের প্রেমের জগত।
> চাঁদ আর ফুল নিয়ে—.
> নহেকো পৃথিবী।
> সে পৃথিবী আজ যাক্ মরে,
> যেথানে প্রেমের বীজ
> অঙ্কুরিত হ'য়ে
> সৃষ্টি হয়
> বিলাসী গায়ক
> আর
> ধার্মিক ভাস্কর।...

আর ভাষা ও বানানের নমুনা—

> বিজীগীষু কমরেডের মনে—
> ব্রাতীনের জয় কথা
> উন্মিষিত হয় প্রতিক্ষণে।
> শিলীন্ধ্রার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
> শ্রমিকের হর্ষধ্বনি বিচ্ছুরিত রহে,
> জিযৎস্থ শ্রমিক, আর
> সৌনিক বিত্তেশ কথা
> নাহি মোটে সহে।...

দেখে লেখকের মানসিক সুস্থতার সঙ্গে প্রচণ্ড ধর্মঘটেরই প্রমাণ পেলুম। এরই পাশাপাশি 'সূর্য্য প্রণাম'-এর সহজ রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে তবু অনেকটা আরাম পাওয়া গেলো; যদিও এই দু'টি বইতেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। আর এই প্রভাবের

শোচনীয় পরিণামস্বরূপ সুভাষের দৃষ্টিভঙ্গীর অল্পবয়সী দুর্বলতাটুকু এঁরা দু'জনেই কম বেশি আয়ত্ত করে ফেলেছেন দেখতে পাচ্ছি। কিছুকাল আগে সুভাষ যখন তাঁর কবিতায়, যারা কুঁজো হ'য়ে ফুলের মূর্চ্ছা ছাথে তাদের পিঠে হাতুড়ি পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, তখন সে-প্রস্তাবের মধ্যে সাহিত্যিক সততা ততোটা ছিলো না—যতোটা ছিলো যুগসঞ্চিত সংস্কারের মোহ ভাঙবার উত্তেজনা। কিন্তু সেদিন যে ফাঁকি নতুন জাগরণের জৌলুষে ঢাকা পড়েছিলো, আজ সুভাষের অনুগামীদের সেদিকে আরো বেশি অবহিত হবার সময় হ'য়েছে বোধ হয়। আমরা সত্যিই অত্যন্ত হতাশ হই, যখন দেখি এঁদের কেউ জীবনের বহু সাধনাসাপেক্ষ ঈপ্সিত আদর্শের বিরুদ্ধে শাসনের উদ্ধত আঙুল তুলে বল্‌ছেন, 'ধ্বংস হোক তোমাদের প্রেমের জগত' (কালপুরুষ), কেউ বা জীবনের পূর্ণতাকে এড়িয়ে চল্‌তে চাইছেন সাময়িক অস্থির অসম্পূর্ণতার জন্যে:

পিছনে হারায়ে গেল অন্ধকারে মালতী আমার...
আপনার চতুর্দ্দিকে অন্ধতার গড়ি চক্রব্যূহ
তিলে তিলে হ'ল ক্ষয় মালতী সে ব্যথারিষ্ট মনা। (সূর্য্যপ্রণাম)

আমি শুধু অবাক হ'য়ে ভাবি: এঁরা কী চান্? কী এঁদের কাম্য? মানি, এই বিপর্য্যয়ের দিনে দারুণ দুর্গমে পথের নেশা অনেক সময় আমাদের পথের উদ্দেশ্যকে ভুলিয়ে ছায়; তাই মালতীর (জীবনের) স্বরূপকে যেখানে 'সূর্য্য প্রণাম'এর কবি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি সেখানে সততার অভাব নেই ব'লে তাঁকে তবু মেনে নেয়া যায়, কিন্তু যে-কোনো সময়েই জীবনের সহজ সুস্থতা ও পূর্ণতাকে হেয় করবার মতো martial spirit আমাদের অতি-মাত্রায় সহ্যের সীমাও ছাড়িয়ে যায়।

অবশ্য অবন্তী সান্যাল কোথাও কোথাও এই সমগ্রতাকে রূপ দিয়েছেন, তার প্রমাণ পাই তাঁর এই বইটিরই 'কাস্তে' কবিতাটিতে। কবিতাটি রচনা হিসেবে খুব সার্থক না হ'লেও এতে জীবনের সার্থকতার একটি সুস্পষ্ট প্রতিফলন মেলে। এখানে মরণের মুখোমুখী লেখক দেখেছেন পূর্ণাঙ্গ জীবনকে, যুদ্ধক্ষেত্রে রাইফেলের শব্দে নয়, মাঠভরা ফসলের মাঝখানে কাস্তের গানে, জীবনের (মালতীর) মুগ্ধ সান্নিধ্যে। সত্যিই জীবনযুদ্ধে শত্রুকে যে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে প্রতিরোধ ছায় আর যে সেই সময়ে মাঠে-মাঠে ফসল ফলানোর ভার নেয়—জীবনের প্রতি তাদের উভয়ের দায়িত্বই কি সমান নয়, তাদের উভয়ের ভালোবাসা কি সমান-ই সূচিত হয় না জীবনের প্রতি? জানি না, 'সূর্য্য প্রণাম'-এর কবি এই সহজ সত্যকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করেছেন কী না, খুব সম্ভব তিনি তা করেন নি। তবু তাঁর কাব্যচেষ্টায় আশা হয়—হয়তো তিনি এই যুদ্ধের দিনের emergencyর তাড়াহুড়োয় চোখ-রাঙানো, রক্ত-জল-করা যুদ্ধের কবিতা লিখেই ভালো

কবিতা লেখার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না, যে-রকম অন্যায় চেষ্টা করেছেন রমাপতি বসু তাঁর 'কালপুরুষ' বইটিতে।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

কবিকিশোর, হেমচন্দ্র বাগচী। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।

এই ছোটো বইটি লেখকের বাল্যস্মৃতি। যে-বিষণ্ণ কোমলতা হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতার প্রধান গুণ, তাঁর এই গদ্য বইটিতেও সে-গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করলুম। বইটি হয়তো বালক-বালিকাদের লক্ষ্য ক'রে লেখা—মনে পড়ে এটি 'রামধনু'তে প্রথম বেরিয়েছিলো—কিন্তু আধুনিক রোমাঞ্চ-সিরিজ-ভোজী কিশোরদের 'কবিকিশোর' ভালো লাগবে কিনা জানিনে, তবে কল্পনাপ্রবণ কবিপ্রকৃতির শিশু এখনো যদি দেশে থেকে থাকে তারা এ থেকে নিশ্চিত আনন্দ পাবে। অবশ্য 'কবিকিশোর' মুখ্যতই শিশুপাঠ্য নয়, একজন কবির বাল্যজীবনের কাহিনী হিসেবে সাহিত্যপ্রিয় প্রত্যেক ব্যক্তিরই সমাদরণীয়। বইটি সম্বন্ধে আপত্তি শুধু এই যে আকারে বড়োই ছোটো, লেখক তাঁর ছেলেবেলার কয়েকটি বিক্ষিপ্ত স্মৃতি মাত্র উদ্ধৃত করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে তিনি যদি একটি পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক আখ্যায়িকা রূপে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেন তাহলে ভালো হয়।

বু. ব.

রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

(জন্ম ৪ঠা নভেম্বর ১৮৮৩; মৃত্যু ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৩)

অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে শুধু যে একটি বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল অথবা একজন নৈষ্ঠিক শিক্ষাব্রতীর দেহান্ত ঘট্‌ল তা নয়; এমন একটি আদর্শপ্রাণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির যুগান্ত হ'ল যার প্রথম স্পন্দন স্ফুরিত হয়েছিল স্বদেশী আমলের আরম্ভে। তাঁর সঙ্গে যাঁরা নিকট সংস্রবে এসেছিলেন, সেই ছাত্র এবং সহকর্মী অধ্যাপকের দল তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে, তাঁর বিনয়াবনত সৌম্য-চরিত্রে আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি। অনেকের মনে আজ তাই আক্ষেপ যে এমন একটি মানুষ—যিনি বাঙলা দেশের সেরা মনীষীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং একটা বড় আদর্শকে অনুসরণ করে' লোকচক্ষুর-আড়ালে লেখাপড়া নিয়ে জীবন কাটিয়ে গেলেন—তিনি এমন কিছু বাস্তব চিহ্ন রেখে গেলেন না যা তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির, গাম্ভীর্য্যে সুন্দর মননশীলতার সম্যক্ পরিচয় দিতে পারে। আজ থেকে হয়ত দু চার বছর পরে কলেজের ছাত্রবৃন্দের কাছে তিনি একজন 'স্কলার' ও 'প্রিন্সিপ্যাল' হিসেবে মাত্র একটি শ্রদ্ধেয় নামবস্তুতে পরিণত হবেন। আর যাঁরা

তাঁকে কাছ থেকে দেখেছিলেন ও চিনেছিলেন, তাঁরা হয়ত মাঝে মাঝে তাঁকে স্মরণ করবেন-"কি চমৎকার মানুষ ছিলেন! এতো বিরাট্ পড়াশুনা ছিল, কিন্তু কিছুই বোঝা যেত না!" কিন্তু এই চমৎকারিত্বের পিছনে যে চারিত্র্য-গুণ, যে ঋজু মন, যে স্থৈর্য্য, যে প্রকাশবিমুখ সঙ্কোচ অথচ আত্মসমাহিত দৃঢ়তা ছিল, কিছুদিন পরে হয়ত সে সব গুণের কথা মাত্র অলস-কৌতূহল-কাহিনীতে দাঁড়াবে। তাই তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর সম্বন্ধে কিছু তথ্য আগ্রহশীল পাঠকের সম্মুখে ধরতে পারা সৌভাগ্যই মনে করি।

ছাত্রজীবন থেকেই রবিবাবু আপন মেধাবিত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছেন, পরীক্ষায় কৃতিত্ব তারই অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। তাঁর স্থিরবুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি গুণী অধ্যাপক ও সহপাঠীদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে পার্সিভ্যাল সাহেবের তিনি একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শোনা যায় বি-এ পরীক্ষার্থী রবিবাবু কলেজ টেস্ট-এ ইংরেজি সাহিত্যের পেপারে মাত্র চারটি প্রশ্নের উত্তর লিখে চৌষট্টির মধ্যে উনষাট নম্বর পান। আর বাকি দুটি প্রশ্ন না লেখার জন্যে পার্সিভ্যাল সাহেব সস্নেহ অনুযোগ করে বলেন যে পুরো উত্তর না লেখার জন্যেই তিনি তাঁকে ফার্ষ্ট ক্লাস থেকে এক নম্বর কম দিয়েছেন। অবসর গ্রহণের অনেক দিন পরে বিলেত থেকে যখন তিনি অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে চিঠি লেখেন তখন তিনি বহুকাল আগে-দেখা তাঁর কৃতী ছাত্র রবীন্দ্রনারায়ণের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন যে তিনি আজও তাঁর 'strange insight into English literature'এর কথা ভোলেন নি। বি-এ পরীক্ষায় ১৯০৪ সালে তিনি ডবল অনার্স নিয়ে আপনার কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। দর্শন-শাস্ত্রে তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান এবং ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি দর্শনেই ঈশান স্কলারশিপ পেয়েছিলেন, এ খবরটি কেউ কেউ জানেন না।

কলেজে পড়তে পড়তেই তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সংস্রবে আসেন এবং য়ুরোপীয় দর্শন ও সাহিত্যের অনুরাগী ছাত্র হয়েও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আসক্ত হন। এ সময়টা রবিবাবু এমন একজন আদর্শনিষ্ঠ পণ্ডিত-কর্মীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আসেন যাঁর প্রভাবে তিনি স্বদেশী কর্ম্ম-সূত্রে আবদ্ধ এবং ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির রক্ষণে উদ্যমী হন। তাঁর নাম শ্রদ্ধেয় সতীশ মুখোপাধ্যায়, Dawn Societyর প্রতিষ্ঠাতা এবং Dawn পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এ কাগজখানি অনেকদিন উঠে গিয়েছে কিন্তু এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে যে সব কৃতী ও সুশিক্ষিত ছাত্র ও লেখক একত্র হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ডাঃ বিনয়কুমার সরকার, অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার, ও ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের নাম অনেকেই জানেন। সতীশবাবুর প্রতিষ্ঠিত সংঘকে

এঁরা মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁর জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক সময়ে একটি ছাত্রাবাসে (শিবনারায়ণ দাসের গলিতে) একত্র বাস করতেন। ১৯০৫ সালে রবিবাবু স্থির করলেন যে ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে অসহযোগ করবেন এবং সে বৎসর এম-এ পরীক্ষা দেবেন না। কিন্তু স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আদেশে ও সতীশবাবুর অনুমতি উপেক্ষা করতে না পেরে মাত্র দু'তিন মাস আগে তিনি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। এবং অনায়াসেই ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ঐ বৎসর অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় ও ৺অধ্যক্ষ নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে সুরু হ'ল তাঁর সত্যিকারের ছাত্রজীবন এবং সে জ্ঞানচর্চ্চা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইদানীং বছর খানেক তাঁর দৃষ্টি নষ্ট হয়েছিল; নইলে বই ও রবিবাবু অবিচ্ছেদ্য সহচর। এতদিন তিনি সাহিত্য ও দর্শন নিয়ে কাটিয়েছিলেন; এইবার তিনি ভারতীয় ইতিহাসের দিকে আকৃষ্ট হন। এর মূলে দুটি প্রভাব ছিল। একটি হ'ল সতীশবাবুর প্রতিষ্ঠিত 'Dawn' পত্রিকার পয়লা নম্বরের আদর্শ—"Increasing knowledge of India and Indian civilisation আর supporting Indian educational and allied movements which aim primarily at fostering the unselfish instincts and developing the constructive faculties of the Indian mind." আর একটি হল National council of Education-এর সঙ্গে রবিবাবুর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। এম-এ পাশ করেই তিনি এই জাতীয় শিক্ষায়তনে যোগদান করেন এবং ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত এখানে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপনা করেন। একবার তিনি বলেছিলেন "I began my career as a teacher of history." ইতিহাসের অনুরক্ত ছাত্র হয়ে কেন যে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম্-এ দেন ও ঐ বিষয় নিয়ে আজীবন অধ্যাপনা করেন, এ প্রশ্ন করাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—ওটা একটা accident। তাঁর অনেক গুণী ছাত্র নিশ্চয়ই মনে রাখবেন তাঁর ইংরেজি সাহিত্যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, ইংরেজি কাব্যের উদার আবৃত্তি ও স্বল্পভাষী অথচ সূক্ষ্ম টিপ্পনী। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে মধ্যযুগের ও বর্ত্তমান য়ুরোপের ইতিহাস ও সমাজ-পদ্ধতি এবং প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি—এই দুটি বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য কত গভীর ছিল। যাঁরা ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার Dawn Magazine দেখেছেন ও পড়েছেন, তাঁরাই শুধু জানেন রবিবাবু ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ নিয়ে কি উচ্চাঙ্গের মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

সে প্রবন্ধগুলির মূলসূত্র এক:—ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের যথার্থ, সশ্রদ্ধ অনুশীলন এবং জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ।

'Indian Nationalism and History of India', 'City in Relation to the Village, The Indian Scheme of National Life' নামক প্রবন্ধগুলিতে তিনি অনেক পুরোনো মালমশলা সংগ্রহ করে ভারতীয় সভ্যতার লৌকিক রূপটি উদ্ধার করেন। ১৯১২ সালের Dawn পত্রিকা থেকে জানা যায়, রবিবাবু এই সময়ে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র হয়ে পড়েন এবং সেই প্রসঙ্গে শিল্পশাস্ত্রের উপর রচিত মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থ এবং বিদেশী পণ্ডিতদের প্রামাণ্য বইগুলি সযত্নে অধ্যয়ন করেন। দক্ষিণ ভারতীয় গ্রন্থ এবং উত্তর ভারতীয় পুঁথিগুলি ছাড়া Oertel, Waddell Havell ও Coomaraswamy-প্রণীত রচনাগুলি পড়ে তিনি শিল্পশাস্ত্রের উপর তিব্বতী পুঁথির সন্ধানে Foucher-কৃত মূল ফরাসী এবং Dr. Grünwedel-রচিত মূল জার্মান গ্রন্থ পড়তে সুরু করেন। শিল্পশাস্ত্র নিয়ে গবেষণার ফলে তাঁর একটি বড় প্রবন্ধ লেখা হয়—'Interpretation of Indian Art in the light of Indian literary records; a new branch of study"। এ প্রবন্ধটি পড়ে Havell সাহেব বিলেত থেকে তাঁর প্রশংসা করে চিঠি লেখেন। এ ছাড়া কুমার স্বামী-রচিত 'On Indian Art in China' প্রবন্ধটি যখন Dawn পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'ত, সে প্রবন্ধের ব্যাখ্যা করে টিপ্পনী লিখতেন রবিবাবু ও হারানচন্দ্র চাক্লাদার। এবং সে-সব টীকা পাণ্ডিত্যে ও পরিশ্রমের ফলে সমৃদ্ধ। এই সূত্রে আর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯১৩ সালে দিনাজপুর সাহিত্য-সম্মেলনে রবিবাবু "সমাজে শিল্প ও সাহিত্যের স্থান"-নামে একটি রচনা পাঠ করেন। সমাজের বিবর্ত্তনের সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের বিকাশ কেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সে কথা বাঙলা ভাষায় এই সর্ব্বপ্রথম বলা হয়। সে দিক থেকে এ প্রবন্ধটি বিশেষভাবে গুরুত্ব ও অর্থপূর্ণ এবং এই কারণেই তা বাঙলা দেশের মনস্বীদের কাছে সমাদর পেয়েছিল।

বাঙলায় যে ক'টি রচনা এ যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে, সবগুলিতেই রবিবাবুর অধীত চিন্তা ও দর্শনের সমাবেশ, প্রাঞ্জলতায় ও প্রসঙ্গগুণে তাদের উজ্জলতা। 'প্রাচ্যের পরিচয়', 'আদর্শ বনাম বাস্তব' আর 'বঙ্গ সাহিত্য ও ভারত সাহিত্য' প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্রার পৃষ্ঠায় এবং প্রতিটি প্রবন্ধ মনন-শীলতার জন্যে পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'পরিচয়ে' রবিবাবুর মাত্র একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—'প্রাচীন ও আধুনিক'। এ ছাড়া হীরেন্ মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আয়ুবের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত আধুনিক বাঙলা কবিতার সঙ্কলনটি তিনি সমালোচনা করেছিলেন পরিচয়ের পৃষ্ঠায়। এটি পুস্তক-সমালোচনা জাতীয় হলেও, এতে তিনি আধুনিক বাঙলা কাব্যের গতিশীল রূপটিকে যথাযথ বিশ্লেষণ করে সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। যে সময়ে অনেক সাহিত্যিক ও বিচারক আধুনিক কাব্যকে

নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ও বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, সে সময়ে তাঁর কলম থেকে এ রকম উদার মনোভাবের ও বিচারের পরিচয় যথার্থ ই মূল্যবান্।

রবিবাবুর আরো কিছু স্বনামী ও বেনামী লেখা ছড়িয়ে আছে যেগুলি প্রকাশিত প্রবন্ধের সঙ্গে একত্র করে বই আকারে ছাপানো নিতান্ত দরকার। বাঙলার শ্রদ্ধাশীল আগ্রহবান পাঠকবর্গের কাছে এটি অবশ্য-কর্ত্তব্য দায়িত্ব-পালন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ওপরেও তাঁর একটি লেখা আছে—The Eternal Wayfarer। এটি প্রথমে India Tomorrow-তে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে Ripon College Magazine-এ পুনর্মুদ্রিত হয়। এ ছাড়া দার্জ্জিলিং-এ তিনি একটি চমৎকার অভিভাষণ দিয়ে-ছিলেন,—Life and Letters in Medieval Bengal। Guizot-প্রণীত য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস তিনি যে তর্জ্জমা করেছিলেন এবং সে সার্থক অনুবাদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু আরেকটি খবর হয়ত সবাই জানেন না যে ৺আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যখন রোগশয্যায়, তখন তিনি 'বৈদিক যজ্ঞ'-রচনায় ব্যাপৃত। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি মুখে মুখে অনেক কথা বলে যেতেন আর রবিবাবুই সেগুলি সাজিয়ে ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

রবিবাবুর কর্ম্মজীবন বৈচিত্র্যহীন, যেহেতু তিনি অধ্যাপক ছিলেন। তবু তারি একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ১৯১২ সালে তিনি National Collegeএর কাজ ছেড়ে দিয়ে রিপন কলেজে যোগদান করেন। এখানে কিছুদিন কাজ করবার পর অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের তৎপরতায় তিনি সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন। সেখানে বছর দুই থেকে তিনি কৃষ্ণনগরে বদ্লি হন। ১৯১৭ সালে পূজার পূর্ব্বেই তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরোধে রিপন কলেজে ফিরে আসেন। ৺জানকী নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন কলেজের অধ্যক্ষ তখন রবিবাবু ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল হন্ এবং জানকীবাবুর মৃত্যুর পর কিছুদিন অস্থায়ী অধ্যক্ষের কাজ করেন। তারপর অধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুতে তিনি কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষ হন এবং গত বারো বছর ঐ পদেই ছিলেন। তাঁর অধ্যক্ষতার সময়ে রিপন কলেজ কলকাতার বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অগ্রণীস্বরূপ গণ্য হয় এবং তাঁরি কার্য্যকারিতায় বাঙলা সাহিত্যের কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও লেখক রিপন কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন।

ব্যক্তিগত জীবনে রবিবাবু অত্যন্ত সাদাসিধে, ঢিলেঢালা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি স্বভাবতই স্বল্পবাক্, সংযত ও গম্ভীর ছিলেন। তিনি ছিলেন বহুকাল বিপত্নীক, তারপর ইদানীং তাঁর একমাত্র পুত্রবিয়োগের পর থেকে তিনি যেন আরো উদাসীন এবং অন্যমনস্ক

হয়ে পড়েন। তবে জীবনে হু'একটি নেশা তাঁর প্রবল ছিল যথা,—তাম্বুলচর্বণ, ফুটবল এবং গানবাজনা। আজ থেকে বিশ বছর আগে রবিবাবুকে ভালো গানবাজনার আসরে প্রায়ই দেখা যেত। ফুটবল খেলা কবে যে তিনি দেখেন নি, তা জানা নেই। কারণ বৃষ্টি বাদলা উপেক্ষা করে খেলার মাঠে উপস্থিতিটা তাঁর কাছে নিত্যকর্ম্ম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে ভালো ম্যাচের দিন তিনি যে রকম বালক-সুলভ উদ্যম ও কৌতূহল নিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতেন সে এক কৌতুকের ব্যাপার।

মৃত্যুকালে রবিবাবুর বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর ১ মাস। সারাজীবন তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেই কাটালেন কিন্তু নিজের পাণ্ডিত্যের তুলনায় এমন কিছু লিখে যাননি যা থেকে পরবর্ত্তী বিদগ্ধ সমাজ তাঁর মনীষার যথার্থ পরিচয় পেতে পারে। তবে তাঁর এই ইতস্তত ছড়ানো রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

রবিবাবুর চরিত্রে হুটি বিপরীত গুণের সমাবেশ লক্ষ্য করবার বিষয়। একদিকে ছিল তাঁর স্বাভাবিক আলস্য, অপরদিকে শিক্ষাদীক্ষায় প্রগাঢ় অনুরাগ ও উদ্যম; একদিক দিয়ে তিনি গুণগ্রাহী ও সামাজিক, আবার আর একদিকে তিনি বীতস্পৃহ ও উদাসীন। সংসারে বাস ক'রে, বিশেষ ক'রে একটি বড় কোলাহলমুখর শিক্ষামন্দিরের অধ্যক্ষপদে সমাসীন হয়ে, এতখানি নিরাসক্তি সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। জীবনের প্রতিটি অবস্থায় অচল স্থৈর্য্য, প্রতিটি আচরণে সুকুমার ভদ্রতা বোধ করি শত্রুকেও পরাস্ত করে। বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি ছিলেন নিরীহ, সঙ্কুচিত এবং প্রচ্ছন্নধর্ম্মী। কিন্তু এই কূর্ম্মনীতির অনুসরণকারী হলেও তাঁর একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিল যার বলে সময়োচিত দৃঢ়তা অবলম্বন করতে তিনি পশ্চাৎপদ হননি। তাঁর কর্ম্মজীবনে তিনি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর, আচার্য্য জানকীনাথ, শ্রদ্ধেয় স্যর গুরুদাস, স্যর সুরেন্দ্রনাথ ও স্যর আশুতোষের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং প্রত্যেকের কাছেই নিজস্ব চারিত্র্যে ও জ্ঞানবত্তায় সমাদৃত হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তিনি কোনোদিন প্রার্থী না হয়েও নানাবিধ সম্মান পেয়েছিলেন এবং সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে Nature's gentleman আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। এর কারণ আর কিছুই নয়—রবিবাবুর অনায়াসলব্ধ ব্যক্তিত্ব, স্বোপার্জ্জিত বৈদগ্ধ্য, তাঁর দার্শনিকতার আড়ম্বরহীন প্রকাশ। তিনি সত্যিই ছিলেন নিরাসক্ত আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষকের যে শুধু নিষ্কাম আদর্শবাদেই চলে না, তা তিনি বুঝতেন। তাই বোধ হয় শিক্ষকের আদর্শের চেয়ে তিনি শিক্ষার আদর্শকেই বড়ো বলে মেনেছিলেন এবং তাকে আপনার জীবনে ও জ্ঞানচর্চ্চায় সুন্দর রূপ দিতে পেরেছিলেন।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজি জর্নালিস্ট কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ দাঁড়িয়েছে সাংবাদিক। কথাটায় কাজ চলে, কিন্তু তাতে যেন জর্নালিস্ট-এর পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করা হয় না, একটা সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তাকে বেঁধে দেয়া হয়। সাংবাদিক বলতে শুধু যেন খবর সরবরাহকারীকেই বোঝায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার অনেক বেশি; জর্নালিজ্‌ম্ কথাটা এতই বড়ো যে রয়টারের তার থেকে শুরু করে চেস্টর্টনের প্রবন্ধ কি লো-র কার্টুন সবই তার মধ্যে ধরা পড়ে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বেশির ভাগ পত্রিকা এই মর্মেই মন্তব্য করেছেন যে বাংলাদেশ তার বিশিষ্টতম সাংবাদিককে হারালো। কিন্তু শুধু সাংবাদিক বললে তাঁর সম্বন্ধে পুরো কথাটি বলা হয় না। উনিশ শতকের যে ব্রাহ্ম সংস্কৃতি বাঙালি জীবনকে নানা দিক থেকে উদ্বোধিত করেছে তিনি ছিলেন তার শেষ প্রতিভূ। এই ছাঁচের মানুষ আজকাল আর হচ্ছে না, বোধ হয় আজকাল এর আর প্রয়োজন নেই। নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় গিয়ে যে-সব পিউরিটান পিতারা বসবাস শুরু করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের সেকালের ব্রাহ্মদের কিছু আদল আসে। আমেরিকার মতো বাংলাদেশেও তখন কর্মের নানা ক্ষেত্রে অকর্ষিত ভূমি প'ড়ে আছে। উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত অনলস স্থিতধী কর্মীর স্বর্ণ-যুগ গেছে তখন। অনেক কিছুই কারো-না-কারো হাতে প্রথম জন্ম নেবার প্রত্যাশা করছে। রামানন্দবাবুর হাতে বাংলা মাসিকপত্র ভূমিষ্ঠ হ'লো। তার আগে অবশ্য 'বঙ্গদর্শন' 'সাধনা' হয়ে গেছে, কিন্তু ঐ পত্রিকা হুটি বঙ্কিম-রবীন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সোপানরূপেই উল্লেখযোগ্য; আধুনিক যুগে আমরা মাসিকপত্র বলতে যা বুঝি তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ মূর্তি 'প্রবাসী'ই নিয়ে এলো। নানারকমের রচনা ও ছবি, সংবাদ ও মন্তব্য নিয়ে একটি সুসম্পাদিত সুমুদ্রিত পত্রিকা প্রতি মাসের ঠিক পয়লা তারিখে নির্ভুলভাবে পাঠকদের হাতে পৌঁছচ্ছে, তৎকালীন বাংলাদেশে এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা, এ-বিস্ময়ের রেশ রবীন্দ্রনাথেরও কোনো-কোনো লেখায় আমরা পাই। পরবর্তীকালে যে-ক'টি মাসিকপত্র আত্মপ্রকাশ করেছে ও স্থায়ী হয়েছে, তার প্রত্যেকটি 'প্রবাসী'র আদর্শেই গড়া, আজকের দিনেও কোনো নতুন মাসিকপত্র ঐ সর্ববহ ভাবটিই বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করে—বিশেষ-বিশেষ বিষয়ে সীমাবদ্ধ পত্রিকা বাংলাদেশে অত্যন্তই নতুন। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে 'প্রবাসী' নিঃসংশয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে পাঠযোগ্য পত্রিকা ছিলো; স্বর্গত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সহকারী সম্পাদক সেইটেই বোধহয় 'প্রবাসী'র সবচেয়ে গৌরবের যুগ গেছে। একটা সময়ে এমন হয়েছিলো যে 'প্রবাসী' না-প'ড়ে কোনো শিক্ষিত লোকের চলতেই পারতো না।

'প্রবাসী'র ছুটি প্রধান আকর্ষণ ছিলো প্রতি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের নতুন লেখা ও সম্পাদকের 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে রামানন্দবাবুর নির্ভীক, যুক্তিনির্ভর, মিতভাষী মন্তব্য তাঁকে দেশের লোকের প্রিয় ও শাসকমণ্ডলীর বক্রদৃষ্টির বিষয়ীভূত করেছিলো, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোনো ব্রিটিশ রাজনীতির পরিভাষায় বলা যায় লিবরল ও পুরোনো দিশি রাজনীতির পরিভাষায় এক্সট্রিমিস্ট। সরকারপ্রণয়-কামীদের সমালোচনার স্থযোগ তিনি কখনো ছাড়েননি, এবং ভারতের মুক্তিসাধনার সমর্থনে তিনি ছিলেন সিদ্ধলিপি। শিক্ষার প্রচার, জাতিভেদ নিরাকরণ, স্ত্রী-স্বাধীনতাবিস্তার প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে তাঁর উদার মানবিক দৃষ্টি সর্বদা জাগ্রত ছিলো। মোটের উপর বলা যেতে পারে, একটা সময়ে বাংলাদেশে প্রগতিশীল মনোভাব গঠনে 'প্রবাসী'র ভিতর দিয়ে রামানন্দবাবুর দান ছিলো অনেকখানি।

অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথের অকৃপণ সহযোগিতার ফলেই 'প্রবাসী'র অসামান্ত প্রতিপত্তি সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু এখানে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ভক্তদের মধ্যে রামানন্দবাবু অন্যতম। যে-সময়ে রবীন্দ্রনাথের নাম বিদেশে পৌছয়নি, এবং স্বদেশে অনাদৃত ছিলো, সেই সময় থেকেই যে রামানন্দবাবু তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে আপন পত্রিকার উন্মুক্ত আতিথেয়তা তাঁর জন্য অবারিত ক'রে রেখেছিলেন, এটা রামানন্দবাবুরই গৌরব। বাংলাদেশের এতগুলি পত্রিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি লেখা যে 'প্রবাসী'তেই প্রকাশিত হ'তে পেরেছে তার কারণ রামানন্দবাবুই। তাঁকে লেখা কবির যে-সব চিঠি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে কবি তাঁকে বিশেষ একটু সম্ভ্রমের চোখেই দেখতেন, এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধুতার সম্মান এই চিরানুরক্ত সম্পাদককে কবি দিয়ে গেছেন।

শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, মণীন্দ্রলাল বসু, রাজশেখর বসু ইত্যাদি পরবর্তী অনেক লেখকই 'প্রবাসী'তে অবাধ আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। মনে পড়ে তার একই সংখ্যায় সত্যেন্দ্র দত্তের পাঁচটি-ছ'টি ক'রে কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় চিত্রকলার —বিশেষত আজকাল যাকে বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট বলা হয়—'প্রবাসী' ছিলো প্রধান পরিপোষক। লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের এবং চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে যামিনী রায়ের অনুপস্থিতি 'প্রবাসী'র এই উদারনীতির ছুটো বড়োরকমের ব্যাতিক্রম। সম্প্রতি যে-সব লেখক খ্যাতনামা হয়েছেন, তাঁদেরও প্রথম জীবনের কিছু লেখা 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিলো, তবে তাঁদের কারো সঙ্গেই তার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হ'তে পারেনি।

মোটের উপর, বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে 'প্রবাসী'কে একটি বিশিষ্ট

স্থান নিঃসংশয়েই দিতে হয়, এবং রামানন্দবাবুই এই বৈশিষ্ট্যের স্রষ্টা। লেখক বলতে যা বোঝায় তিনি তা ছিলেন না; মহৎ সম্পাদক হওয়ার প্রায় সবগুলি গুণই তাঁর ছিলো। তাঁর বিবিধ প্রসঙ্গের রচনানীতি ছিলো নির্ভুলভাবে তাঁর নিজস্ব, শুধু যুক্তি ও তথ্য, অথচ স্থখপাঠ্য, তার অনুকরণের চেষ্টা অনেকে করেছেন, কেউ সফল হননি। বিতর্কে তাঁর বিশেষ দক্ষতা পরিচ্ছন্ন শালীনতার পথে পরিচালিত হ'তো—শুধু যদি হাস্যরসের আরো একটু সংস্পর্শ থাকতো, তাহ'লে কোনো-কোনো বিষয়ে তাঁর আলোচনা অন্যদিক থেকেও স্মরণীয় হ'তে পারতো।

শুধু সম্পাদক হিশেবেই নয়, পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ পরিচালক হিশেবেও রামানন্দবাবুর অসামান্য কৃতিত্ব। স্বল্প সম্বল নিয়ে যে-মাসিকপত্র তিনি শুরু করেছিলেন, সেট যে অনতিকালের মধ্যেই বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হ'তে পেরেছিলো, তার পিছনে সম্পূর্ণভাবে তাঁরই কর্মকুশলতাকে স্বীকার করতে হয়। বাংলা মাসিকপত্র পরিচালনাও যে একটি অর্থকরী ব্যবসা হ'তে পারে, সত্যি বলতে এ-ধারণা 'প্রবাসী'র আগে এ-দেশে ছিলো না। ব্যবসা কথাটা এখানে অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। ব্যবসাও মানুষের যোগ্যতাপ্রকাশের একটা ক্ষেত্র, এবং বেশ বড়ো ক্ষেত্র। মাসিকপত্র পরিচালনায় সে-দিকটা বিশেষভাবেই অনুশীলনযোগ্য, কেননা সেদিকে শৈথিল্য ঘটলে কোনো সদিচ্ছাই পত্রিকাকে বেশিদিন বাঁচাতে পারে না। বহুবিত্তশালী পরি-চালকের হাতেও এক-একটি পত্রিকাকে সন্ধ্যা-সোনার মতো অচিরে বিলীন হ'য়ে যেতে তো আমরা দেখেছি। এদিকে রামানন্দবাবুর কর্মসূচীর সম্প্রসারণও বিস্ময়কর। তাঁর 'মডর্ন রিভিয়ু' সর্বভারতে এবং ভারতের বাইরেও সশ্রদ্ধ সমাদর লাভ করেছে, হিন্দি 'বিশাল ভারতে'রও তিনিই উদ্যোক্তা। এ-যুগে একই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনটি-চারটি পত্রিকার প্রযোজনা আমরা দেখছি,—বিরাট ধনশক্তির লীলা—কিন্তু অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে দেশে মার্কিনি ব্যবসা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলো; 'প্রবাসী', 'মডর্ন রিভিয়ু' গড়ে উঠেছে ধীরে-ধীরে, স্বাভাবিক দ্যোতনায়, সম্পাদকের ব্যক্তিত্বশক্তির প্রেরণায়। এই গ'ড়ে তোলবার কাজটা যখন শুধুই ধনবলে যান্ত্রিকভাবে সম্পাদিত হয়, তখন সেটার মধ্যে রমণীয়তা কিছুই থাকে না, কিন্তু যখন সেটা একজন ব্যক্তির ক্ষমতা ও চারিত্র্য থেকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে স্বতই সুসম্পূর্ণ হ'য়ে উঠতে থাকে, তখনই তার সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। এ-পর্যন্ত যে-ক'জন বাঙালি কোনো হিতকর ক্ষেত্রে এই কর্মপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, রামানন্দবাবু তার মধ্যে অন্যতম। তাঁর মনস্বী কর্মীজীবন আমাদের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে আরো চারটি পুস্তিকা সংযোজিত হয়েছে। মায়াবাদ—শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মা; বিশ্বের উপাদান—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য; হিন্দু রসায়নী বিদ্যা—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়; নক্ষত্র পরিচয়—প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। প্রথম বইটি ১৯০৮-এ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো, এতদিনে তার পুনর্মুদ্রণ হ'লো। তৃতীয় বইটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সুবিখ্যাত ইংরেজী গ্রন্থ থেকে শ্রীভবেশচন্দ্র রায় কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত। দর্শন-বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞের লেখা এমন সহজ সংক্ষিপ্ত সুলভ বই আমাদের ভাষায় বোধ হয় এই প্রথম। এ-সব বইয়ের তথ্য ও মতামত নিয়ে পণ্ডিতেরা তর্ক করতে পারেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে এ যে বিশেষভাবে উপযোগী তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের ইস্কুল কলেজের শিক্ষার সীমা বড়োই পরিমিত; মাতৃভাষায় এ ধরনের বই আরো বেশি প্রকাশিত হলে উদারতম শিক্ষার পথ আমাদের দেশে প্রশস্ত হ'তে পারবে।

অজয় ভট্টাচার্য

অজয় ভট্টাচার্যের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে বাংলার সাহিত্য ও সংগীত-জগৎ গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছে। গীতিরচয়িতা হিশেবেই তিনি খ্যাতিমান হয়েছিলেন, কিন্তু কবিতা কিংবা গল্পরচনাতেও তাঁর লেখনী বিমুখ ছিলো না। তাঁর গানগুলিতে একটি তরল লালিত্য ছিলো, যা জনসাধারণের মনকে সহজে আকর্ষণ করতো। আজকাল 'আধুনিক' গান বলতে যা বোঝায় তার কথার অংশ প্রধানত অজয়বাবুরই দান, অবশ্য তাতে সুরযোজনা করেছেন হিমাংশুকুমার দত্ত প্রমুখ সুরশিল্পীরা। সিনেমায়, রেডিয়োতে ও গ্রামোফোনের রেকর্ডে সম্প্রতি যে-সব গান বিশেষভাবে জনচিত্তজয়ী হয়েছে, তার খুব একটি বড়ো অংশের সঙ্গে অজয়বাবুর নাম জড়িত। শেষের দিকে সিনেমার সঙ্গে তাঁর সংস্রব ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলো, চিত্রপরিচালনার কার্যে তিনি লিপ্ত হয়েছিলেন। বন্ধুমহলে সুরসিক ও সহৃদয় ব'লে তাঁর খ্যাতি ছিলো।

মৃত্যুকালে অজয়বাবুর বয়স হয়েছিলো মাত্র ৩৯। জীবনের মধ্যভাগে শক্তির ও উদ্যমের পূর্ণতার এই অকাল অবসান—এর চেয়ে শোচনীয় আর কিছুই হ'তে পারে না। 'পূর্বাশা' ও 'নিরুক্ত' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য অজয়বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর, ও অজয়বাবুর সহধর্মিণীর, শোকের অংশ আমরা গ্রহণ করছি।

কবিতা

নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা   চৈত্র ১৩৫০   ক্রমিক সংখ্যা ৪১

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ও বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত)

৩০

Titbhumi
Shillong, Assam.

তোমার চিঠি পড়ে বিস্মিত হলুম। তোমার উপরেও পুলিসের হস্তক্ষেপ হল? আমার গোরার গল্প মনে পড়চে। তোমাকে রাস্তা দিয়ে ওরা যে অপমান করে থানায় নিয়ে গেছে সেই অপমানের দৃশ্য আমি অনেকবার দেখেচি—সেই অপমান সকল মানুষেরই। এমনি ক'রে মানুষের ভিতরকার রিপু সমস্ত মানুষের পিঠেই দাগা দিয়ে দিচ্ছে। যতদিন এই রিপুর শাসন মানুষের মনে থাকবে, ততক্ষণ আমাদের সকলকেই এই অপমান বহন করতে হবে। তাহলে আমাদের কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য হচ্চে গোড়া ঘেঁষে ঐ রিপুটাকে আক্রমণ করতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা নানা আকারেই আপনাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ করে। ঘরে ঘরে তার প্রকাশ—সেই প্রকাশেরই ছোট ছোট ধারা সম্মিলিত হয়ে সমাজব্যাপারে রাষ্ট্রব্যাপারে আপিসে আদালতে নানা বড় আয়তনে বড় নাম নিয়ে মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করচে। মাষ্টার মশায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ, তিনি ক্লাসের মধ্যে এই রিপুটিকে বহন করে নিয়ে আসেন—বড় বড় ধর্ম্মোপদেশককে যদি চেন তবে চিনবে মানুষের প্রতি তাদের গভীর অবজ্ঞা—তাই ধর্ম্মের নামে মানুষের প্রতি অত্যাচার এমন সর্ব্বনেশে মূর্ত্তি ধারণ করে। সেই অবজ্ঞার অপমান তুমি যে প্রকাশ্যভাবে কিছু বহন করেচ ভালই হয়েচে—যে দুঃখ অনেকেই পায় তার অংশ না নিলে মানুষের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া হয় না।

তুমি এবার শিলঙে এলে খুসি হতুম। আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েচে। বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের জন্যে প্যারাগ্রাফ আকারে একটা লেখা শেষ করেচি। একটা নাটক গোচের একটা কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে। তুমি কি ছুটিটা কলকাতাতেই কাটাবে? যদি আমার কোনো লেখা তর্জ্জমা করে দাও সেটাকে সংস্কার করে বিশ্বভারতী পত্রিকার কাজে লাগানো যেতে পারবে। তুমি যে আমারই বই আমাকে উপহার দিয়েছ এ তোমার নূতন পদ্ধতি। সম্পূর্ণ নূতন নয়। এর আগে য়ুরোপ থেকে একজন নিজের হাতে আমার কবিতার এক চয়ন কপি করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩৩০।

৩১

শান্তিনিকেতন

তোমার এবারকার চিঠিখানি পড়ে বড় খুসি ও নিশ্চিন্ত হয়েচি। তোমাদের যে বয়স, জীবনের আনন্দ কলগান ত আমরা তোমাদের কণ্ঠ থেকেই শুনব—আমাদের কণ্ঠ কি আর তাজা আছে? সত্যি বলচি, যখন তুমি জীবনের উৎসাহরসে তোমার পেয়ালা ভরে নেবার জন্যে আমার কাছে আসতে চেয়েছিলে তখন আমার বড় ভাবনা হয়েছিল। কেননা উৎসের কাছে গিয়ে দেখি তার ধারা ভিতরের দিকেই চলে গেচে, বাইরের দিকে আর উচ্ছলে ওঠে না। সেই আমার অন্তর্হিত প্রবাহের শুষ্কতা তোমাকে হয়ত আরো ক্লিষ্ট করবে এই আমার ভয় ছিল। তুমি ঠিক জায়গাতেই গেছ—প্রকৃতি জীবনের ক্ষতস্থানে হাসপাতালের মত ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধাবাঁধির উৎপাত করে না; সে মন্ত্র পড়ে চুম্বন করে দেয়। তার আদরের অ্যান্টিসেপ্টিকে না আছে জ্বালা, না আছে কড়া গন্ধ। ২৩ কার্ত্তিক ১৩২৪।

৩২

শান্তিনিকেতন

প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটা সন্ধিস্থল আছে যখন তার মধ্যে আলো অন্ধকারের দ্বন্দ্ব বেধে যায়। আমি যখন তোমার বয়সে ছিলুম তখন সেই প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে ছিলুম। এই অবস্থায় নিজের সঙ্গে নিজের এবং নিজের সঙ্গে বাহিরের সামঞ্জস্য থাকে না। তখন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলোর বিকশিত হবার উদ্যম আছে অথচ তাদের

বিকাশ নেই—তখন বাইরের ক্ষেত্রের সঙ্গে অন্তরের আকাঙ্ক্ষার মিল ঘটে না—তখন ভিতরে বাইরে পদে পদে ঠোকাঠুকি চলে। আর একটা সন্ধিস্থল. হচ্চে আমি যে বয়সে আছি এইটে। এখন এতদিনকার সংসারটা আলগা হয়ে আমার কাছ থেকে পিছিয়ে পড়েচে অথচ সংসারের অতীত যে একটি আত্মার আশ্রয় আছে সেটাকেও সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরা যাচ্চে না। নিজের প্রকৃতির মধ্যে এই দ্বিধা বিচ্ছিন্নতার ব্যথা খুব অসহ্য করেই অনুভব করচি কিন্তু তাই বলে তার কাছে হার মানব কেন? পেরিয়ে যাবই। শক্তি আছে বলেই ব্যথা পাচ্চি—এবং শক্তি আছে বলেই সে ব্যথা অতিক্রম করেই যাব। তুমিও সেই কথা মনে রেখো। বিধাতা আমাদের মনের মধ্যে ধারালো যা কিছু অস্ত্র দিয়েছেন সে কেবল আমাদের জাল কাটাবার জন্যে—নিজেকে কেটেকুটে টুকরো-টুকরো করবার জন্যে নয়। তুমি তোমার শক্তির অস্ত্রকে উল্টো করে ধরেচ, তার তীক্ষ্ণ ধারটা কেবলি তোমার নিজেকে বিঁধচে। আপনাকে যতই তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে করতে থাকবে ততই সেই চিন্তার চাপে তোমার নিজের দিকের ভারটা বেড়ে গিয়ে তোমাকে ঝুঁকিয়ে ফেল্‌বে। ভুলে যাও নিজের কথা—অমনি দেখ্‌বে বাইরের সঙ্গে তোমার ভারসামঞ্জস্য স্থাপিত হবে। আশ্চর্য্য এই জগৎ, আশ্চর্য্য এই জীবন। সমস্ত প্রাণমন পুলকিত হয়ে ওঠে যখনি নিজের থেকে নিজের চেতনাকে সম্পূর্ণ বেগে বাইরে প্রসারিত করে দিই। সেই তোমার ক্ষুদ্র নিজেকে ভোলো, মুক্ত চৈতন্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত জগৎ তোমার কাছে আনন্দনিকেতনরূপে প্রকাশিত হোক্ এই আমি কামনা করি। ইতি ২৬ পৌষ।

৩৩

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

এবার আমাকে কাজের ভূতে পেয়েছে। এক ভূতে নয়, পাঁচ ভূতে। রাজা মহারাজার আগমন একটা বড়ো ব্যাপার—চক্রবাত্যা। সৌভাগ্য-ক্রমে ফল খারাপ হয়নি কিন্তু শরীর পড়েছে যেন কাৎ হয়ে। ধাক্কা সামলে ওঠার পূর্ব্বেই কলকাতার বেদরদী বেরসিক অনভিজ্ঞ আত্মাভি-মানীদের জন্যে তিন তিনটে নাটক চড়াতে হয়েছে রিহর্সলের কুমোরের চাকে—খ্যাতির জন্যে নয়, অর্থের জন্যে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের শেষে এই দুর্গতির অবসান হবে। তারপরে যখন হাঁফ ছাড়বার সময় আসবে তখন তোমার কবিতার সমালোচনা করব। বুদ্ধদেব ভালোই লিখেছে। তার পূর্ব্বেই আমার অভিমত বেরুলে খুশি হতুম। গোলেমালে মাথার ঠিক ছিল না। আগন্তুকদের ভিড় চলেচে—আমাকে জনতাতঙ্ক ব্যাধিতে পেয়ে বসেছে। ইতি ১০।১।৩৯।

৩৪

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

৭ই পৌষের পালা শেষ হোলো। সুরে সুরে আমার বকুনি চুকিয়ে দিয়েছি। এখন চলেছে দূরাগত জনতার জলপ্রপাত। ছুটির সুযোগে কৌতূহল মেটাতে আস্‌চে দলে দলে। আমি তাদের লক্ষ্যস্থল। এর মধ্যে আমার লেখাও চলেছে মাতৃভাষায় বিমাতৃভাষায় দায়ে পড়ে। মায়ার খেলার রিহার্সাল আরম্ভ হয়েছে তার পুরোনো জীর্ণ অংশগুলো মেরামত করতে হোলো—প্রায় কুড়িটা নতুন গান লিখেছি। পুরানো হাতের সঙ্গে নতুন হাতের বুনোনি মিলচে কিনা জানিনে। এলমহার্ষ্ট এসেছে—লাগচে ভালো—এমন বন্ধু দুর্লভ। ওর সঙ্গে দেশবিদেশে অনেক দিনরাত্রি কাটিয়েছি—মনে পড়লে মন কেমন করে—nostalgiaর বাংলা কী? একসঙ্গে ভ্রমণে বন্ধুত্বের সেতারে যেন স্থর বাঁধা হয়ে যায়। তোমার বই পেয়ে দুচার পাতা পড়বার সময় পেয়েছি—বুঝেছি রীতিমত ভালো বই হয়েছে। এলমহার্ষ্ট পড়তে নিয়েছে তার পড়া হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করচি। ২৮।১২।৩৮।

৩৫

অভিনয়ের পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে কিছুদিন কাটিয়ে আসব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু যাতায়াতের উপদ্রব এড়াবার জন্যে এই কদিন এখানে র'য়ে গেলুম। শরীরটা এখনো ক্লান্ত এবং মনটা অবসন্ন আছে, তাকে আর নাড়া দিতে ভালো লাগ্‌চে না। বাদলা কেটে গিয়ে আজ পরিষ্কার রোদ্দুর উঠেচে। তেতালার ঘরে আমি একলা। আমার সেই সব ছেলেবেলাকার নির্জ্জন মধ্যাহ্ন মনে পড়চে। আবার একবার আমার সেদিনকার নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে ফিরে গিয়ে কল্পলোকের রহস্যনিকেতনে তেমনি ক'রে পথ হারিয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। তখন পৃথিবীর কোনো দায়িত্ব আমার উপর ছিল না—শুধু কেবল কবিতা লিখেচি—সে সব কবিতা জগতের লোকের কাছে জাহির করবার কোনো গরজ মনের মধ্যে ছিল না। হায়রে, সে দিনের মধ্যে প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে গেচে—কেবলি জনতাবর্ত্তে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে হয়রান হলুম। তোমার সনেটগুলি বেশ ভাল লাগল। ইতি ২৩ শ্রাবণ ১৩৩০।

৩৬

তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড় খুসী হলুম—তোমার কবিতাগুলি পড়েও আনন্দলাভ করেচি। এগুলি কিছু কিছু কাগজে ছাপতে দাও না কেন? বিশেষত গানগুলি।

শিলঙ থেকে ফিরে এসেচি। সেখানে বেশ ভালো ছিলুম। শরীরও সুস্থ হয়েছিল। স্থানটি রমণীয়। শান্তিনিকেতনে আমার বাসা বদল হয়েচে। এখন আছি মাঠের মধ্যে একা—এ একটা নতুন দেশ বললেই হয়। বড় ইচ্ছা করে কিছু না করে চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকি। সে আমার ভাগ্যে এ যাত্রায় ঘটলো না। ছেলেবেলা থেকে কাজ ফাঁকি দেওয়াই আমার স্বভাব অথচ আমাকে যত কাজ করতে হয় এমন কোনো কর্ম্মনিষ্ঠ মানুষকে করতে হয় না। দিনের একটা উল্টো পিঠ যেটা রাত্রি—কাজের তেমনি একটা উল্টো পিঠ আছে—সেটা না থাকলে কাজটা যেন বিপত্নীক হয়ে পড়ে—অর্থাৎ নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া হয়। সেই কারণেই আমার কাজের জন্যে শ্রীমতী ছুটির সন্ধান মনে মনে সর্ব্বদাই করচি। অবশেষে যখন শ্রীমতী আসবেন তখন আমার কাজের আয়ু শেষ হয়ে আসবে। সুতরাং কাজ বন্ধ হয়ে গিয়ে তখন ছুটি হয়ে থাকবেন বিধবা—সেটাও দুর্গতি। ইতি ১১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

৩৭

নানা প্রকার কাজের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে আছি। তার সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়েমিরও যোগ আছে। লোকের কাছে এবং নিজের মনে মনে এইসব বাজে কাজের ব্যস্ততা নিয়ে নালিশ করে থাকি। কিন্তু যদি পরামর্শ নিয়ে কোনো ফল পাওয়া যেত তাহলে তোমাকে পরামর্শ দিতুম যে কোনো-মতে একটা ঝঞ্ঝাট খুঁজে বের করে তার মাঝখানে ঢুকে পড়। বাছা'-জগৎ এবং বাজে জগৎ, জগতের এই দুই ভাগ আছে। কিন্তু বাছা জগতে কাজ না করতেই সময় যায়—এটা পছন্দসই নয়, ওটা তুচ্ছ, সেটা মোটা, এই রকম বিচার করতেই দিন কাটে। বাজে জগতে বাছ বিচার নেই, যা-তা নিয়ে হুড়োহুড়ি করে' হু হু শব্দে সময় চলে যায়। সময়টা স্রোতের মত যদি মনের উপর দিয়ে খুব জোর্‌সে বয়ে যেতে পারে তাহলে মনের উপরে অবসাদ জম্‌তে পারে না। 'খুব ফূর্ত্তি করে' বাজে জগৎটার সঙ্গে ষোলোআনা বেগে কারবার করতে শেখ। জানি তখন থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠে বলবে "আর ত পারা যায় না!" কিন্তু এই রকম নালিশ করাটা মানুষের সুখেরই একটা অঙ্গ। এই বাজে জগৎটা জগতের পনেরো আনা অংশ।

বাকি জগৎটাতে আর্টিষ্টের দল নির্ব্বাসিত। তারা মাঝে মাঝে তুলি চালায়, গান গায়, আর বাকি সময়টা হায় হায় করে, কি-জানি-কি খোঁজে আর তাদের এই এক-আনী জগতের বদ্ধ দরজায় মাথা ঠুকে মরতে থাকে। তোমাকে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে—তাতে তুমি যে ঘষড়ানি পাবে তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না—ভালই হবে—মজবুৎ হয়ে উঠবে। আজ আর বেশি সময় নেই—অন্যদিন যখন সময় পাব তখন কুঁড়েমিতে পেয়ে বসবে সে আরো মুস্কিল—সেইজন্যে কাজের সমূহতার ভিতরেই ঠেলে-ঠুলে একটু ফাঁক করে নিয়ে তোমাকে এই কয় লাইন লিখে দিলুম। ক্ষিতীশ সেনের তর্জ্জমাটি আমার ভালই লাগল। ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯।

"দময়ন্তী"

সন্তোষকুমার প্রতিহার

উপনিষদে দেখি প্রতিদিন পাঠ আরম্ভের পূর্ব্বে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে "তেজস্বী নৌ অধীতমস্তু", আমাদের অধীত বিদ্যা যেন আমাদের মনকে সতেজ করে অর্থাৎ আমাদের মন যেন অর্জ্জিত বিদ্যার 'কোল্ড ষ্টরেজ' মাত্র না হয়ে সৃষ্টিক্ষম 'পাওয়ার হাউসে' পরিণত হয়। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সব যুগেই দেবীর দরবারে বিদ্যার্থীদের এ আবেদন হামেশাই বাতিল হয়ে ফিরে এসেছে। অবশ্য "কোনো কোনো ভাগ্যবানের" উপর দেবীর প্রসন্ন দৃষ্টি পড়েছে ও তাঁদের এ প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে; দময়ন্তীর কবি সেই ভাগ্যবান পুরুষদের একজন এ বইএর নাম-কবিতাটি পড়লেই সে সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় থাকে না। নল দময়ন্তীর উপাখ্যান আমরা সবাই পড়েছি, দময়ন্তীর স্বয়ংবর-সভায় দেবতারাও পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন এ ঘটনাও ভুলিনি। কিন্তু এ জিনিস অলস কবি-কল্পনা মাত্র এই ছিল আমাদের ধারণা। এই রূপকের মধ্যে মানবপ্রকৃতির একটা চিরন্তন সত্যকে কবি রূপ দিয়ে গেছেন, তা আমরা কোনোদিন ভাবিনি। দময়ন্তী উপাখ্যানের এই ঘটনার মধ্যে সত্যের যে বীজ লুকোনো ছিল দময়ন্তী কবিতায় "সেই বীজ উঠেছে অম্বরপানে অমর অঙ্কুরে।"

* বুদ্ধদেব বসু প্রণীত। কবিতাভবন, ২৲।

দময়ন্তীর দেহে যৌবনের আবির্ভাব হয়েছে রাজকীয় সমারোহে; পুঞ্জ পুঞ্জ বসন্তের মঞ্চিত অমৃত তার দেহে বিকশিত হয়েছে; তার সৌন্দর্য্যের হিরণ্ময় পাত্রটি যৌবনের স্বর্ণ মদিরায় কানায় কানায় ভরে গেছে। পার্থিবার মর যৌবনের দুর্ম্মর আকর্ষণে স্বর্গের দেবতারা নেমে এসেছেন। "আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ" যৌবনের বিশ্ববিস্মৃত আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে দময়ন্তী বরমাল্য অর্পণ করল নলের গলায় দেবতাদেরকে অবলীলাক্রমে উপেক্ষা ক'রে। দময়ন্তীর পিতা তাকালেন তাঁর যৌবনগর্ব্বিণী দেববিজয়িনী কন্যার পূর্ণিমা-মুখশ্রীর দিকে; তাঁর নিজের জীবনের "যৌবন বেদনারসে উচ্ছল" দিনগুলির বিচিত্র বর্ণচ্ছটাময়, স্বাদে-সৌরভে ভরপুর কত শত স্মৃতি সুপ্তির বাঁধন ভেঙে জেগে উঠল 'ব্যগ্রবেগে উচ্চকলোচ্ছ্বাসে'। বর্ব্বর জান্তব যৌবন এসে একদিন হঠাৎ মানুষের সামনে অক্ষয় আনন্দলোকের দ্বার অবারিত ক'রে দেয়। হৃদয়ের সীমান্ত অবধি অবগাহন ক'রেও সেদিন সে কোথাও কোনো ক্ষোভ, কোনো অসন্তোষের আভাস দেখতে পায় না; তাই স্বর্গের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য তার মনে কোনো কামনা জাগাতে পারে না। বিবসন জান্তব প্রণয়ের বচনাতীত আনন্দের বেগে সে মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা ক'রে বজ্রভয়কে অবহেলা ক'রে সর্পসঙ্কিল পথে তিমিরদুর্যোগ রজনীতে অভিসারে যায়, দময়ন্তীর পিতা ভাবলেন—কত মানুষ আসছে, কত মানুষ যাচ্ছে কিন্তু আত্মসম্পূর্ণ উল্লসিত যৌবনের স্রোত চিরদিন সমানে বয়ে চলেছে। যৌবনের উতরোল বন্যার খরস্রোতে তিনিও একদিন তীব্রগতিশীল তরণী নিয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন; আজ তাঁর তরী বার্দ্ধক্যের কূলে এসে ভিড়েছে; তাঁর কন্যা আজ সেই স্রোতে পাড়ি দিতে বেরিয়েছে; সেও এসে কূলে ভিড়বে কিন্তু সেদিনও নূতন যাত্রীর অভাব হবে না। বার্দ্ধক্যের তটে দাঁড়িয়ে তিনি উদ্দাম উন্মত্ত তাণ্ডব যৌবনের সমারোহময় আদিঅন্তহীন শোভাযাত্রার দৃশ্যটি নির্লিপ্ত দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। এই দৃশ্য তাঁর চোখে অপূর্ব্ব মাধুরী বর্ষণ করছে। তিনি বুঝেছেন মানুষ চির যুবা নয় কিন্তু যৌবন চিরজীবী; মানুষ যে যৌবন হারায় তা নষ্ট হয় না, সে তার সন্তান-সন্ততিকে সে-যৌবনের নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান করে যায়।

দময়ন্তী কবিতা উৎকর্ষের চরম শিখরে উঠেছে পঞ্চম অনুচ্ছেদে, রভস-সম্ভোগের পরম ক্ষণটিতে মানুষ যে চরম সার্থকতার সন্ধান পায়, কবি এই অনুচ্ছেদে তার যে অপূর্ব্ব বর্ণনা দিয়েছেন তার তুলনা বোধ হয় যে কোনো দেশের সাহিত্যে বিরল।

> যে-মুহূর্ত্তে বাসনাবিহ্বল নীবী
> খ'সে পড়ে, দেখা দেয় কালের প্রলয় জলে
> সর্ব্বঘ্ন তিমির তলে অলজ্জ বদ্বীপ,
> অমনি থমকে কাল; অদৃষ্টের করাল কুহেলি
> দীর্ণ ক'রে আদিম পুরুষ

লভে সপ্তদশদ্বীপা সসাগরা ধরণীরে,
নির্ভয়ে উতরে
স্বগৃহে, স্বরাজ্যে, শান্তির কঠিন তীরে
পুনর্জিত স্বর্গের দুয়ারে।
শিহরে, শিহরে
আজিও সে কথা মনে হলে
এ জীর্ণ তনুর অন্তরালে
অকাল কঙ্কাল—
যে-মুহূর্ত্তে তরঙ্গিত সময়সলিলে
দ্বিখণ্ডিত হ'লো ক্রুর অদৃষ্টের শিলা,
ম্লান হ'লো হুতাশন, ব্যর্থ হ'লো যম দণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ।

পথহারা পথিক যেন তমসঃপরস্তাৎ এক জ্যোতির্ম্ময় দেশে এসে হাজির হল; পথের দীনহীন ভিক্ষুক যেন অকস্মাৎ সসাগরা ধরার অধীশ্বর হ'ল; অভিশপ্ত দেবশিশু যেন স্বর্গরাজ্য ফিরে পেল; অতলস্পর্শ আনন্দের যে কিরীট সে মাথায় দিল তার জ্যোতি ইন্দ্র, অগ্নি, যমকে নিষ্প্রভ করে দিল। গ্রীক আলঙ্কারিক Longinus বলেছেন যে সকল উৎস থেকে sublimityর জন্ম হয় তার একটি হচ্ছে power of forming great conceptions. এই image-ভূয়িষ্ঠ অনুচ্ছেদটিতে কবি সেই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন; এই imageগুলি যেমন বিরাট, তেমনি রহস্যময় ও কুহেলিকাচ্ছন্ন। এখানে আমরা সেই sublimityর নিদর্শন পাই যার স্পর্শে "our soul is uplifted, it takes a proud flight and is filled with joy and vaunting as though it had itself produced what it has heard."

কোনো মনস্বী লেখক বলেছেন, Any fool can know, the wise alone can interpret. প্রাচীন ভারতের বড় রাজবংশ ছিল সূর্য্যবংশ, বড় বড় বীর যাঁরা তাঁরা অনেকেই সূর্য্যের সন্তান; সূর্য্যের মন্দির রচিত হয়েছে, এখনও সূর্য্য-বন্দনা নিত্যকর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। এসবই আমাদের সুবিদিত, কিন্তু এসবকে আমরা বুদ্ধি দিয়েই জানি, বোধের মধ্যে কখনো পাইনি। কবি "পূর্ব্বরাগ" কবিতায় এ সবের উপর তাঁর প্রজ্ঞার আলো ফেলেছেন। সূর্য্য হচ্ছেন প্রাণদেবতা, আমরা সবাই সূর্য্যের সন্তান; সতেজ প্রাণের বিপুল স্ফূর্ত্তিমত্তায় আমাদের জন্মগত অধিকার। প্রাণরসই হচ্ছে জীবনের আদিরস, একমাত্র মৌলিক রস; অন্য সব রসই ঐ থেকে তৈরি কৃত্রিম সামগ্রী। "প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি জায়ন্তে"। জীবনের মূলদেশে উচ্ছল প্রাণের যে আনকোরা উল্লাস তারই রসে তো ঊর্দ্ধলোকের শাখাপ্রশাখা ফলফুল পল্লব চিরশ্যামল। আজ আমরা আমাদের জন্মস্বত্ব খুইয়েছি, আমাদের মূলধনে ঘাটতি পড়ে গেছে। তাই আমাদের জীবন বিরস, বিস্বাদ, কীটদষ্ট পুষ্পের মত বিবর্ণ; তাই চারদিকে পোড়ো জমি, ফাঁপা মানুষ। এই দারুণ দুঃসময়ের অবসান হবে, মানুষ তার

উত্তরাধিকার ফিরে পাবে; শত শত প্রিয় কর্ম্মের মধ্যে সে নিজেকে বিকীর্ণ ক'রে দেবে "বসন্তের আনন্দের মত"—কবি যেন তার আভাস পেয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলিতে বিলম্ব নাহি আর।'

দ্যাখো, গলিত তুষাররাশি স্বপ্নচূড়ায়
ঝরে নির্মম কর্মের ঝরনাধারায়,
লাগে বুদ্ধিতে উৎসাহী হাওয়া;
করো চিরযৌবনা এই ধরিত্রীরে।

বিশ্বকর্ম্মার হাতুড়ির ঘায়ে এই নবযুগ রচিত হবে না। কবির বাঁশীর সুর এই স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করবে। দীর্ঘ পয়ার অংশ এ কবিতার শ্রেষ্ঠ অংশ। এই পয়ারের মধ্যে একটি প্রাণবেগচঞ্চল বাগ্মিতার যে শ্রবণসুভগ দ্রুতরুদ্রতালটি শোনা যায় তা সবিশেষ উপভোগ্য।

"কবিজীবনী" কবিতায় মানুষের যে কর্ম্মশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তার অন্তর-রহস্য উদ্‌ঘাটনে কবি অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবির অন্তর্জীবনের যে অন্তরঙ্গ চিত্রটি তিনি এঁকেছেন তা আত্মসচেতন বড় কবির পক্ষেই সম্ভবপর। এ কবিতাটি শুধু এ গ্রন্থের নয়, বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। কাব্যলক্ষ্মী স্বকলমে এ কবিতা লিখে গেছেন বললেও আমরা অবিশ্বাস করতাম না। শিল্পকর্ম্মের প্রতি কবির যে-জন্মজন্মান্তরের অন্ধ আসক্তি, শিল্পরচনায় প্রতিনিয়ত তাঁর যে-ঘর্ম্মক্ষর ক্লান্তিহর পরিশ্রম, শিল্পসৃষ্টিতে তাঁর যে উপচীয়মান মহান আনন্দ—এর মধ্যে শিল্পকর্ম্মের যে স্বরূপটি ধরা পড়ে সকল স্বতঃপ্রণোদিত কর্ম্মপ্রচেষ্টার স্বরূপই তাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। দ্রাক্ষাকাননের যে প্রান্তটিতে তার বিধাতানির্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রটি রয়েছে, মানুষ যেদিন তার স্বত্বাধিকারী হয়, সেদিন সে আপন স্বরাজ্য লাভ করে। সেই কর্ম্মক্ষেত্রে তার প্রকৃতির সহজাত কর্ম্মিষ্ঠতা উৎসারিত হয়, সে তার জীবনের সার্থকতার আস্বাদ পায়। তার হৃদয় শরতের ভরা গঙ্গার মত কানায় কানায় ভরে যায়। আপনার কাজের মধ্যে সে বিভোর হয়ে থাকে; আপন কাজে তার অপার তৃপ্তি অগাধ শান্তি। ধনদৌলতের নেশা তাকে আর স্পর্শ করে না, খ্যাতিপ্রতিপত্তির মরীচিকা তার মনে আর মোহবিস্তার করে না, সে এখন "পীতামৃতঃ ইব বিগততৃষ্ণঃ"। অজচ্ছল আনন্দরসে তার অন্তর নিরন্তর অভিষিক্ত; ক্লেশকে আর সে ক্লেশ মনে করে না, দুঃখ তার কাছে আর দুঃখ নয়। সংসারের ফাঁপা মানুষের দল, যারা কখনো "গভীরের স্পর্শ" লাভ করেনি, যারা সর্ব্বদা মরীচিকার অন্বেষণে উদ্‌ভ্রান্ত জীবন যাপন করছে, তারা তার এই শ্রান্তিক্লান্তিহীন সহস্র রকমের আয়াসপ্রয়াসকে মূঢ়তা বলেই মনে করে। মানবপ্রকৃতির যে অগাধ অতলে স্বতঃস্ফূর্ত্ত কর্ম্মশক্তির উৎসভূমি, বুদ্ধি

২

সেখানে নাগাল পায় না; তাই তার অঙ্কুশ সে কর্ম্মের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না, লাভ লোকসানের বাটখারা নিয়ে সেখানের কারবার নয়। এ হচ্ছে সেই অন্ধ আনন্দের দেশ "যে অন্ধ আনন্দভরে কুসুম মুকুল সুন্দরবৃন্তের মুখে ফুটিয়া আকুল"; সেই মূঢ় প্রমোদরসের দেশ "যে মূঢ় প্রমোদরসে নবরৌদ্রালোকে তরুলতা তৃণগুল্ম উঠে হরষিয়া"। কবি মানুষের জন্য এমন একটি স্বর্ণযুগের কামনা করছেন যেদিন পৃথিবীর প্রত্যেক নরনারী—কৃষক, যন্ত্রী, কবি—আপন স্বরাজ্য খুঁজে পাবে; যেদিন কেউ কারুর ক্রীতদাস থাকবে না, যেদিন সবাই কাজ করে যাবে অন্তরের স্বসমুত্থ প্রেরণার বশে; তাদের দৈনন্দিন কর্ম্মধারার মধ্যে কল্লোলিত হ'য়ে উঠবে এই অন্ধ আনন্দ, এই মূঢ় প্রমোদরস। উপনিষদ বলেছেন ব্রহ্ম যিনি, তিনি স্বয়ংকর্ত্তা তাই তিনি আনন্দময়। যে মানুষ এই স্বয়ংকর্ত্তা ব্রহ্মের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলে উপলব্ধি করেন, তিনি অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ পান। মানুষ যদি নিজে স্রষ্টা না হয়, বিশ্বস্রষ্টার যে-আনন্দ তার আস্বাদ সে কখনো পেতে পারে না। আর সৃষ্টির জন্য চাই স্বতঃস্ফূর্ত্ততা, স্বয়ংকর্ত্তৃত্ব। যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্ রসো বৈ সঃ—যেখানেই স্বয়ংকর্ত্তৃত্ব সেইখানেই অলৌকিক আনন্দ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি—স্বয়ংকর্ত্তৃত্বের যে রস তাকে পেয়েই মানুষ আনন্দিত হয়, যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোহভয়ং গতো ভবতি—স্বয়ংকর্ত্তৃত্বের আনন্দে যাঁর প্রতিষ্ঠা তাঁর আর কোনো ভয় নেই; যদা হ্যেবৈ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি—যে স্বয়ংকর্ত্তৃত্বে বিন্দুমাত্র ছিদ্র দেখতে পায়, সে ভয়ে বিহ্বল হয়, কেননা স্রষ্টার আনন্দ সে অনুভব করে না, সে আর লীলাময়ের শরীক নয়, সে ক্রীতদাস, স্বয়ংকর্ত্তৃত্ব, স্বতঃস্ফূর্ত্ততা ছাড়া আনন্দের আর দ্বিতীয় উৎস নেই। আত্মকর্ত্তৃত্বের আনন্দ বশেই "সর্বে লোকাঃ মহীয়ন্তে"। স্বতঃস্ফূর্ত্ততার আনন্দের ভিত্তির উপরই নূতন দ্যুলোক নূতন ভূলোক গঠিত হ'তে পারে। বর্নার্ড শ'র নাটকের পাগলা পুরোহিতও এই আদর্শের স্বপ্নই দেখেছেন—Work is play, and play is life, three in one and one in three.

নীচের উদ্ধৃতিটিতে কবির যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে কোনো প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী যদি তাকে তুলিকার সাহায্যে এঁকে রাখেন তাহ'লে সে চিত্র প্রকৃত কবির চিত্র হিসেবে অমর হ'য়ে থাকবে।

যৌবন ফুরায়,
জীবন নিঃশেষ হ'য়ে আসে, তবু ম্লান দিনান্তের
অস্পষ্ট আলোয় ব'সে ছন্দ বুনি, কানে শুনি কোন
অপরূপ ধ্বনি, যার সন্ধানের উদ্দীপনা দূর
করে মৎসর জরার গ্লানি।

"কবিজীবনীতে" যা মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে দেখা হয়েছে "কোনো কবি বন্ধুর প্রতি"তে তাই দেখা হয়েছে ব্যঙ্গদৃষ্টি নিয়ে। মানব চরিত্রে দ্বৈতভাবটি এতই সুস্পষ্ট যে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মানুষের মধ্যে দেহ ও আত্মা এই দুটি বি-সম বস্তুকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তারা একত্রে ঘর করছে কিন্তু তাদের বনিবনা হচ্ছে না; তাদের দাবী-দাওয়া আয়োজন-প্রয়োজন অত্যন্ত স্বতন্ত্র ধরনের! একের কাছে যা মরীচিকা, অন্যের কাছে তাই নিরতিশয় বাস্তব। এ দুটি কবিতা পাশাপাশি রেখে পড়লে মানব-প্রকৃতির এই দোটানা ভাবটির একটি অতি চমৎকার চিত্র ফুটে ওঠে। মুগ্ধ দৃষ্টির কাছে সত্যের একটা অংশ মাত্র ধরা পড়ে; ব্যঙ্গদৃষ্টির আলোকে আরেকটা অংশের রূপ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। মুনিঋষিরা নাকি সব জিনিসকে করতলগত আমলকী ফলের মত দেখতে পেতেন। এর বোধ হয় অর্থ এই যে তাঁরা জিনিষকে উল্টে পাল্টে নানাভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তার পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করতেন। এ দুটি কবিতায় কবি একই জিনিসকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। কোনো সত্যকে তার সমগ্রতার ভূমিকা থেকে বিশ্লিষ্ট করে দেখার নেশা আমাদের মনের sanityর অভাবের পরিচায়ক। রঙ্গমঞ্চে দেখি নটীর দেহ চারুকলার সুকুমার 'মিডিয়ম', আপাদমস্তক সর্ব্বতোভাবে মনের ছন্দে আচ্ছন্ন। এ পরিচয় নটীর দেহের মিথ্যা পরিচয় নয় কিন্তু তাই বলে এ কথা সত্যি নয় যে নটীর দেহ সম্পূর্ণভাবে দেহধর্ম্মমুক্ত, সংসারের আরো দশজন নারীর সঙ্গে নটীর কোনো সাদৃশ্যই নেই, তাকে নিয়ে ঘর করতে হলে রান্নাবাড়ার কোনো প্রয়োজন হবে না, কেবল গান বাজনার আয়োজন-টুকুতে কোনো ত্রুটি না ঘটলেই যথেষ্ট। কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী, বীর—এঁদের জীবনের প্রেরণাদীপ্ত মুহূর্ত্তে তাঁদের আত্মার জ্যোতি স্ফুলিঙ্গনিঃশ্বাসী হোমাগ্নিশিখার মত দেদীপ্যমান হয়ে উঠে। মর্ত্ত্যমানবের কোনো ক্ষোভ, কোনো তাপ, কোনো অভিযোগ কোনো অনুযোগ তাঁদের ত্রিসীমানায় এসে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু সূর্য্য অস্তমিত হলে আকাশে যেমন শত শত তারা ফুটে ওঠে তেমনি দীপ্ত মুহূর্ত্তটির তন্ময়তা যখন কেটে যায় তখন তাঁরা পার্থিব মানুষের কত রকমের অভাব-অসন্তোষের বেদনা অনুভব করতে সুরু করেন। স্বর্গের অমৃতের স্বাদ তাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা ভাগ্যবান কিন্তু তাঁরাও যে মর্ত্ত্যবাসী "পুষ্পে কীট সম যেথা তৃষ্ণা জেগে রয়"। শিল্পসৃষ্টিতে কবির অজস্র উৎসাহ; শিল্পের অমরাবতীতে তাঁর সৃষ্টি অমর হয়ে থাকবে, এ তাঁর জীবনের চরম পুরস্কার। কিন্তু সংসারের যত পাপীতাপী অভাজনের দল সলমনের মত সমারোহে লোকলস্কর নিয়ে জুড়ীগাড়ী হাঁকিয়ে যাবে কবির গায়ে কাদা ছিটিয়ে, এই দৃশ্যের কাছে ঐ পুরস্কারের কথা ভেবে অবিচলিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ।

তবু আত্মরক্ষা ইষ্ট; শিল্পের অমরা
অগত্যা প্রত্যয়। আর পরস্পরে বিষণ্ণ বাহবা।

এই ছুটি ছত্রে সকরুণ অসহায়তার তীক্ষ্ণ বেদনা অপরূপ অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

একই জিনিষ নানালোকে দেখে নানা চোখ নিয়ে। বিয়ের সম্বন্ধ এল—বাপ দেখল ছেলেটির লেখাপড়া কতদূর; মা ভাবল অবস্থাটা কি রকম, মেয়ে বেশ স্থখে থাকবে তো; জ্ঞাতি কুটুম্বের দল ভাবল তাকে আত্মীয় হিসেবে পেলে কৌলীন্য বাড়বে ত; আপামর সাধারণ ভাবল ভোজের আয়োজনটা ঠিক মত হবে ত; ক'নের মনে এসব কোনো কথাই উঠল না; সে জানতে চায়, তার রূপটি কেমন? কাব্য এসে হাতে পড়ল—ব্যাকরণের পাঠুয়া দেখল কোথায় কি অর্থে কোন্ বিভক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, কোন্ পদ নিপাতনসিদ্ধ, কোন্টি আর্ষপ্রয়োগ; অলঙ্কারের পাঠুয়া দেখল সাহিত্যদর্শনের দশম পরিচ্ছেদে যে সকল অলঙ্কারের কথা রয়েছে তার ক'টির উদাহরণ এখানে পাওয়া যায়, তত্বজ্ঞ দেখল দর্শন বা বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব এর মধ্যে রয়েছে, বিজ্ঞের দল দেখল এতে লোকহিতসাধন সম্ভব কিনা, পেন্সনভোগী দেখল এ বই নিয়ে বেশ আরামে সময় কাটানো যায় কিনা। কাব্যার্থকোবিদের মনে এ সকল কোনো প্রশ্নই জাগল না। অবোধ বালিকার মত তার মনও কেবল "বরয়তে রূপম্"; রূপের বিচারটাই তাঁর কাছে চূড়ান্ত বিচার। বিজ্ঞব্যক্তির কাছে তাঁর এ মত অশ্রেদ্ধেয় ঠেকেছে। কিন্তু তাঁর এ মত যে এতটা উপেক্ষণীয় নয়, তা শুধু এইটুকু দেখলেই বুঝতে পারব যে প্রোটপ্ল্যাজমের সঙ্গে মানুষের জ্ঞাতিত্ব আজ সর্ব্বজনস্বীকৃত, কিন্তু স্থষ্টির পর্য্যায়ে প্রোটপ্ল্যাজমের স্থান সর্ব্বনিম্নে আর মানুষের স্থান সর্ব্বোচ্চে, শুধু এই জন্যই যে প্রোটপ্ল্যাজমের রূপ নেই আর মানুষ উঠেছে রূপের সবচেয়ে উপরের কোঠায়। মানুষের মধ্যে রয়েছে সেই প্রাণপ্রেরণা যা আত্মপ্রকাশের আবেগে স্থপরিচ্ছন্ন সৌষ্ঠবময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গ'ড়ে তুলেছে। মহাশ্বেতার মুখে তাঁর কাহিনী শুনে চন্দ্রাপীড় তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এই বলে যে যে সকল স্থখাসঙ্গলুব্ধব্যক্তি প্রিয়বিয়োগের পর স্নেহসদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানে অশক্ত হয়ে নিষ্ফল অশ্রুপাতের দ্বারা লোকের সামনে তাদের স্নেহ জাহির করে, তাদেরকে ধিক; আর ধন্য হলেন তাঁরা যাঁরা আপনার মত যা কিছু প্রেমোচিত সবই আচরণ করেন কর্ম্মের দ্বারা। কাব্যার্থকোবিদের কাছে সেই সকল লেখক ধিক্কৃত হয় যারা রসোপযোগী অঙ্গনির্ম্মাণে অক্ষম হয়ে কেবল চড়া গলায় অতি নাটকীয় ধরতাই 'ফ্রেজ'-সব আউড়িয়ে নিজেদের কবিত্ব জাহির করে, আর শ্রদ্ধা পান সেই সকল কবি যাঁরা নিজেদের রস-প্রেরণাকে স্থপরিচ্ছন্নভাবে রূপায়িত করতে পেরেছেন। তত্ত্বদর্শীরা চিরদিনই বলে এসেছেন যে আর্ট হচ্ছে impression অর্থাৎ শিল্পকলার যথার্থ পরিচয়

তার রূপে। Image বা রূপস্থষ্টির ক্ষমতার নামই তো কবিকল্পনা, imagination. দময়ন্তী কাব্যগ্রন্থের রূপরম্যা কবিতাগুলি পড়ে পাঠকের রূপপিপাসা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। 'বিরহ' কবিতায় কবি রূপ বানাবার যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমরা চমৎকৃত হই।

ইতিহাসে দেখা যায় কখনো কখনো এমন একটা ছুর্দ্দিন আসে যেদিন মনে হয় ভগবান বুঝি ইতিহাসের রাজ্য ছেড়ে কোথাও চলে গেছেন। আমরা আশে পাশে চারদিকে তাকিয়ে দেখি আশা রাখবার মত, ভরসা রাখবার মত কোনো সম্বল কোথাও নর্জরে পড়ছে না। যতদূর দৃষ্টি যায় ভবিষ্যতের আকাশ "ছুষ্ট বিকৃত কলুষিত আলোয়" ভ'রে রয়েছে। সারা ছুনিয়ার উপর যেন শনির দৃষ্টি পড়েছে—কোথাও কিছু জন্মাচ্ছে না, গজাচ্ছে না, মানুষের হৃৎপিণ্ড জড়পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। যিনি মঙ্গলময়, যিনি সকল ঘটনাকে একটা কল্যাণময় পরিণতির দিকে নিয়ে যান, তিনি যেদিন ফিরে আসবেন সেদিন আমাদের সব আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা কামনা "শিহরিত, সঞ্জীবিত, সন্দীপিত" হ'য়ে উঠবে, কিন্তু তিনি যে ফিরে আসবেন তার কোনো আভাস ইঙ্গিতই চোখে পড়ছে না। ইতিহাস-বিধাতা যেদিন একটা যুগকে এগিয়ে দেন অন্য যুগের দিকে তখন মানুষের ভাগ্যে চরম ছুঃখ ঘটে কিন্তু সে ছুঃখের মধ্যে তার সান্ত্বনা থাকে যে "ছুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ" কিন্তু যে ছুঃসময়ের কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে এ সান্ত্বনার অবকাশ নেই, কেননা এখনকার যে তাণ্ডব তা ভূতনাথের তাণ্ডব নয় যা নবতর স্থষ্টির স্থচনা করে, এ তাণ্ডব ভূতের দলের তাণ্ডব যার মধ্যে স্থষ্টির ছুঃসহ বেদনা রয়েছে কিন্তু স্থষ্টির সম্ভাবনা নেই। কবি বিরহ কবিতায় এই ছুর্দ্দিনের কথা বলেছেন। এ কবিতা পড়বার সময় মনে হয় বাংলা সাহিত্যে সেই দেশের বর্ণনা পাচ্ছি যার সম্বন্ধে দান্তে বলেছেন Abandon hope all who enter here. যে সকল উপমা ও উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে এই যুগের রূপটি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন পাশ্চাত্য অলঙ্কার শাস্ত্রে তাদের আখ্যা হচ্ছে terrible, এ কবিতার ছত্রে ছত্রে এ জাতীয় image ছড়ানো রয়েছে। নীচে ছু চারটি দেওয়া হল।

"এয়োতির সিন্দূর এখানে রক্ত হ'য়ে ঝরে।"
"জীবনের কানে কানে কঙ্কালেরা চুপি চুপি কথা কয়;"
"পিঙ্গল পিশাচ আলো মুমূর্ষুর প্রলাপের মতো ..."
"সর্ব্বনাশী অতল তিমির নামে, এ-কবন্ধ আলো তারি দূতী।
"অন্ধকারে কেঁদে মরে রক্তাক্ত প্রস্থতি সন্তানের মূর্ত্তি দেখে।"
"মৃত্যুরে কি জন্ম দিল দীর্ণ হ'য়ে প্রসব-ব্যথায়!"
"এ কুটিল কালো জলে নেচে চলে ফণা তুলে দস্তিল, সর্পিল ফেনা,
আকাশে আতঙ্ক কাঁপে।"
"রাত্রি নামে, পৃথিবীর চিরপ্রস্থতির কান্না শোনা যায়;"

"পৃথিবীতে মৃতের, রিক্তের, ছিন্নঅঙ্গ কবন্ধের ভিড়, অপুত্রীর অভিশাপ,
অকর্ষিত প্রান্তরের দুঃসীম শূন্যতা।"

শেষ অনুচ্ছেদের কম্পমান বিরহবেদনাটি এই ভয়ানক রসের কবিতাটির উপর একটি করুণ কোমল ছায়া ফেলেছে। আকাশপ্রনিহিতভুজ আশ্লেষলিপ্সু যক্ষের বিষাদবিধুর রূপটির মত যে বিরহকাতর ছবিটি কবি শেষ অনুচ্ছেদে এঁকেছেন, তার করুণ রস আমাদের মনকে আর্দ্র করে দেয়। এ তিমির তোমারি বিরহ প্রিয়—এই আশায় তিনি কঙ্কালবেষ্টিত পীত-লোহিত সন্ধ্যায় বুক বাঁধছেন যে কোনভাবে 'লোচনে মীয়য়িত্বা' তিনি তাঁর দুঃখের দিনগুলি কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু যখন কঙ্কালের দীর্ঘশ্বাসে শুনতে পেলেন যে তাঁর প্রিয়তম ত্রিসীমানার মধ্যে কোথাও নেই, তাঁর ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তখনো তিনি কাতর হয়ে পড়লেন না, বরং উল্টে এই আশায় বুক বাঁধলেন যে তিনি সত্য সত্যই মঙ্গলময় তিনি নেই বলেই এই "দুষ্ট ক্লিষ্ট" আলো আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, তিনি থাকলে এ আলো মুহূর্ত্তের জন্যও উঁকি মারতে পারত না। এ কবিতার শেষছত্রে যে-আশার সুর ধ্বনিত হয়েছে এ হচ্ছে সেই আশা যা "creates from its own wreck the thing it contemplates," এর মধ্যে রয়েছে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী আস্তিক্যবুদ্ধি যা প্রদীপ্ত আত্মার জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে প্রত্যক্ষ মৃত্যুকে অস্বীকার করে আপন মহিমা দেদীপ্যমান করে তোলে। আত্মার এই sublime রূপের চিত্রটি আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত করে "বিভাসবিস্তার প্রজ্জ্বলস্বভাবা" দীপ্তি। দীপ্তগম্ভীর রসে এ কবিতার অবসান। ভয়ানক রসের কালো ছায়াটির অন্তরে করুণ রসের কোমল আলোটি স্নিগ্ধ বিদ্যুতের মত স্পন্দিত হচ্ছে এবং দীপ্তরসের নির্ধূম বহ্নিশিখা তার চারদিকে একটি জ্যোতিষ্মান্ বলয় রচনা করেছে। "বিরহ" যে একটি অপূর্ব্ব কবিতা আশা করি তা আর বলার প্রয়োজন নেই।

পূর্ব্বরাগ ও বিরহ এ দুটি কবিতার নামকরণ লক্ষণীয়। আদিরসাত্মক বিভাব নিয়েই পূর্ব্বরাগ ও বিরহের কবিতা রচিত হয়। কিন্তু এ কবিতাগুলির সঙ্গে আদিরসের কোনো সংস্পর্শ নেই। অভিনব বিষয়বস্তু অবলম্বনে পূর্ব্বরাগ ও বিরহের কবিতা রচনা কবির মৌলিকতা ও স্বচ্ছদৃষ্টির পরিচায়ক। একটু বোঝবার চেষ্টা করলেই আমরা দেখতে পাব যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাবকে ঘিরে একই ভাব উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। একের কাছে যা পরম কামনার ধন, অন্যের কাছে তা চরম অবহেলার সামগ্রী। মানুষের লক্ষ্যের এই গুরুতর পার্থক্য সত্ত্বেও একের সুখ দুঃখ যে অন্যের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য নয়, তার কারণ এই যে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা যতই স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হোক না কেন, যদি তাদের প্রকৃতি সমান গভীর হয়, তাহলে আশানৈরাশ্য,

উদ্বেগ আশঙ্কার দোলা ঠিক সমান অনুভব করবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের যা লক্ষ্য আর তাঁর রুবাইয়াতে ওমরখৈয়ামের যা লক্ষ্য তার মধ্যে সুমেরু কুমেরুর ব্যবধান কিন্তু নীচের দুটি ছত্র তুলনা করলে দেখা যাবে যে তাঁরা প্রায় একই ভাষায় কথা বলেছেন।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ
—এ ধর্ম্মের এতটুকুও মহৎ ভয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।
মায় একমন্ বখুরী হাজার ইল্লৎ ববুরদ্
—এক মন (২ রাতল বা ৬½ কিলোগ্রাম) সুরা পান কর, হাজার হাজার আধি ব্যধি থেকে মুক্তি পাবে।

বৈষ্ণব কবির ব্যক্তিপুরুষের সঙ্গে ওমরের ব্যক্তিপুরুষের কোনো সাদৃশ্যই নেই কিন্তু বৈষ্ণব কবির যে পদটি ওমরের রুবাইটির পাশে তুলে দেওয়া হচ্ছে তাদের ভাবের আশ্চর্য্য মিল প্রথম নজরেই আমাদের চোখে পড়ে এবং মনে হয় একে যেন অন্যের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছেন।

না পুড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে,
মরিলে বাঁধিয়া রেখো তমালের ডালে।
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে,
পরান পাওব হাম পিয়া-দরশনে।

দর্ পায়ে আসল্ চু মন্ সের্ আফ্‌গান্দাহ্ শোয়ম্,
ও জে দস্তে আজল্ চু মোর্গ পর্ কান্দাহ শোয়ম্।
জিন্‌হার্ গিলম্ বজুজ্ সোরাহি মকুনেদ্,
শায়েদ্ কে চু পুর্ জে মায় শোয়ম্ জিন্দা শোয়ম্।

আশার কবরে আমি শির গুঁজি পড়িব যেদিন,
মৃত্যু কিরাতের হাতে পাখী সম পালকবিহীন।
মোর মাটি হ'তে শুধু সুরাপাত্র করিও নির্ম্মাণ,
সুরাপূর্ণ হ'লে আমি হয়তো বা পাইব পরান।

কৃষ্ণের মধ্যে রাধা যে শান্তি, যে তৃপ্তি, যে সান্ত্বনার সন্ধান পেয়েছিলেন ওমর সুরার মধ্যে সেই শান্তি, সেই তৃপ্তি, সেই সান্ত্বনার আস্বাদ পেয়েছিলেন। এই জন্য তাঁদের বিভাবের মধ্যে পর্ব্বতপ্রমাণ অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ভাবের একটা নিগূঢ় ঐক্য রয়েছে। পূর্ব্বরাগ ও বিরহ কবিতার রচয়িতা একজন যথার্থ মননজীবী। তিনি তাঁর ভাবনা-চিন্তাকে দরদ দিয়ে লালন পালন করেছেন, তারা শুধু তাঁর বুদ্ধির শিখরে বাসা বাঁধেনি, তাঁর মর্ম্মের মধ্যে শিকড় বিস্তার করেছে। এই জন্যই ও সব বিষয় নিয়ে তিনি এই গভীর ভাবমূলক কবিতা রচনায় সমর্থ হয়েছেন।

"ছিন্নসূত্র" এ বইএর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা জেনেও নিঃশঙ্কে উপেক্ষা করে যাচ্ছি এই জন্য যে এর পূর্ণ পরিচয়জ্ঞাপন স্থানসাপেক্ষ। মাঝে মাঝে

আমাদের মনে হয় যে সভ্যতা জিনিসটা মানুষের জীবনের মূল রাগিণীর মধ্যে এসে পড়েছে সঙ্গীতের বিবাদী স্বরের মত। তাই আমরা তখন সভ্যতার মুকুটটি মাথায় প'রে প্রবল অস্বস্তি অনুভব করি এবং যাদের জীবনে এ অনর্থ ঘটেনি, সে জীবন ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুল হই। এ কবিতায় এই ব্যাকুলতা রূপ পেয়েছে। "হে কাল!" কবিতাতে vast abstractionকে মূর্ত্ত ক'রে তোলা হয়েছে। এর ছত্রে ছত্রে প্রেরণাদীপ্ত কবিপ্রতিভার স্পর্শ রয়েছে। "নির্ম্মম যৌবনে" যৌবনের জাদুর রূপ ভাষার ইন্দ্রজালে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছে। "চলচ্চিত্রে" একটি সতেজ বস্তুনির্ভর ব্যঙ্গদৃষ্টির পরিচয় পাই।

দময়ন্তী বইএর প্রায় সকল কবিতাই মননশীল কবিতা। সব দেশের সাহিত্যেই দেখা যায় মননশীল কবিতা সব সময় আগাগোড়া কবিত্বের রঙে রঙীন হয়ে ওঠে না, যেন অনেকটা দড়কচা ফলের মত, তার কোনো অংশে রঙ ধরেছে কোনো অংশে ধরেনি। বুদ্ধিগম্য তত্ত্বকথার শবশরীরকে সুন্দর ভাষা, সুন্দর ছন্দ, সুন্দর উপমা দিয়ে অলংকৃত ক'রে কবিত্বসৃষ্টি সম্ভবপর নয়, কেননা কাব্যের আত্মা যে রস তা সেখানে নেই। অবশ্য সুন্দর ভাষা, সুন্দর ছন্দের মধ্যে একটা কবিত্বের আমেজ আছে কিন্তু সে রস বহিরাগত, সে রসপ্রতীতি পরিদুর্ব্বলা। দময়ন্তীর মননশীল কবিতাগুলি কিন্তু গাছপাকা ফলের মত "filled with ripeness to the core." রসলোকে প্রবেশের একটিমাত্র পথ, সে পথ বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারী ভাবের পথ। দময়ন্তীর কবিতাগুলি *এই* পথ দিয়ে এসেছে, তাই এরা রসোত্তীর্ণ। উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনার সঙ্গে যেখানে উঁচুদরের মননশীলতার সমন্বয় ঘটে, সেখানে বুদ্ধিগম্য তত্ত্বগুলি উদ্দীপনবিভাবের কাজ করে, তারা কবিচিত্তে অনুভাব ও সঞ্চারীভাব জাগিয়ে তোলে। এইজন্য এ সকল কবির মননশীল কবিতা "not harsh and crabbed but charming and musical as Apollo's lute."

কবিজীবনীতে কবি বলেছেন

"কত সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ছায়া এসে পড়ে,
কত আলো চকিতে মিলায়, সেই সব পলাতক
আলোছায়া ফোটাই রূপের ছন্দে।"

এখানে যাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তিনি দময়ন্তীর কবি নন, তিনি হচ্ছেন "বিচিত্রিত মুহূর্ত্তে"র কবি। "দময়ন্তীর" আলোছায়া তত পলাতক নয় যত পলাতক "বিচিত্রিত মুহূর্ত্তে"র আলোছায়া। সহরের পথে গোত্রহীন সারমেয়গণতন্ত্রের শরীরে রঙের বিচিত্র নক্সা কবে কবির ক্লান্ত চোখ স্নিগ্ধ করেছিল, নারানগঞ্জে দুপুরবেলা কার ভাঙা গলার বাঙাল কথা

তাঁর প্রাণ মন রাঙিয়েছিল, কবে ঘূর্ণিত ধূলার জঙ্গম কুহেলিতে বিশুষ্ক বীরভূমের আনন্দিত বনস্পতি হাত তুলে হৈ-চৈ করেছিল, কবে জলের উজ্জ্বল শস্য রাশি রাশি ইলিশের শবের আগমনে কেরাণীর গিন্নীর ভাঁড়ার শর্ষের ঝাঁঝে সরস হয়ে উঠেছিল—এই সব কথা "বিচিত্রিত মুহূর্ত্তে" রূপের ছন্দে ফুটে উঠেছে। এ সকল কবিতা পড়লে মনে হয় সত্যি-সত্যিই

কবির হৃদয়
ছন্দের নৃত্যের
বিচিত্রিত মুহূর্ত্তের
মৃন্ময় আধার।

কবির সৃষ্টি পাঠকের কাছে যত বিস্ময়কর, তাঁর নিজের কাছেও তার চেয়ে কম বিস্ময়কর নয়। সব সৃষ্টিরই স্বরূপ এই। সৃষ্টির রহস্য সত্যি-সত্যিই "নিহিতং গুহায়াম্"। সে রহস্য ভেদ করতে গিয়ে স্রষ্টা নিজেও বার বার ফিরে আসেন "অপ্রাপ্য মনসা সহ"।

হৃদয়ে আমার
কার, কার পদধ্বনি, প্রতিধ্বনি? কে তুমি, কে তুমি
অচেতন মনোবনভূমি উচ্ছ্সি' শুধায়।

যে শক্তির স্পর্শে কবির মনে সৃষ্টিলীলা উদ্বেল হয়ে ওঠে, সেই লীলাময়ী কে, তা জানবার এই ইচ্ছা কবিগনের নিত্যকালীন ইচ্ছা। এ লীলাময়ী কে তা কেউ জানতে পারেনি, শুধু এইটুকু জানা যায় যে সে শক্তি প্রবচনের দ্বারা লভ্য নয়, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন; সে শক্তি স্বয়ংবরা, যার গলায় তার বরণমালা পড়বে তাদের জীবনের ধারা বদলে যায়, তার সুখদুঃখ সংসারের গতানুগতিক মানুষদের সুখদুঃখ থেকে স্বতন্ত্র, সে বুঝতে পারে যে অন্য সবাই রয়েছে ছায়ালোকে, সে কিন্তু রূপলোকের বাসিন্দা। ঐ শক্তির আবির্ভাবে কবির অন্তরে একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগে। 'ছন্দ' কবিতার শেষ অংশটিতে কবিচিত্তের এই অন্তর্গূঢ় বেগক্রিয়াবান অনুভব "bursts out in a wild gush of mad enthusiasm filling the poet's words with frenzy."

আমার হৃদয়
পূর্ণ ক'রে তুমি আজ এলে
বৃষ্টিঝরা রাত্রিতে পা ফেলে
ঝঙ্কারে, নিক্বণে,
অচেতন মনোবনে পতঙ্গগুঞ্জনে,
পাখির অশান্ত কাকলিতে,
সব শেষে ভাষাতীত বিশাল নিভৃতে,
যে শূন্যে কিছুই নেই, শুধু এই নৃত্যবেগে উন্মত্ত সৃষ্টির
স্তব্ধ কেন্দ্রে তুমি আছো স্থির।

এ কবিতার ছন্দটি প্রণিধানযোগ্য। এ ছন্দ পয়ার ছন্দ, খাঁটি প্রবহমান পয়ার। ছ মাত্রা থেকে দশ মাত্রা পর্যন্ত কোনো জোড়া মাত্রার পর্ব্ব পয়ার ছন্দে সহজেই স্থান পায়। ছ মাত্রা ও আট মাত্রার পর্ব্বের বিচিত্র বিন্যাসে পয়ারে প্রবহমানতা আসে; দশ মাত্রার পর্ব্বও ছ মাত্রা ও আট মাত্রার পর্ব্বের সঙ্গে বেমালুম খাপ খায়। কিন্তু দু মাত্রা ও চার মাত্রার পর্ব্ব যখনই তার মধ্যে এসে পড়ে তখন প্রবহমানতা নষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু পয়ারের অখণ্ড কলধ্বনির যেন খানিকটা হ্রাস হয়। ধ্বনির স্রোতের মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে হলে, তাকে বন্ধুর ক'রে তুলে মনকে সজাগ রাখতে হ'লে পয়ারের মধ্যে দু মাত্রা ও চার মাত্রার পর্ব্বের বহুল ব্যবহার অপরিহার্য্য। কিন্তু মনকে যখন ঘুম পাড়িয়ে রেখে সুদূরে নিয়ে যাওয়া দরকার, সেখানে দু মাত্রা চার মাত্রার পর্ব্ব ত্যাগ করে নিরবচ্ছিন্ন মসৃণ ধ্বনিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখাই সমীচীন। বাংলা ছন্দে পর্ব্বের পর একটু যতি থাকবেই, তা সে যতই সামান্য হোক। এজন্য যখনই দু মাত্রা বা চার মাত্রার পর্ব্ব আসে তখনি অতি স্বল্পকালের মধ্যেই ধ্বনির প্রবাহে বিরতি ঘটে, পয়ারের দীর্ঘ পদক্ষেপ হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়, অখণ্ড কলধ্বনির জাদু কেটে যায়। পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল (৪+৪+৬) এই চরণটির প্রবহমানতার সঙ্গে কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল (৮+৬) এই চরণটির প্রবহমানতা তুলনা করলেই আমাদের এ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। 'ছন্দ' কবিতাটিতে ছোট পর্ব্ব কবি দু একটি ছাড়া ব্যবহার করেন নি আর এই জন্যই এ কবিতা পড়বার সময় মনে হয় আমাদের হৃদয়

ধ্বনির অবোধ রঙ্গে, সুরের তরঙ্গে
কেবলি কি ভেসে যাবে গ্রহসূর্য্যতারাদের সঙ্গে।

"এখন বিকেল" একটি অতুলনীয় কবিতা। বাংলা কবিতার "স্বর্ণ-ভাণ্ডারে" এ কবিতা চিরদিন অম্লান হয়ে রইবে। এ কবিতার এতখানি প্রশস্তি অনেকের কাছে অসঙ্গত ঠেকতে পারে। কোনো জিনিসের মূল্য যাচাই করতে হলে আমরা প্রথমেই আমাদের দাঁড়িপাল্লাটি বের করে দেখি তার ওজন কত, যার যত ভার তার তত দাম, যার ভার নেই তার দাম নেই। এ কবিতার মধ্যে কোনো ঘটনা নেই, কোনো দুরূহ চিন্তা নেই, কোনো গভীর আবেগ নেই। আমাদের মনের সূক্ষ্ম পলাতক রঙীন ভাবনাগুলি নিয়ে কবি একটি নির্ভার স্বপ্নলোক রচনা করেছেন। যেহেতু এ কবিতার ভার নেই, একে উচ্চমূল্য দিতে আমাদের বাধ-বাধ ঠেকে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে এমনো হ'তে পারে যে এই বিচারপদ্ধতিটার মধ্যে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ রয়েছে। যারা ধরিত্রীর ভারবৃদ্ধি করছে ভারের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তিটা হয়তো তাদেরি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, কেননা দেবশরীরের কোনো ভার নেই, পুণ্যাত্মা

ব্যক্তির ভার কম, আর সঙ্গীত যে শ্রেষ্ঠ চারুকলা, তার কারণ তার মিডিয়মটি একেবারেই নির্ভার। এই জাতীয় কবিতার রস বহন করে পাঠকের চিত্তে নিয়ে যাওয়া বোধ হয় সমালোচকের শক্তির বাইরে। যা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া যায় তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু যা ধরা ছোঁয়া যায় না, "পরশ নাহিক সয় এত সুকুমার", তাকে অন্যের কাছে হাজির করা অত্যন্ত কঠিন। এই কবিতা সূর্য্যাস্তপারের সৌন্দর্য্যলোকের স্বর্ণবীণায় রচিত রাগিণীর একটি ছিন্ন তানকে আমাদের অন্তরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমাদের অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল ক'রে তোলে।

এ কবিতা পড়বার সময় মনে হয় কবির সোনার কাঠির পরশে যেন হঠাৎ আমাদের জীবনের পর্ব্বতপ্রমাণ গুরুভার খসে পড়ল; আমরা যেন সেই সৃষ্টিপ্রত্যূষে ফিরে গেছি যেদিন প্রণয়ীযুগল স্বর্গরাজ্যে বাস করত, যেদিন সভ্যতার পুঞ্জ পুঞ্জ জঞ্জালের জাল জীবনকে ছেয়ে ফেলেনি, যে দিন আঘাত সংঘাত, বিরোধ বিক্ষোভ, উদ্বেগআশঙ্কার ছায়ামাত্র কোথাও ছিল না; জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তা আয়াস প্রয়াসের ভিতর দিয়ে পেতে হত না, তা পাওয়া যেত বিধাতার হাতের মুক্তদান হিসেবে। সারা বিশ্ব ছিল যেন একটি বাসর-ঘর; বিশ্ববীণার হাজার তারে যে হাজার রাগিণী ধ্বনিত হত প্রণয়ীযুগলের মিলনসাধন ছাড়া তাদের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। দক্ষিণ পবনে লীলায়িত নারিকেল সুপারির জড়িত ডালের মর্ম্মরমুখর ছায়া তাদের মনে সম্মোহন বিস্তার করত, বিকেলের সোনালি আলোর অবিরল বিগলিত শীকরবর্ষণে তাদের মন ব'য়ে যেত "তরল আনন্দভরে নির্ঝরের মত," তাদের মন পরস্পরে মিশে যেত উচ্ছলস্রোতের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে, ঝলকে ঝলকে; পশ্চিমদিগ্বধূ তার রঙের বাক্সটিকে সায়াহ্নের আকাশে একেবারে উজাড় করে দিয়ে তাদের হৃদয়ে রঙের দেয়ালি জেলে দিত; এলোমেলো দখিনা বাতাস তাদের হৃদয় ভরে দিত বসন্তের চাঞ্চল্যে; হাল্কা পরীর মত হলদে চাঁদ তাদের রক্তের নদীতে জোয়ার এনে দিত; আর তারা একটা ব্যাকুল আবেশভরে পরস্পরের মধ্যে মিশে যেতে চাইত ('আর একটু কাছে এসো, হাতে রাখো হাত')।

নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে দৈত্যপুরীর বীভৎসবিকট আয়োজন প্রয়োজনের মধ্যে বন্দী সুকুমার দেবশিশুর চাপা কান্নার স্বর শোনা যায়।

আঁটোসাঁটো ছোটো ফ্ল্যাটে আমাদের বাসা,
ঘরে বসে পাশের বাড়ীর গ্রামোফোন,
ঝাঁকে ঝাঁকে প্ল্যাকার্ডের শকুনের পাখা
আমাদের দিনের মুখেরে ঢেকে দেয়।
আমাদের দিনগুলি গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে ভেঙে যায়
ট্র্যাফিকের চাকায় চাকায়।

শেষ ছত্রের প্রসারিত যৌগিকস্বরের দীর্ঘতায় একটি সুচিরসঞ্চিত দীর্ঘশ্বাস সকরুণভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

'পদ্মা' একটি পরম উপভোগ্য কবিতা। স্থানাভাবে তার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের প্রলোভন ত্যাগ করতে হল। এ কবিতা শুধু ছড়ার ছন্দে রচিত নয়, ছড়ার পলাতক সুরটি এর মধ্যে ধরা পড়েছে। এতে এমন সকল ছত্র রয়েছে, যা দেখে মনে হয়, তা যেন কোনো আধুনিক কবির রচনা নয়, তা যেন লোকমানসের আপন সৃষ্টি।

মস্ত বড়ো নদী পদ্মা, যেন সমুদ্দুর।
দুই হাতে সে জড়িয়ে আছে ঢাকা ফরিদপুর।

যে গণিত-অতীত বিরল ক্ষণটিতে বঙ্গমাতার সন্তানেরাও জঙ্গম জীবনের জন্য আকুল হয়, 'ঘ্যাল-এ' কবিতাটি সেই ক্ষণটির একটি সুন্দর ছবি।

স্বৈরী মেঘের পূর্ণস্বরাজ
দেখেই কি ওরা এমন দরাজ,
স্বেচ্ছাচারের উচ্চচূড়ার জঙ্গমতা
বঙ্গমাতার সন্তানেরাও আজ কি পেলো?

এ কবিতায় আমাদের জীবনের নানাবিধ মিথ্যাচরণের উপর কবি তাঁর মর্মান্বেষী তীক্ষ্ণ আলো ফেলেছেন।

যে-ভয়ে নিত্য মেনে চলি মহাজন,
যে-ভয়ে কখনো গান্ধির কভু অরবিন্দের চরণশরণ,
ত্যাগের কুম্ভা যোগের পন্থা মানসবরণ
দিশি সিনেমায় ঋষিমহিমায় ইচ্ছাপূরণ।

"জলাপাহাড়ে কুয়াশা" কবিতায় কুয়াশাবর্ণনায় একটি শক্তিগরিষ্ঠ কবিকল্পনার নিঃসন্দির্গ্ধ পরিচয় পাই। 'জোনাকি'তে কলকাতায় জোনাকির আগমনের অসামঞ্জস্যটি বেশ উপভোগ্য। কলকাতার আসবাবঠাসা গুমোট ঘরে জোনাকি যেন সুরলোকের একটি স্নিগ্ধ পরশ ব'য়ে আনে।

কোনো গ্রীক আলঙ্কারিক বলেছেন, All consummate poets are consummate artists. এ নিয়মের ব্যতিক্রম এতই বিরল যে একে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। প্রায় কোনো বড় কবিই "তনুবাগ্‌বিভব" নন। 'দময়ন্তী'র কবিও শুধু বড় কবিই নন, তিনি বড় শিল্পী-ও, বড় ভাষাশিল্পী, বড় ছন্দঃশিল্পী। শব্দচয়নের শিল্পিক সুষমা প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়, আটপৌরে শব্দগুলিও সাজানোর গুণে অপরূপ হ'য়ে উঠেছে। এ বইএ ভাষা এমন একটা সমন্বয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে যে মহাজন ও হরিজন পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিশিয়ে চলেছে। একটা উদাহরণ মাত্র এখানে তুলছি।

কবে হলো নির্বাসন'
সে সহজ, স্বাধীন জীবন থেকে

গম্ভীর, সুস্থির
ধুতি পাঞ্জাবির
ইস্ত্রি-করা ভদ্রতায়।

এ যেন বাঘে বলদে একঘাটে জল খাচ্ছে। শক্তিমানের ছত্রতলেই এ জিনিষ সম্ভব। বিন্যাসকৌশলে এমন সব বাক্‌পর্ব রচিত হয়েছে, যাবার বার আবৃত্তি করেও যেন আর আমাদের তৃপ্তি হয় না; আমাদের মন বলে "না জানি কতেক মধু এর মাঝে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে।" বাংলা ভাষার ভাণ্ডার অফুরন্ত—একদিকে সংস্কৃতভাষার অসীম, অমূল্য ঐশ্বর্য্যরাশি, অন্যদিকে সাতকোটি বাঙালীর রসনার রসে অভিষিক্তা চিরশ্যামল "ফ্রেজ ইডিয়মে"র অপরিমিত সম্ভার; বাংলা ভাষার অনন্যসাধারণ সমন্বয় ক্ষমতা এই দুই মহাদেশের মধ্যে মিলনসেতু রচনা করে আনাগোনার পথটি উন্মুক্ত করে রেখেছে। কবি এ দুটি উৎসের কোনোটিকে অবহেলা করেননি। দময়ন্তী কাব্যগ্রন্থের ভাষা আগাগোড়াই কবির ভাষা। কবিতা ও বণিতার আত্মপ্রণয়বচন হচ্ছে "বিভ্রমো হি প্রিয়েষু"। কবির ভাষায় এই বিভ্রমচ্ছটার কোথাও অভাব নেই। সেই গরুত্মতী বাক্‌ যার পাখার স্পন্দনে কল্পনালোকের দ্বার স্বতঃই অবারিত হয়, তার সাক্ষাৎ পাঠক এ বইএ প্রায়ই পাবেন। নীচে দু একটি নমুনা দেওয়া হল।

"বিলোল আকাশগঙ্গা
ঝরে না ঝরে না আর নীহারিকাস্বপ্নাকুল উৎসুক নিশীথে।"
"কোনো নিদ্রাহীন রাতে,
আমারো শরীর যেন মুঞ্জরিত হ'তে চায়
আকাশে জ্যোৎস্নাতে"
"আমাদের হৃদয়ের
বসন্তবেলায়, যৌবনের বিবাহবাসরে…"
"মানুষের মন শুধু জানে
দুর্জ্ঞেয় মুক্তির টানে
আকাশে-আকাশে ব্যাপ্ত হ'তে,
অনির্বচনীয় অন্ধকারে, অনিশ্চিত অপূর্ব আলোতে।"

আলঙ্কারিক বলেছেন, কবির শক্তির অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে জোর কলমের (audacity of speech) ব্যবহারে। জোর কলম ব্যবহার ক'রে সামলাতে পারেন তাঁরা, যাঁরা বড় কবি; অক্ষম কবিরা বড়দের দেখাদেখি যখন ও পথ ধরেন তখন তাঁরা একেবারে নাজেহাল হন। জোর কলমের স্বভাব হচ্ছে সে নিজেকে বড় বেশী জাহির করে। কিন্তু জোর কলমের বহুল প্রয়োগ সত্ত্বেও মহাকাব্যের ভাষা, উপমা, অলঙ্কার সবই আত্মগোপন করে বিদ্যমান থাকে। এ অসঙ্গতির মীমাংসা কোথায়, এ প্রশ্ন আলঙ্কারিকের মনে উঠেছে। তিনি বলেছেন যে চিত্রকলায় দেখা যায় একই সমতলে

আলোছায়া দুই আলাদা আলাদা রঙের সাহায্যে চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু যারা দেখে তাদের চোখে আলো প্রথম এসে ঠেকে, শুধু তাই নয় মনে হয় আলো যেন অনেক কাছে রয়েছে কিন্তু রস যখন দ্যুতিমান হয়ে প্রকাশ পায়, তখন ভাষার সকল আড়ম্বর সেই আলোয় ঢাকা পড়ে যায়। যে অবগুণ্ঠনে জোর কলম ঢাকা থাকে সে হচ্ছে আলোকের অবগুণ্ঠন—"privacy of glorious light." কবি এ বইএ জোর কলম অনেক জায়গায় ব্যবহার করেছেন কিন্তু তারা রসের প্লাবনে ডুবে রয়েছে, কোথাও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই। একটি উদাহরণ দিচ্ছি

কী সুন্দর তুমি!
তোমার শরীর যেন পালতোলা নৌকার মাস্তুল
ছল্‌ছল্‌ জলের ঢেউএর মত চুল।
চলো, চলো! রুপালি শাড়ির
আঁচল উড়িয়ে দাও দক্ষিণে হাওয়ায়
দিগন্ততৃষ্ণায় ফুলে-ওঠা উৎসুক পালের মত।

কবি যে পরিবেশে এ ছত্রগুলি স্থাপন করেছেন একবারো মনে হয় না যে বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। বিকেলের যে রূপকথা-দ্বীপ সে তো কোনো ভৌগোলিক স্থান নয়। মোহিনীর দীর্ঘবিসর্পিত তনুযষ্টি, এলায়িত তরঙ্গায়িত অলকরাশি, দক্ষিণপবনে লীলায়িত অঞ্চলপ্রান্ত—এদের ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতই সেই স্বপ্নলোকের সন্ধান দেয়, এই মায়াতরণীই তো সেখানে পাড়ি দিতে পারে। উপনিষদ বলেছেন জোর কলম সেইখানেই সার্থক যেখানে আভ্যন্তরীণ তাগিদে তার জন্ম, অন্তরের সত্যোপলব্ধিতে তার প্রতিষ্ঠা—এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি।

সব সাহিত্যেই উপমার ব্যবহার হয় উপমানের আলোতে উপমেয়কে আলোকিত করার জন্য। কিন্তু বড় বড় কবি মাঝে মাঝে এমন উপমা প্রয়োগ করেছেন যেখানে উপমান উপমেয় কে যে কার উপর আলো ফেলছে, কে যে কাকে অলংকৃত করছে, তা বলা কঠিন। তারা পরস্পর পরস্পরকে আলোকিত করে, তাদের মধ্যে একটি "অন্যোন্য ভূষণভূষ্য ভাব" রয়েছে। অশোককাননে বন্দিনী সীতার বর্ণনায় বাল্মীকি বলেছেন

সা প্রকৃত্যৈব তন্বঙ্গী তদ্বিয়োগাচ্চ কর্শিতা
প্রতিপৎপাঠশীলস্য বিদ্যেব তনুতাং গতা।

এখানে সীতার করুণ অবস্থাটি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু শুধু কি তাই? প্রতিনিয়ত অধিজ্যা-অবস্থায় থাকলে মানুষের মন যে কেমন রুগ্ন, হীনবল হয়ে পড়ে এবং বিজ্যত্ববিলাসে আমাদের অন্তরাত্মার যে মহীয়ান্‌ আত্মলাভ ঘটে,, কবিগুরু কি তাও অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তোলেন নি? ভট্টবাণ যেখানে অচ্ছোদ সরোবরের বর্ণনায় বল্লেন, "যৌবনমিবোৎকলিকা-বহুলম্‌", সেখানে কি তিনি কেবল অচ্ছোদসরোবরের অগণিত বিকাশোন্মুখ

মুকুলগুলিরই বর্ণনা দিয়েছেন? যৌবনে যে শত শত আশা "পুষ্পপ্রায় বিকশি উঠিতে চায়", তাদের উপরও কি তিনি তাঁর দরদে ভরা স্নিগ্ধ আলোটি ফেলেন নি? দময়ন্তী কাব্যগ্রন্থে পাঠক এ জাতীয় উপমার সন্ধান পাবেন। "সন্তানেরা দগ্ধ ধান্যমঞ্জরীর মত" এই ছত্রটিতে দগ্ধধান্য-মঞ্জরী কৃষকের হৃদয়ে যে বিহ্বল হাহাকার তোলে সে কথা কি বলা হয় নি? "মৃত্তিকায় প্রতিশ্রুত যেমন কৃষক"—এর মধ্যে বাংলার কৃষকের মাটির প্রতি যে অনাদিকালীন সকরুণ অন্ধ আসক্তি তা নিঃশেষে প্রকাশিত হয়েছে।

'দময়ন্তী'তে সব রকমের ছন্দই আছে এবং সব রকমের ছন্দ রচনাতেই কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এর অধিকাংশ কবিতা পয়ার ছন্দে রচিত। 'দময়ন্তী'র পয়ারকে বাংলা পয়ারের সেরা নমুনা হিসেবে নেয়া যেতে পারে। পাঠক এর মধ্যে বাংলা পয়ারের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের আস্বাদ পাবেন। যুগ্ম মাত্রার পর্ব্বের যথাযথ ব্যবহার বাংলা পয়ারকে দেয় অবিচ্ছিন্ন গতিশীলতা; অনুপ্রাসের বিচিত্র বিন্যাস দেয় একটা মোহময় কল্লোল; দৃঢ়ধ্বনি যুক্তবর্ণের নিপুণপ্রয়োগে বাংলা পয়ার "মাধুর্যে গাম্ভীর্য্যে, ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে, তরঙ্গে গর্জ্জনে ও আলোচ্ছটায়" সমুজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে; অসমমাত্রিক পর্ব্বসমূহের চমকপ্রদ অন্ত্যমিল বাংলা পয়ারকে ক'রে তোলে নৃত্যশীল, ঝংকারমুখর। কবি অনুপ্রাস নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, কিন্তু তা কোথাও কাষ্ঠানুপ্রাসে পরিণত হয়নি; মিল গরমিলের আলোছায়ায় অনুপ্রাসের সৌকুমার্য্য ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। উপনিষদ বলেছেন আচ্ছন্ন করার ক্ষমতাতেই ছন্দের ছন্দত্ব। বাংলা পয়ারের অখণ্ড কলধ্বনি ও অনুপ্রাস-জনিত মোহময় কল্লোল আমাদের চিত্তের উপর যে সম্মোহন বিস্তার করে, তাতে চিত্তবিক্ষেপের সকল পথ নিরুদ্ধ হ'য়ে যায়, এবং আমাদের চিত্তবৃত্তি একটি মাত্র ঈপ্সিত খাতে সতেজে বয়ে যাবার অবকাশ পায়। এ বইএর যে কোনো পাতা খুললেই পাঠক এর উদাহরণ পাবেন। পয়ারে রচিত বাংলা কবিতার কত বিচিত্র রূপ। কোথায় বালিকার ন্যায় চপলা, কোথাও মহিষীর ন্যায় গম্ভীরা; কোথাও জনপদবধূর ন্যায় ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞা, প্রীতি-স্নিগ্ধ লোচনা, কোথাও বিরহিণীর ন্যায় বেণীভূতপ্রতনুসলিলা; কোথাও সমদা প্রমদার ন্যায় ত্বরিতগমনা, অনির্ম্মলা, প্রবৃদ্ধবেগা; কোথাও সুহৃষ্টা কামিনীর ন্যায় বিদ্দ্যুদ্দামস্ফুরিতনয়না, বিবৃতজঘনা, দর্শিতাবর্ত্তনাভি; বিজোড় মাত্রার শেষে আকস্মিক যতিপতনের ফলে কোথাও বিক্লবা অভিসারিকার ন্যায় "বিষমে উপলে স্খলিতসুভগা"। পয়ারের যে কত হরেকরকমের রূপ হ'তে পারে বলে তা শেষ করা যায় না—"ইয়ত্তয়া ন পরিচ্ছেত্তুম্‌ অলম্‌"। বাংলা পয়ারের সম্বন্ধে বোধ হয় বিনা অত্যুক্তিতে বলা চলে— the finest metre we know.

বেল ফুলের তর্ক

অমিয় চক্রবর্ত্তী

ধুলো থেকে তুলে নাও, প্রক্ষিপ্ত কুসুম
প্রাত্যহিক রোদে এই অন্য পরিবেশে
পায় না আপন দিন।

বড়ো রাস্তার পাশে ব্যর্থ হয়ে থাকে
অচল পর্যায় তার ;
ভিন্ন সময়ের দূরে চলে যায় চাকা
গাড়ি ঘোড়া পদাতিক : শুধু কি ধুলোয়
প্রবল কালের অবান্তর
প্রান্তিক জগৎ তার ? পুষ্পিত মূর্ছায়
বাস্তব জগৎ থেকে নির্বাসন—
শুধু সূর্যদাহে
ছন্দ-ছেঁড়া মূর্তি দিয়ে বাহিরের তেজস্ক্রিয়তার
প্রমাণ করতে সে এল পেলব রঙীন ব্যতিক্রম,
পেল পৃথিবীর বনে অঙ্কিত সাদার গন্ধসাজি ?

যাকে ভুলে ফেলে দেয় হাটে যেতে ব্যস্ত উড়ে মালি
ডালি থেকে, সাঁকোর পশ্চিমে, টুকরো ঘাসে
ভাঙা টিন, দগ্ধ কাঠ, স্তূপান্বিত ভ্রষ্টতার কোণে—
তার স্থির প্রাণস্পন্দ
নয় ইঁট, কাগজের নিস্তব্ধ মৃত্যুর পরিমিতি।

সবুজ আকাশে তার মর্মর সমাজে
বৃন্তের একক বৃক্ষলোকে : সৃষ্টিসুতো
বাঁধে তাকে জীবনের মহামৃত্তিকার সঙ্গে ;
উজ্জ্বল কাজল হাওয়া বয় প্রাণভরা শূন্য থেকে ;
আনে তাকে চন্দ্ররাতে ধীর আবর্তন
ষোলোটি পক্ষের আলো-দল ;
জ্যোতির্ময় অনন্ত বৃক্ষের
সখ্য তার তারার স্তবক সাদা ফুলে।

ফুলের আপন কালে তাকে দেখো যদি
মর্ত্যের ধুলোর পারে, ধুলোরই আশ্চর্য সৃষ্টিরূপী ;

দেখার মন্দিরে যদি পাও তার স্বীয় পরিবেশ ;
যদি জানো তার মৃদু সময়ের অন্তহীন কথা,
তবে কবিতাকে, তুমি ব্যস্ত-সামাজিক
দেবে তার আকাশের বহুমূল্য সূক্ষ্ম দাম
সুগন্ধি বাসন্তী প্রেমে, নেবে কণ্ঠহারে,
—প্রসন্ন শক্তির ভিন্ন নানা-রূপে
প্রাণের সংসারে বিনিময়—
সেই দামই দিয়ে থাকো, তাই
না জেনেও ফুল কেনো, কাব্য পড়ো, কেবল খুসিতে॥

চারটি কবিতা

মৃত্যু

নরেশ গুহ

মৃত্যুর পাখী ছায়াতলচারী,—পলকে
পৃথিবীর বনে উড়ে উড়ে বসে, রাঙা জীবনের ফলকে—
অগোচরে ফেলে ছায়া ;
কতো হাঁস ওড়ে সাদা দিঘিটায়—
বাঁকা রোদ পড়ে আপন ভিটায়—
—ছেড়ে যেতে হবে ?—
মনে হয় সেটা মায়া।

বর্ষার ঘাট জলে ছল্‌ছল্‌,
অনুরাগে আঁকা চোখের কাজল
ভরা বুক কাটে সাঁতার ;
পিতলের হাঁড়ি—বিছানা চাদর
পোষা ভেড়া গরু কুড়ায় আদর,
ঘুম নেই, শুধু স্বপন বিছানো ঘর সংসার পাতার।
এরি মাঝখানে চলে আনাগোনা
ছায়াতলে আরো ঘন ছায়াবোনা
—মুছে ফেলবার নিষ্ঠুর এক জটলা ;—
যা হবার হয়—যাবার সময়,
হাটে যায় লোক, হেসে কথা কয়,
থাকার যা—থাকে,
এ-মাটির মন অটলা॥

একটি প্রেমের কবিতা

তোমার যৌবনলোক দেহের মনের
অনিঃশেষ প্রাণধারাবহ হোক
অবারিত শোক
মর্ত্যলোকের—সইবো।
ইতস্তত আলো—নিভে যায়
ছায়ারা ঘনালো
স্তরে স্তরে সজ্জিত দুর্য্যোগ
যদিও ভয়াল—সইবো।
অগ্নিবর্ণ আলোর গোলোক—দূরে ;
মর্ত্য ট্রেনের গতি স্তব্ধ হোক ;
পরাস্ত মাঠের সুরে
চিরন্তন ঘুম—
রক্তের কুঙ্কুম—
স্বস্তিহীন তন্দ্রা—ক্ষণস্তোক হোক—
সইবো।
তোমার যৌবনলোক দেহের মনের,
অপরাজিতার ঘননীলদীপ্তি-সহ হোক নিষ্ঠুর ক্ষণের।

আশ্বিন

আশ্বিন যেন ছুটির দেশের 'রানার'—
কাঁধে ব'য়ে আনে ঝোলাখানি তার
হাল্কা খবর আনার।
আর ব'য়ে আনে নীল পরীদের ওড়না—রোদের মিষ্টি।
আর ব'য়ে আনে কাশের বনের—শ্বেত হাস্তের বিষ্টি।
ঝুমুঝুম্ বাজে ঘণ্টার ধ্বনি
চলা বেধে যায় ঘাসে :
খিল্‌খিল্ ক'রে দোরের পাশেই প্রাণ খুলে যেন হাসে।

ভোর

বাঁধা চন্দনা বন্দনা গায়
তোমার রাতের সাড়ী শুকায় ভোর হাওয়ায়।
চোখ যে তোমার কথা কয়, কথা কয়—
যদি ম'রে যাই এই ভোর যেন পাই
দিন নয়—রাত নয়॥

বন্দিনী

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রশান্তি আসিল নামি পরিশ্রান্ত ধরণীর বুকে
ধূলায় ধূসর দিনে পূর্ণচ্ছেদ আজিকার মত,
গোধূলিবেলার শেষে নামিল সন্ধ্যার অবসাদ
দিকচক্রে অবসন্ন আকাশের ছায়া অবনত।

এবার আসিবে রাত্রি, এখনি ঘনাবে অন্ধকার
বিষণ্ণ মুহূর্ত্তগুলি আতঙ্কে উঠিবে শিহরিয়া
মৃদু পদধ্বনিগুলি হৃৎপিণ্ডে করিবে আঘাত
দুর্দম কামাগ্নি জ্বালা উষ্ণ বক্ষে কে রাখে ধরিয়া ?

তিলে তিলে উজ্জীবিয়া আপনার মনের ইন্ধনে
যে বহ্নি-প্রবাহ বহে প্রতি মজ্জা প্রত্যেক শিরায়
ওঠে জলে তারি জ্বালা, নয়ন হইতে তপ্ত শিখা
এমনি আঁধারে তার হিংস্র-সন্ধানে বাহিরায়।

নখরে নখরে তার কামাগ্নির প্রখর প্রদাহ
সুকোমল তনুদেহে রেখে যাবে নিষ্করুণ জ্বালা
এ রাত্রির অন্ধকারে পলাতকা পালাবে কোথায়
কামান্ধের ষড়যন্ত্রে অবরুদ্ধ আজি পান্থশালা।

আঁধার হইল রাত্রি কী কদর্য্য কুৎসিত আঁধার
ম্লান হয়ে আসে আলো দীপ্তবুদ্ধি নক্ষত্র-সভার,
বনে বনে কানাকানি, হাওয়াতে কী অস্ফুট ইঙ্গিত
চক্রান্ত চলিছে আজি অমাবস্যা জন্ম-বিধবার।

বন্দিনী ধূলায় লুটে, এলোকেশে জ্বলিছে জোনাকি
স্খলিত বসনপ্রান্ত বজ্রমুষ্টে কাঁপিছে সন্ত্রাসে,
বিকৃত পশুর মুখে উচ্ছ্বসিত সফেন মত্ততা
অনাঘ্রাত পুষ্পে দহি' বহ্নি জ্বলে বিকট উল্লাসে।

জৈব

হরপ্রসাদ মিত্র

আমার দিকে চাও
আমি গীতশ্রী বীণা রাও।
আমার সর্বাঙ্গে যৌবন,
মার্জিত মন।
জগতে ঘোরতর যুদ্ধ,
ইতিবৃত্তে বিবর্তন,—
তা'তে আমার কি?
আমি গীতশ্রী।
একটি অখণ্ড জীবপ্রাণ।
আমার মধ্যে নৈসর্গিক গান।

আদিপ্রাণ এবং যুবতী,
কিশোরী এবং জরতী—
সবাই যে আইনে বাঁধা,
তাইতেই হাসা-কাঁদা।
জীবপর্যায়ের ঐতিহ্যে
আমি মানবী।
ফাল্গুনে কাঁপি,
মাঘে শুকোই,
নিতান্ত দৈহিক প্রেরণায়
পুরুষের বুকে লুকোই।

বীজ থেকে শস্যে,
ফুল থেকে ফলে,
সম্ভাবনা থেকে প্রকাশ্যে,
—এই তো আমার অভিযান।
অবিনশ্বর নৈসর্গিক গান।

মানুষ কি অতিমানুষের সন্ধানী?
কে ঠিক?—রুষ না জার্মানি?
তা'তে আমার কি?—কি জানি!

অস্তিত্বের আনন্দ এবং বেদনা
বাসনা এবং বঞ্চনা,
সমস্ত আমি সইবো
কারণ, আমি জৈব।

এখন ফাল্গুন,
আমার দিকে চাও,
আমি গীতশ্রী বীণা রাও।

এই পথ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

ঝল্‌মলে নুড়ি বিছানো এই সে পথে—
তোমার কাঁকন বেজেছে অনেকবার;
স্তাবকের মত নীল-মায়া-ঘেরা রাতে
গ'লে পড়েছিল চাঁদের রূপোলি ধার।

গহন বনের বুকচেরা পথপাশে—
ঘাসেরা সবুজ বিলায় দরাজ হাতে
তোমার কাঁকন স্মৃতিপথে আনে যেন
কত ফাগুনের ফেনিলোচ্ছল রাত।

তারাদের নীল ছায়া-ঢালা এইখানে
জোনাকী কী যেন খুঁজেছে আকুল হয়ে,
হাল্‌কা হাওয়ার ডানায়-ডানায় উড়ে
ফুর্‌ফুরে ফুল সুরভি এনেছে ব'য়ে।

স্বপন পরীর শিথিল আঁচল খানি
খুলে খুলে গেছে এই পথে চুপে চুপে;
শোণিতে আমার হাজার ঢেউয়ের দোলা,
আগুন লেগেছে আমার কামনা-ধূপে।

ঝল্‌মলে নুড়ি বিছানো এই সে পথে
তোমার কাঁকনে ফাগুন জেগেছে কত!
দু'ধারে ফুলের লীলায়িত অক্ষরে
জেগে আছে যেন তোমার স্মৃতির মতো।

সায়ন্তন

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

আজি শুক্লা তৃতীয়ার সন্ধ্যা আনে মনে
প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা।
রজনীগন্ধার ভাষা
অন্ধ বায়ু বহে প্রাণপণে।
নামহীন কবরের সন্তপ্ত নিশ্বাস
মহীরুহ মূঢ় মনে শোনে।
একান্ত গোপনে
দুর্লভের পিছে ফেরে প্রাণের দুরাশা।

পুকুরের কালো জলে
অথৈ জিজ্ঞাসা দোলে,—
আকাশের জলছবি লোল-লঘু লহরের ঘায়
ক্ষণে ক্ষণে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়
দীর্ঘিকার দীঘল নয়নে!
গূঢ় কানে শোনে
দুর্ব্বোধ অন্তর;
উদাসী প্রান্তর পড়ে মোহের মন্তর।
কালো জল রহস্য-কুটিল;
কালো বন প্রাণে নামে গহন জটিল।

নির্ব্বেদ জিজ্ঞাসা ওড়ে
প্রান্তরের প্রতি মোড়ে মোড়ে
মসীকৃষ্ণ বন-বীথি প্রশ্ন নাহি করে
নীলপঙ্কে রজনীর অঙ্ক যায় ভ'রে!
নড়ে ধীরে সন্ধ্যাতীরে জিজ্ঞাসা-কেতন
বিস্ময়স্তম্ভিত যত জড় ও চেতন।

পথি

কানাই সামন্ত

নাই নাই নাই—
আকাশঅঙ্গনে নাই,
চরণের চিহ্ন পথিকের।

সূর্য চন্দ্র তারা
অন্ধ অনুসন্ধানে তাহারা
চক্রপথে মরে ঘুরে ঘুরে
কল্প কল্প দূরে দূরে
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের শিরে
দিনের দীপ্তির স্রোতে রাত্রির তিমিরে
বিভ্রান্ত সদাই।

আকাশ অঙ্গনে নাই
চরণের চিহ্ন পথিকের—
নাই নাই নাই।

প্রশ্ন

কানাই সামন্ত

খবরের কাগজেতে জানি
সত্য শিব সুন্দরের মধুমূর্তি বাণী
তুচ্ছ করি' যূথবদ্ধ দুর্মদ মানব
করে হানাহানি
পূর্ব ও পশ্চিম সিন্ধুতটে।

তবু মোর দ্বারের নিকটে
রোমাঞ্চিত এ-বনপুলক।
দ্যুলোক ভূলোক হেসে চায় পরস্পরে
উৎসবসজ্জিত বনভূমে
কাঞ্চন অরুণ শ্যাম সবুজের ফাঁকে।
কতদিকে কত পাখি ডাকে।

বিষবাষ্পে অগ্নিস্রোতে
নিজ কর্মদোষে
যদি বা মানবজাতি ধরাপৃষ্ঠ হতে
মুছে যায়,—
তারো পরে
শুকতারা সন্ধ্যাতারা প্রশান্ত অম্বরে
দেখা দিবে নাকি?
ডাকিবে না পাখি?
প্রতি প্রাতে প্রণয়ের রাখী
সমুদ্রবসনা এই সুন্দরীর করে
বাঁধিবে না নবসূর্যকরে?

অকাল রোমান্টিক

মুকুলচন্দ্র চক্রবর্তী

শুধু কি আমার ক্ষণিকের বিস্মৃতি ?
সোনার কাঠিতে কলকাতার এই ইঁট ও পিচের মরু
গলে হ'ল রূপকথা—
হিজলমদির সেদিনের সঞ্চয়
শুধু কি আমার ক্ষণিক প্রমত্ততা ;
তুমি আমি আর খোলা জানালার ওপারে যে ছিল চাঁদ—
এ মারী দিনে কি অলীক হ'ল সে ভ্রমরদিনে স্মৃতি ?

দুচোখে তোমার শোনালে তখন রাজহংসীর গান—
মেঘের পরীরা তাই তো আমায় নিয়েছে পাখায় তুলে,
নিয়েছে সে মেঘে যে মেঘ ছড়ায় শুকনো বনের ঘ্রাণ,
যে মেঘেতে বোনা সন্ধ্যাস্বপনসোনার অস্তাচলে ।

আমার মেঘেরা এবার তোমাতে জাগায় না কেন সাড়া ?
পৃথিবী কি আজ নিষ্ঠুর মৃত মেরু—
হৃদয়ে তোমার রচেছে কঠিন পাংশু শীতল কারা !

বন্ধ্যা হয়েছে অনেক অনেক রজনীগন্ধা রাত,
মদির দিনেরা ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেল মরে,
বিদ্যুৎবতী মেঘের মেয়েরা বৃথা কটাক্ষ হানে,
মাটির গন্ধে বৃথাই, বৃথাই গাঢ় আশ্লেষ ঝরে—
এখন তো তুমি বধির নিরুত্তর ;
এ রলরোলে কি ভালবাসবার নেই কোনো অবসর,
ভালো লাগবার নেই বুঝি কোন মানে ।

সিমুমের ছোঁয়া লেগে গেছে নাকি মৌসুমি আশ্বাসে
আলেয়া আশায় বৃথাই রাত্রি জাগা—
ঝোড়া হাওয়া বুঝি এ পৃথিবী হতে উড়িয়ে নিয়েছে আজ
মহুয়াস্বপ্ন জড়ানো তোমার আমাকেই ভালো লাগা ।

প্রেমের প্রতি

মণীন্দ্র রায়

জীবনে দিন যদিও আসে,
বহুর মাঝে একা,

সবার ভিড়ে পেয়েছি তার
প্রণয়ঘন দেখা,
তবু তো কোনো আবেগে তার মেলেনি পরিচয় ।
জটিল নানা জরুরি কাজে নিজেরে করি লয় ।

হঠাৎ আজ গভীর রাতে
ক্ষুধিত ডাক দ্বারে
এনেছে এ কী জীবনছোঁয়া
বিরাট বেদনারে !
ভেঙেছে বাঁধ আপন-পর, বুঝেছি যে-বৃহৎ
আবেগে ঘর ছেড়েছি, ঘর ফেরাও সেই পথ ।

উদয়রাঙা প্রভাতে তাই
মিলেছি জনতায় ।
রেখেছি ধ্রুব আশার নীড়
তোমার মমতায় !
সবার ভালোবাসার মাঝে তোমার ভালোবাসা
বিবিধ স্বর-সংযোজনে একটি পাবে ভাষা ।

তিনটি কবিতা

স্মৃতি

রণেন্দ্রনাথ দেব

নিথর আকাশে এলো গোধূলির বিবর্ণ মরণ,
দিনের চুম্বন রাগ চিহ্নহীন চক্রবাল-পারে,
উজ্জয়িনী মিথিলার একে-একে কতো নিষ্ক্রমণ,
তবু এরা বার-বার পিছু ফিরে ডাক দেয় কারে ?

কোনো নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা

অবারিত মাঠ, দিগন্তশায়ী মেঘ,
নিস্তেজ রোদে মৌন বনস্থলী,
শিরশিরে হাওয়া, অকারণ উদ্বেগ,
সহসা পিছনে দেখি,
আলোর বিকারে রুগ্ন শহরতলী ।

যদিচ আকাশে স্মৃতি অন্তঃশীলা,
এই গোধূলিতে ঝোপে ঝিলে নিরালায়
চিকণ তারায়—তারি কথা চমকায়,
পাশে কই শর্ম্মিলা ?
সেদিনের চাঁদ আজ বড়ো কৃশকায়।

জৈব জীবন

একদিন তারা—
পিছে ফেলে এসেছিল মাঠ ঘর গ্রাম,
আর কিছু বা দুর্নাম,
আর সমাজের সস্নেহ পাহারা॥

কে জানে কোথায় হারা গ্রামছাড়া রাঙামাটি পথ।
দূর হতে বুনোগন্ধ আসে,
তারপর বার দুই নড়ে ওঠে রাতের বাতাসে
প্রাচীন অশ্বথ;
ধূমায়িত স্মৃতির সঞ্চয়।
তবুও শিথিল নয়
তাদের শপথ।
তারা দেখে, আকাশেতে মহা ছায়াপথ।

আবার ভুলিছে তারা—
এই বালুচরে
নিয়েছিল কবে যে আশ্রয়,
কবে যে নির্জন দ্বীপ হলো লোকালয়।

এখন তো চেনা নাহি যায়
পূর্ণিমায়,
মীন-কুমারীর দল ঘুমাতো কোথায়
এখন যে ক্রুদ্ধ সাগরের
দিক্ রেখা হলো মসীময়।

ত্রস্তে সবে উঠেছে নৌকায়।
ঝড়ে নিল ঘর
আরো কিছুদিন পরে
ওদেরে নাবিক ক'রে
নিয়ে যাবে চাঁদ সদাগর।

দুটি চিনে কবিতা

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগান্তরের গান

অর্থহীন আমাদের জীবন :
কালো রাত্রির বোবা স্বপ্ন যেন ;
যার আগে ছিল তন্দ্রার জোয়ার,
যার পরেও তন্দ্রা।

ঘন নিঃশ্বাসের মতো আমাদের সভা জেগে ওঠে
আর ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যায়।
বাতাসের মতো ভেসে আসে
আর বাষ্পের মতো মিশিয়ে যায়
আমাদের তন্দ্রার অবকাশে।

আমরা এখন এক সুষুপ্তির মাঝে
বাষ্পীয় আয়ু নিয়ে আছি বেঁচে।
আগুনের শিখারা ঐ লক্‌লক্ করছে
গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।
সময় আস্‌ছে এগিয়ে
আমাদের সুষুপ্তির দিন।

কুয়ো মো-জো

ঝরা ফুলের গান

ফুল ঝরে যায়
ফুল ফুটে ওঠে।
মানুষের স্বপ্নিল জীবনে
সুখ শোক সব ক্ষণিক,
অলীক।

এসো তবে
পূর্ণ করি পানপাত্রখানি।
ভেবে দেখো দেখি
বসন্ত বাতাস যদি অনায়াসে
বৃন্ত হ'তে ফুলগুলি ছিঁড়ে দিতে পারে
তবে কেন বৃথা বারবার
পুষ্পগুলি ফুটে ফুটে ওঠে ?

ওয়াং চি

উর্ননাভ

স্থনীলকুমার বস্থ

হাল্কা সবুজে শোভিত দেয়ালে ড্রয়িং রুমে,
নিরালা কোনের অজেয় দুর্গ গড়ছ বুঝি ?
লুতার স্থতার ব্যারিকেড বুনি দিবস রাতে
কৃপণের মত প্রহরিছ কিগো গোপন পুঁজি ?

তুমি সৈনিক শৈল শিখরে উর্ণচারী,
স্বার্থসমরে যক্ষের ধন রক্ষা কর ;
বাহির হইতে নিজেরে সবলে ছিনায়ে আনি
নিজের গারদে আপনারে বাঁধ নিরন্তর।

অনাদি অতীত হতে হে মৌন উর্ণনাভ !
পৃথিবী দেখেছে স্থগোল তোমার স্থঠাম কায়া ;
চারুচরণের সচকিত-করা সঞ্চরণে
শিহরি উঠেছে সৌধপ্রাকারে তোমার ছায়া।

আপনারে ছিঁড়ি বুনিতেছ বসি রেশমী স্থতা,
কুশলী শিল্পী সম স্থজনের নেশায় মাতি',
হৃদয় কি তব ভবিষ্যতের আঁকিছে ছবি ?
নয়নে জলে কি নবজগতের স্বপন-ভাতি ?

শুধু আমি জানি, তুমি প্রেমময় প্রফেট নহ,
মৌন ধেয়ানে শুনিছ না তুমি দৈববাণী,
অর্ধ-আলোকে রুদ্ধদুয়ার ভজনগৃহে,
নহ পূজালীন মুদিতনয়ন যুক্তপাণি।

তুমি সাবধানী স্থূল জমিদার সূক্ষ্ম দেহ
রুক্ষ হৃদয় অমায়িকতার জরিতে মোড়া।
লোলুপ লালসা বুদ্ধির রাশে বাঁধিয়া রাখি'
জীবনের পাশা সুদূর আশায় সজোরে ছোড়া।

তুমি পুঁজিবাদী, বুর্জোয়া তুমি, কুসীদজীবী,
বাহিরে যে ছোটে আলোর জোয়ার খোঁজ না রাখো ;
হারানোর নেশা প্রলাপিছে যবে জগত মাঝে,
হার-না-মানার মূঢ় অভিমানে লুকায়ে থাকো।

বসন্তের গান

অমিয় ভট্টাচার্য

আজিকার দিনটিতে নতুন জন্মের মত যেন ভুলে যাই
সেই সব আগেকার কাংস্যস্বর আর যত শিশিরের ঘুম.
পিছনের দিকে ফিরে যেন আর ভাবি নাক' কীই বা পেলুম !
পুরানো প্রেমের কুঞ্জে যেন আর আসে নাক' বাসনার লোলুপ কঙ্কাল—
একটু পীতাভ আলো···ভাঙা-ভাঙা জল-ডাঙা অসুস্থ বিকাল !
মহুয়া পাখির মত আজ নীল ভাবনারা বুকে দোলা দেয়,
নতুন পাতার মত কোমল পরশে জেগে উঠেছে হৃদয় ;
কণ্ঠ আজ গান গা'ক বাতাসের বুকে-ভেসে-যাওয়া
বসন্ত-বিলাসী কোনো পাখীর মতন ; অথবা যেমন
ধান-তুলে-ফেলা মাঠে নেমে আসে প্রশান্তির হাওয়া,
অথবা ঘাসের মুখে প্রজাপতি করে যায় পাখার ব্যজন
যে-সহজ ছন্দে, আজ সেই পথে মনকে চালাই।

ইচ্ছা

অমিয় ভট্টাচার্য

আজ এই প্রথম ফাল্গুনে
আমি যদি ফেরিওলা হতুম্
নীল, নীল সূর্যধোয়া জীবনের !
তবে আমার রঙচঙা ঝুলিটা ভরে নিতুম
ঝাঁক-ঝাঁক টিয়াদের নরম পালকে
আর বাঁশিটা বেঁধে নিতুম কোকিলের সুরে,
অনেকদিনের অন্ধকারবাসী চোখ আমার
ডুবিয়ে নিতুম সোনালি আলোয়।
পায়ে বেঁধে নিতুম বেগ
আর নিশ্বাসে ভরে নিতুম মহুয়ার ঘ্রাণ।
হাসিখুসি হাল্কা হাওয়ায় আমি তবে চলে যেতে পারতুম
জীবন হাঁকতে হাঁকতে, মরানদী, শুকনো ফুলের বাগিচা ফেলে
সবার আগে সেই রং-চটা কালো দেয়ালটার কাছে
আর নিচু-নিচু সেই রুটির কারখানার জান্‌লায়।
যেখানে আমার চোখ-ভরা সোনার আলো
মুছে নিতো জানলার অন্ধকার
কোকিল ডাকতো বাঁশিতে, নীল নরম পালক উড়তো বাতাসে,
আর নিশ্চয়ই কতগুলো ঘুমিয়ে-পড়া জীবন
হঠাৎ কী এক চেতনায় জেগে উঠে
আমাকে ঘিরে ধরতো—জড়িয়ে ধরতো।

আসল কথা

শীতাংশু মুখোপাধ্যায়

দিব্যি তো মোটরে করে চল্লে কেতকী,
ফিরিংগি নাচের আসরে।
বীথিকা, সাগরী
(আহা মরি মরি)
নামের বাহারে
তোমরা অজেয় ফৌজ,—
ফিন্‌ফিনে শাড়ী
মিন্‌মিনে কথা,
প্রেমের বাসরে
তোমরা দেখাবে চূড়ান্ত কসরৎ।
কিন্তু তার আগে
নামো তো মোটর থেকে
জানো তো, আমার অনুরোধ
এড়ানো কঠিন বড়ো।
—দাঁড়াও এই ফুট্‌পাথ ঘেঁষে
যেখানে ছেলে-কোলে কঙ্কাল-নারী-ভিখারী
ফ্যান্ নিয়ে ছুটোছুটি করে—
দেখছো তো চেয়ে, বয়স ওদের
তোমার মতোই বুঝি,
যদিও বৃথাই যৌবন খুঁজি ওদের দেহে।
মনে করো কেতকী, তোমার বাবার ব্যবসা মেরেছে ফেল্
কারবার গেল ডকে
করিল ডিক্রি সকলি বিক্রি সত্যি দেনার দায়ে।
তখন তোমার কানুদা, নীলুদা—
কোথায় থাকবে তারা?
কমল-কোমল হাত
সব ঝুট্-বাৎ
তালি-মারা শাড়ি
হাতে ভাঙা হাঁড়ি
এই ফ্যান-চারিণীর মতো।
সুতরাং বলি কেতকী, কবরী,
আসলে তোমরা কে?

যা-কিছু শক্তি সবি তো বাবার কীর্তি
তোমার কোন্‌টা বলো?
শেলি টেনিসনে,
অথবা টেনিসে
এ-সবে তোমার ঝোঁক
বড়াই করেছো কতো,—
আসল কথাটি বুঝে নিয়েছি যে
—সবই ব্যাঙ্কের চেক্।
আসলে তুমি যা,
অমুক গ্রামের বাতাসীও তাই।
বস্তির কলে নিত্য লড়াই
মেয়েরা কলহ করে
অশ্লীলতম ভাষায়।
তুমি কেতকী, সোফায় ব'সে
রুমালেতে মুখ মোছ। (আর জয়েসের বই
পড়ো।)!

আসলে তুমিও পারো গালি
যদি একমাস শুধু খালি
বাসন মাজতে যাও।
কেতকী, কবরী,
আহা, মরি মরি,
তোমরাও কি গো আসলে তাহ'লে
বস্তিবাসিনী সৌদামিনীর মতো?

মরীচিকা

সুরেশচন্দ্র সরকার

বহুদিন পরে আজ এ সন্ধ্যা আমায়
কোন দূরে ডেকে নিয়ে যায়॥

জানি আমি, বিবর্ণ জ্যোৎস্নার
আসিছে ঘোলা জোয়ার ; রাত্রি আসে ; তবু এ সন্ধ্যার
অপরূপ গতমুখ (তোমারি মুখের
যেন মুগ্ধ অনুকার!) টানিছে আমায়
দূর, মৃত অতীতের কোনো এক মায়াবী সন্ধ্যায়॥

আজিও তো সেদিনের সন্ধ্যা-তারা, পিঙ্গল উষর !
মন্থর চটির তলে সহিষ্ণু কাঁকর
ধ্বনি তোলে ; স্বপ্নে দোলে মন ;
সেদিন যেমন ॥
আমি জানি, যেখানে রয়েছো তুমি, সেখানে আমার
শ্লথ হাতে পৌঁছোবে না। সেই দূর দিগন্তের পার
অশ্রুর কলুষে ম্লান। সেইখানে প্রচণ্ড ক্ষুধার
উপশম-শূন্য ক্লান্তি বর্ণহীন
তুলেছে প্রাচীর তুঙ্গ মেঘচুম্বী, মসৃণ, কঠিন ॥

তবু এ উদাস সন্ধ্যা টানিছে আমায়
কোমল স্বপ্নের দেশে।
দেখি চেয়ে, পলাশবনের পাশে
বর্তুল, শোণিম চাঁদ,—বাণভট্টের সেই বৃদ্ধ হাঁস, উঠে আসে
পদ্মমধু-রক্তিম পাখায়
সুকুমার মেঘস্তরে মণিময় দিগন্তের গায়।
এ কারুচিত্রের দেশে নীল শৈল সুদূরে ঘুমায়
চিরদিন ; গোলাপের অশ্রুবাষ্পে আনত আকাশ
ঢাকে তারে চিরদিন ; চিত্রিত অপ্সর-মেঘ
আজো তারে, কী দুর্মর মোহভরে
বৃথা ডেকে ফিরে-ফিরে যায় ॥

ক্ষণপরে দিন হবে শেষ ;
শূন্যের প্রতীক-নাট্যে মুছে যাবে মায়াবর্ণলেশ ;
সুরু হ'বে মূর্ছিত শোকের রাত্রি স্বপ্নহীন ;
জ্যোৎস্নার কুহকে লীন পাহাড়ের মৃত্যুহিম মুখ ;
দূর কুকুরের ডাক ; ক্লান্ত নিস্বনিত ঝাউ ; ঝিঁঝিঁদের মূঢ় একতান ;
জটিল, নির্গমশূন্য, নিস্তব্ধ স্মৃতির বনে
অন্তহীন তোমারে সন্ধান ॥

মধ্যতিরিশ

বুদ্ধদেব বসু

মধ্যতিরিশের ইস্‌টেশনে গাড়ি এসে থামলো।
বড়ো জংশন, লাইন বদল হবে, গাড়ি দাঁড়াবে কিছুক্ষণ।
কালো কাপড় পরা প্রহরী এসে বললে,
'যৌবনরাজ্যের সীমান্ত আমরা পেরিয়ে এলাম,
এবার যাত্রা হবে বার্ধক্যভূমির দিকে।'
কবে বেরিয়েছিলাম বাড়ি ছেড়ে মনে পড়ে না,
কবে বাড়ি ফিরবো তাও জানিনে।
স্বপ্নের মতো মনে পড়ে শ্যামল সমতল শৈশবদেশ,
নীলে-সোনায় মেলামেশা, জাফরানি-বেগনিতে গলাগলি।
কৈশোরদেশটি ছোটো, ঈষৎ-রুক্ষ, বন্ধুর,
অথচ লাবণ্যের আভাস দিচ্ছে থেকে-থেকে,
আহা, যৌবন-সীমান্তের লাবণ্য !
দেখতে-দেখতে যৌবনরাজ্যে এসে পড়লাম,
যেদিকে তাকাই, চোখ আর ফেরে না।
আকাশে বাতাসে অনর্গল অপরিমিত উচ্ছ্বাস।
দিন রাত্রি দুই বোন, আবার সপত্নী,
কেননা দু'জনেই আমার প্রেয়সী।
ওরা দু'জনেই আমাকে ভালোবাসে, আবার ভালোবাসে পরস্পরকে,
তাই তো সন্ধ্যা আর উষা এত সুন্দর।
যৌবনরাজ্যের সবই যে ভালো তা নয়।
অনেকগুলো সুরঙ্গ পার হ'তে হ'লো,
কোনোটা লম্বা, কোনোটা আঁকাবাঁকা, কোনোটা দুর্গন্ধে আবিল।
সে-অন্ধকারে কখনো ভয় পেয়েছি, কখনো রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে নিশ্বাস,
তারপরেই খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এসে
মনে হয়েছে নবজন্ম হ'লো।
এইখানটায় গাড়ির গতি সবচেয়ে দ্রুত,
আহা, কী আনন্দ সেই গতির।
দিগন্তের পর দিগন্ত কেবলই পার হচ্ছি,
সুখদুঃখের হাওয়া বইছে, ভালোমন্দর ধুলো উঠছে,
কিন্তু ও-সব কিছু নয়, চলাটাই সব।
গাড়ির বেগ ক্রমে মন্থর হ'লো,

৬

মনে পড়তে লাগলো, কত বিচিত্র দেশ পিছনে ফেলে এসেছি,
কত জন্ম, কত জন্মান্তর অতিক্রম করলাম।
একনো কি শেষ হবে না? আরো কি চলতে হবে?
ভাবতে-ভাবতে গাড়ি এসে দাঁড়ালো মধ্যতিরিশে।

প্রহরী বললে, 'এখন থেকে কঠিন পথ সামনে, গাড়ি উঠবে পাহাড়ে,
ধীরে এগোতে হবে, এঁকে বেঁকে,
মালের বোঝা কমানো চাই।'
শুনে ভয় হ'লো।
কামরাটা গুছিয়ে নিয়েছিলাম মনের মতো ক'রে,
ঠিক মনের মতো নয়, স্বল্প পরিসরে কতটুকুই ধরানো যায়।
তবু কিছু ছিলো আরামের টুকিটাকি, অনেক দিনের ছোটোখাটো সঞ্চয়,
ফেলে দিতে বলবে না তো?
প্রহরী কামরায় ঢুকে দেখতে লাগলো চারদিকে তাকিয়ে।
বেঞ্চির উপর শুয়ে ছিলো আমার পোষা কুকুরটা,
হঠাৎ উঠে গিয়ে তার পা শুঁকতে লাগলো।
প্রহরী বললে, 'এই কুকুর কেন?'
আমি বললুম, 'যাত্রার প্রথম থেকেই ও আমার সঙ্গী।
উচ্চাশা ওর নাম,
একেবারে সাচ্চা জাতের কুকুর।'
প্রহরী বললে গম্ভীরস্বরে, 'ওকে আর রাখা চলবে না,
নামিয়ে দিতে হবে এইখানে।'
আর-কিছু না-ব'লে হিড়হিড় ক'রে ওকে নামিয়ে নিয়ে চ'লে গেলো।
হায়-হায় ক'রে উঠলো আমার মন।
কত যত্নে লালন করেছি ওকে, কত ভালোবেসেছি,
প্রতিদিন খাইয়েছি নিজের হাতে,
বিরাট সেই ভোজ।
ওর ক্ষুধা প্রচণ্ড, সব সময় যথেষ্ট খাবার জোটেনি,
তখন আমাকেই ছিঁড়ে খেতে চেয়েছে,
শান্ত করেছি চাবুক মেরে।
আকণ্ঠ খাওয়া যখন দিতে পেরেছি,
তখন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে-শুয়ে আমার পা চেটে দিয়েছে,
সেটা মন্দ লাগেনি।
এ দীর্ঘ পথে ওকে নিয়ে কষ্ট পেয়েছি অনেক,
ওর আন্দাজ খাদ্য কোথায় জুটবে, সে এক ভাবনা।

কখনো মনে হয়েছে ওকে নিয়ে ভালো করিনি,
এ যে প্রভুর উপরেই প্রভুত্ব করে।
তবু কেমন মায়া প'ড়ে গিয়েছিলো ওর 'পরে,
গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেছি,
ফেলে দিতে পারিনি।
আজ যখন ওকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো,
কষ্ট তো হ'লোই, কিন্তু সেই সঙ্গে শান্তিও যেন পেলুম।
দেহ-মন হালকা, কামরায় হাত-পা ছড়াবার জায়গা হ'লো,
ওর খাবার জোগানোর ভাবনা আর তো ভাবতে হবে না,
এবারে আরাম করা যাক।
কামরাটা গুছোতে লাগলুম নতুন ক'রে, অনেক সঞ্চয় মনে হ'লো আবর্জনা,
ফেলে দিলুম বাইরে।

ঢং ঢং বাজলো ঘণ্টা,
গাড়ি এখনি ছাড়বে।
প্রহরী আবার এসে বললে, 'প্রস্তুত হ'য়ে নাও।
বার্ধক্যভূমি চোখ ভোলায় না,
সে রিক্ত, সে শুভ্র, সে অকিঞ্চন।
তার গৌরব গিরিচূড়ার স্তব্ধতায়
ঠাণ্ডা আকাশের কঠিন নির্লিপ্ত নীলিমায় তার মহিমা।
অনেক উঁচুতে উঠবে, হয়তো মাথা ঘুরবে, হয়তো বমি হবে,
কিছুই ভালো লাগবে না।
তোমার শক্তি একে-একে খ'সে পড়বে, তোমার ইচ্ছা একে-একে ম'রে আসবে।

যা চেয়ে পেয়েছো তা ভুলে যাবে
যা চেয়ে পাওনি তা আর চাইবে না।'
তাড়াতাড়ি বললুম: 'কত জন্ম কাটলো, কত দিগন্ত কাছে এসে দূরে গেলো,
এখন মনে হচ্ছে ভালো ক'রে কিছুই দেখিনি,
সবই অজানা।
ঐ উঁচুতে উঠে তার সমস্তটা দেখতে পাবো তো?
চোখে পড়বে তো তার স্বরূপ?'
প্রহরী বললে, 'জিজ্ঞাসা করো নিজের মনকে,
কেননা চোখ কিছুই দেখে না, মন সব দেখে।'
ব্যাকুলস্বরে বললুম, 'যদি দেখতে না পাই তাহ'লে কী হবে?
এই ভ্রমণ কি ব্যর্থ হ'লো, বাড়ি ফিরে কিছুই কি বলতে পারবো না?'

উত্তর হলো : 'বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমার মা-কে পাবে,
তিনি কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না
শুধু কোলে টেনে নেন।'
রুদ্ধস্বরে বললুম, 'এর পরে আরো কি পথ আছে ? কবে ফিরবো ?'
উত্তর এলো : 'এর পরেই বাড়ি।'
গাড়ি ছেড়ে দিলো।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

রাজধানীর তন্দ্রা। (এক পয়সায় একটি গ্রন্থমালা) কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কবিতাভবন। দাম চার আনা।

বিষণ্ণ ক্লান্তির ভারে পৃথিবী অবসন্ন। ভবিষ্যৎ দেখা যায় না। সামনে কালো অন্ধকার। ঠিক সেই সময়ে রাজধানীর তন্দ্রা প্রকাশিত হ'ল।

যমুনায় ডেকেছে বান
স্তব্ধ রাত্রে নেই গান, নেই স্লোগান। (রাজধানীর তন্দ্রা)

একথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা সমীচীন যে রাজনীতি কখনো কামাক্ষীপ্রসাদকে আক্রমণ করে না—যুগের অনেক সমস্যাকে তিনি গ্রহণ করেন তাঁর সত্যিকারের কবি-মন দিয়ে, তাই অনেক সমস্যাও তাঁর হাতে প'ড়ে কবিতা হ'য়ে ওঠে।

উত্তপ্ত আকাশে দেখি ক্ষমাহীন সূর্য শুধু জ্বলে
আরো এক সূর্য আছে মানুষের হৃদয়ের তলে।
সে-অগ্নির অভিশাপ দেয় আজ সহস্র ভিক্ষুক :
তোমার স্বর্ণ দিনে শতাব্দীর আগুন লাগুক। (অভিশাপ)

অনেক রকম কবিতা রাজধানীর তন্দ্রায় সংযোজিত হয়েছে। কবি কখনো হ'য়ে উঠেছেন ভাবপ্রবণ, কখনো আত্মবিশ্বাসী, কখনো ব্যঙ্গবীর—কোনো বিশেষ সুর ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন নি। সেটা দোষ কি গুণ বলা কঠিন। 'এই গাছ' এবং 'দরোয়ান'—এ দু'টি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাবুর এক বিটি ভি আছে।
সে ঠাট্টা করতো, হাস্‌তো, ভি
ভিতর ভিতর বহৎ গণ্ডগোল
হামরা ভি বকশিশ্ পেয়ে খুশ।

ডেরাইভারের কাছে
মগর মালুম হয়া নেই তার সাথ ভগবে কভি।
পুলিশ রূপেয়া ঘুষ

লেড়কি লৌটকে এলো
ফুতিসে বাবু আউর লেড়কা দোসরা—দোসরা মহলে বহৎ মদ খেলো
ইসমে তুমার কি, হামার ভি কি ?
হামি জমিদার বাবুর দরোয়ান, দেউড়িমে থাকি। (দরোয়ান)

ছোটো-ছোটো কয়েকটি লিরিক বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে। উদাসীন বিষাদের সুরটি কামাক্ষীপ্রসাদের* হাতে ভালো ফোটে, তবে কয়েকটি কবিতায় অমিয় চক্রবর্তীর প্রভাব বড়োই স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। কামাক্ষীপ্রসাদ দীর্ঘদিন ধ'রে কবিতা লিখছেন—সমসাময়িক কবির প্রভাব এতদিনে আত্মসাৎ করতে পারা কি তাঁর উচিত ছিলো না ?

ঘুমও নগর (এক পয়সায় একটি গ্রন্থমালা)। তড়িৎকুমার সরকার। কবিতা ভবন। দাম চার আনা।

ঘুমও নগর কবির প্রথম বই হ'লেও তাঁর প্রাণের প্রকাশ সহজ এবং স্বাভাবিক।

শিরায় শিরায় যান বাহনের ক্লান্তি নামুক,
রক্তে মরুক দুর্গ মিনার গুদম সারি,
তুখোড় যুগের দোকানদারি—
ঘুমও নগর। (ঘুমও নগর)

বর্তমান যুগকে অন্তর দিয়ে কবি গ্রহণ করেছেন। এবং যুগের তথাকথিত গম্ভীর বিষয়-বস্তুকে ব্যঙ্গ করার চেষ্টা ক'রে প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন।

বাচাল-বিশ্বে অহেতু দোলায়
বেনা বর্নে তুমি মুক্তো ছড়ালে সকাল বেলায়
আজ কেরাণীর ঋণী অন্তরে শোনালে কি নাম,
'রাম রাম বাবু রাম রাম !' (সকালে)

'প্রশ্ন', 'মনে পড়ে', 'শ্রদ্ধা',—এ তিনটি কবিতা সব চেয়ে ভাল লাগলো। স্পষ্ট বোঝা যায় কবিজীবনের একেবারে আরম্ভে তড়িৎকুমার নির্দিষ্ট পথের সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন, এবং বর্তমান বাংলা কাব্যসাহিত্যের মূল সুরটিও তাঁর অজানা নয়।

চন্দ্র সূর্য। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিবাদন গ্রন্থন বিভাগ। দাম এক টাকা।

চন্দ্র-সূর্যের প্রথম থেকে শেষ অবধি একটা সমাজচেতনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিধ্বনি ক'রে তিনি বলেছেন :

নতুন দিগন্ত আছে
মনের স্বর্গ এসে যেখানে নেমেছে

পৃথিবীর 'পরে,
আমি তারে করেছি নিরিখ ঃ
পদক্ষেপে ছন্দ তুলি পাথরে পাথরে
আগামীর এক পদাতিক। (পদাতিক)

কল্পনা-বিলাসের স্বপ্নরচনা আধুনিক মনের কঠোর সংঘাতে লুপ্ত হ'লো; সমাজ-নীতির কঠিন আঘাত-প্রতিঘাতে কবির মনে ভবিষ্যৎ নতুন পৃথিবীর সজীব ছবি ফুটে উঠলো।

ভগ্ন চিত্তে জাগুক চেতনা
পেশীতে পেশীতে আনো সুকঠিন সূর্য এষনা।
সংগ্রাম আজ শোনো আওয়াজ
ঘুম-অরণ্যে ভৈরবী তোলে কুচকাওয়াজ। (কোনো কম্রেডকে : লাল সেলাম)

এর পর রাজনীতি প্রবলভাবে আক্রমণ করল কবিকে—তিনি সে-আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না—তাঁর কবি-মন ক্ষত-বিক্ষত হল, তাঁর কবিত্ব নিহত হলো। দুর্বোধ্য ও দুঃসহ হ'য়ে উঠল স্বচ্ছন্দ কবিতার সুর।

দুর্বোধে (?) দুর্মদ প্রাণ অগ্রসর স্থনির শিবিরে;
কম্রেডি আস্ফোট নয়; আস্কন্দন সুনীর সমরে;
অহিংস কুরুক্ষেত্র! আয়ুধে রক্তাক্ত আয়ু ঝরে;
জনান্তিক শরশয্যা সর্বজয়ী জনতার ভিড়ে। (এ্যান্টি রোমান্টিক)

এটা এ্যান্টি-রোমান্টিক না এ্যান্টি-পোয়েটিক?

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নতুন আঁচড়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। কয়েকটি পাতা, অমৃতকুমার দত্ত। } প্রতিরোধ পাব্লিশার্স, ঢাকা। প্রতি পুস্তিকা ছ' আনা

দুই কবি বন্ধু একসঙ্গে একইরকম চেহারার কবিতার বই বের করেছেন এবং পরস্পরকে উৎসর্গ করেছেন। দু'জনেই সাম্যবাদে বিশ্বাসী এবং ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এর ধ্বংসে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এই বিশ্বাস তাঁদের কবি-মনের গভীরে পৌঁচেছে ব'লে মনে হয় না। তাঁরা যা লিখেছেন তা বেশির ভাগই সংবাদপত্রের প্যারাগ্রাফ কিংবা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের স্লোগান। এ-ভাবে কবিতা হয় না। কিরণশঙ্কর তবু কয়েকটি ভালো লাইন লিখতে সক্ষম হয়েছেন, যেমন—

দেখি দূর শূন্যমাঠে চাষা,
চেয়ে আছে বৃষ্টিহীন দিগন্তের শূন্যতার দিকে।
মাটির জঠরে আছে মৌন, রিক্ত বিপুল প্রত্যাশা।
মজুত শস্যের রঙ আমারো শরীরে হ'লো ফিকে।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে অমৃতকুমারের অসম্বৃত গদ্যে কাব্যরসের স্পর্শ প্রায় কোনোখানেই লাগেনি। মোটের উপর মনে হয়, উভয় কবিই বিষয়নির্বাচনে ভুল করেছেন। প্রগতিশীলতার দাবি অগ্রাহ্য ক'রে যদি তাঁরা কবিতায় সে-কথাই নির্ভয়ে প্রকাশ করেন যা একান্তই তাঁদের প্রাণের কথা, তাহ'লে তাঁদের কাব্যসাধনা সার্থক হবার সম্ভাবনা আছে। আর যদি প্রাণে কোনো কথা না থাকে, যদি পার্টি-পত্রিকা থেকে কথা সংগ্রহ করতে হয়, তাহ'লে বোধ হয় কবিতা না-লেখাই ভালো।

শতাব্দী গ্রন্থমালা

এই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদকেরা বলছেন: 'যে সকল সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও অন্যান্য রচনাবলী হইতে দেশী ও বিদেশী মনীষীদের জ্ঞান ও চিন্তাধারার পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি, আমাদের সাধ্যানুসারে সেই সকল সংগ্রহ করিয়া শতাব্দী গ্রন্থমালায় প্রকাশের আয়োজন করিয়াছি।' উদ্দেশ্য সাধু এবং গ্রন্থমালায় যে তিনটি বই দেখলুম তিনটিই আমাদের ভালো লাগলো। ঈসকাইলাস সম্বন্ধে লিখেছেন শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়। বইটি অতিশয় সংক্ষিপ্ত নয়, ইতিহাস এবং সমালোচনা উভয়েরই স্থান হয়েছে, 'পরিশিষ্ট' অংশে কিছু অনুবাদও পাওয়া যাবে। গ্রীক সাহিত্য সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় এই বই বোধ হয় প্রথম বই। শ্রীযুক্ত বিভাস রায়চৌধুরীর 'নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা' তথ্যবহুল কিন্তু মুখ্যত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে লিখিত হয়েছে বলে ঈষৎ নীরস, বইটির চেহারাও যেন কলেজের নোটের মতোই হয়েছে। তবে বাংলা নাটক সম্বন্ধে মোটামুটি সব খবর এক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে, এই কারণে বইটির সমাদর হবে আশা করি। শ্রীযুক্ত বিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতের ঐতিহ্যে প্রাচীন ভারতের লৌকিক জীবন, সাহিত্য সঙ্গীত ও সংস্কৃতির যে চিত্র এঁকেছেন তা তাঁর স্বচ্ছন্দ ভাষার গুণে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। এখানেও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, কিন্তু তথ্যই এখানে বড়ো হ'য়ে উঠেনি, বইটিতে লেখক আনন্দের রস সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। শতাব্দী গ্রন্থমালার প্রচ্ছদপট সুন্দর, কিন্তু মলাটে বইয়ের নাম লেখা না থাকাতে বড়ো অসুবিধা হয়। এই গ্রন্থমালার অন্যান্য বই দেখতে আমরা উৎসুক থাকবো।

গীতবিতান বার্ষিকী, প্রথম বর্ষ। প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত ও প্রকাশিত। তিন টাকা।

রবীন্দ্র-সংগীতের শিক্ষায়তন গীতবিতানের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সংগীত নাট্য, অভিনয় ও নৃত্যকলা সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে এই নূতন বার্ষিকী প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের গণ্যমান্য অনেকের প্রবন্ধই

এতে স্থান পেয়েছে, কবির একটি ইতিপূর্বে-অপ্রকাশিত সংগীত ও তার স্বরলিপি এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। স্বরলিপি সমস্যা নিয়ে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে-পত্রাবলী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সৌজন্যে এখানে প্রকাশিত হয়েছে, সাংগীতিক মহলে তা বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করবে। অন্যান্য রচনার মধ্যেও পড়বার মতো ও ভাববার মতো প্রচুর উপাদান আছে। শুধু একটা বিষয়ে আমাদের খটকা লেগেছে। সম্পাদক এমন প্রবন্ধও ছেপেছেন যেখানে রবীন্দ্র-সংগীতকে পরম অনুকম্পার চোখে দেখা হয়েছে। এটা আমাদের ভালো লাগে নি, এবং তার কারণ পৌত্তলিকতা নয়। এ-ধরনের পত্রিকার পিছনে একটি সুনির্দিষ্ট সম্পাদকীয় নীতি না-থাকলে তার মর্যাদা হ্রাস হয় ব'লে আমাদের ধারণা।

গীতবিতান-বার্ষিকী সাহিত্যিক-সাঙ্গীতিক মহলে সমাদৃত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান কাগজের বাজারের দিকে লক্ষ্য করলে ছবির স্বল্পতা নিয়ে দোষ ধরা সংগত হয় না, কিন্তু প্রচ্ছদপটটি সহজেই আরো মনোরম করা যেতো। সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনার সংগ্রহ অনেকগুলি পত্রিকা ও গ্রন্থের মারফৎ এ-পর্যন্ত হয়েছে, কিন্তু কবিপ্রতিভার কোনো বিশেষ একটি বা কয়েকটি রশ্মির মধ্যে আবদ্ধ থেকে প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকাশ এই বোধহয় প্রথম। সেদিক থেকেও সম্পাদকের উদ্যম উল্লেখযোগ্য। তবে প্রতি বছরই রবীন্দ্রনাথের নাচ; গান, নাটক সম্বন্ধে যথেষ্টসংখ্যক ভালো প্রবন্ধ হয়তো পাওয়া যাবে না, হয়তো ভবিষ্যতে গীতবিতানবার্ষিকীর ক্ষেত্র আরো প্রসারিত ক'রে দিতে হবে।

'কবিতা'র পৌষ সংখ্যা বেরবার পরে এ-ক'মাসে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার সাতখানা নতুন বই আমাদের হাতে এসেছে।

১.	প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী	সুকুমার সেন
২.	আয়ুর্বেদ-পরিচয়	গণনাথ সেন
৩.	শারীরবৃত্ত	রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৪.	বঙ্গীয় নাট্যশালা	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫.	রঞ্জন-দ্রব্য	দুঃখহরণ চক্রবর্তী
৬.	জমি ও চাষ	সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী
৭.	যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প	মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

বিভিন্ন technical বিষয়ে বিশেষজ্ঞের লেখা সহজ, সুলভ, সুখপাঠ্য বই বাংলা ভাষায় এই প্রথম, এবং আমাদের পাঠকসমাজ যে এ-গ্রন্থমালাকে

সাগ্রহে গ্রহণ করছেন, এর দ্রুত-বর্ধমান তালিকাই তার প্রমাণ। এ-দুর্দিনেও মুদ্রণপারিপাট্যের আদর্শ বিশ্বভারতী যে-ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখছেন সে-জন্যও তাঁদের সাধুবাদ জানাতে হয়।

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ষোড়শ খণ্ডে আছে 'পুনশ্চ', 'চিরকুমার সভা', 'গল্পগুচ্ছ' ও 'শান্তিনিকেতন', আর সপ্তদশ খণ্ডে 'বিচিত্রিতা', 'শোধবোধ', 'গৃহপ্রবেশ' 'গল্পগুচ্ছ', 'জীবনস্মৃতি'। প্রচুর ফুটনোট ও দীর্ঘ 'গ্রন্থপরিচয়'-এর সাহায্যে তথ্যের দিক থেকে 'জীবনস্মৃতি'কে সুসম্পূর্ণ ক'রে তুলে বিশ্বভারতী একটি মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। 'গ্রন্থপরিচয়' বিভাগে আছে বহুবিধ উল্লেখ, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বহু চিঠি ও রচনা থেকে উদ্ধৃতি, কবির ঠিকুজি ও বংশলতিকা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি চম্পূ রচনা, যা কবির কোনো গ্রন্থে ইতিপূর্বে সংগৃহীত হয়নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নীর মৃত্যুর পরে চতুর্বিংশবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথ এটি রচনা করেন, এবং 'পুষ্পাঞ্জলি'কে 'লিপিকা'র কোনো-কোনো রচনার প্রথম খসড়া নিঃসন্দেহেই বলা যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠে 'পুষ্পাঞ্জলি' একটি মূল্যবান উপাদান।

'জীবনস্মৃতি'র যে-নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তা হুবহু রচনাবলী-সংস্করণেরই অনুরূপ। পণ্ডিত, ছাত্র ও সাহিত্যিকমহলে এই নতুন সংস্করণের বিশেষ সমাদর হবে।

৭

"মায়া-মাল্ঞ্চ"

কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

"মায়া-মালঞ্চ" বুদ্ধদেব বসুর "কালো হাওয়া"র স্বরচিত নাট্যরূপ। "কালো হাওয়া"য় তিনি যে অন্ধকারের যবনিকা একটা প্রস্ফুটিত সংসারের উপর টেনে দিয়েছিলেন—তারই গভীরতা এবং গুরুতর পরিস্থিতির নাট্যরূপ "মায়া-মালঞ্চে"ও সুপরিস্ফুট হয়েছে। নাটকীয় সংস্থান এবং সংলাপে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে নাট্যকার সুষ্ঠু কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের কলগুঞ্জনের মধ্যে যে বিরুদ্ধ ধ্বনি উঠেছিল—হৈমন্তীর উচ্ছ্বাসময় অন্ধ ভাবালুতা, মিনির অসহায় ব্যর্থতার ছবি, অরিন্দমের শোচনীয় পরিণতি, উজ্জলার একটানা দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আর অরুণের উচ্ছৃঙ্খলতাভরা বৈষম্যের ভারে নাটকখানি একটি দুঃসহ আবর্ত্তের সৃষ্টি করেছে। এই থমথমে ভাবের মধ্যে হঠাৎ ভেসে আসা স্নিগ্ধ হাওয়ার মত বুলি একদিকে, আর রহস্যময়ী মহামায়ার সেতুবন্ধ আর একদিকে—এরাই নাটকটিকে দিয়েছে গতি, যদিও সে গতি মন্থর। নিরঞ্জন এদের মধ্যে এসে পড়েছে পারিপার্শ্বিক চরিত্ররূপে।

অরিন্দম কর্ম্মস্থল থেকে ফিরে এসে তার ছন্নছাড়া সংসারে শৃঙ্খলা ও শান্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টায় মনোনিবেশ করলো। কঠিন নিষ্ঠুর নিয়তি তার সমস্ত কল্পনা ও চেষ্টাকে ব্যর্থ করে তাকে নিয়ে চ'ল্লো—শেষে কী শোচনীয় জীবনান্তই না হোল তার! বড় মেয়ে মিনি, যে এই 'রঙিন পুতুলের খেলাঘর' এড়িয়ে মহামায়ার মায়া-মালঞ্চে বৃহত্তর জীবনের স্বপ্ন দেখছিল—মনের ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখবার সহজ প্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়ে যে শেখানো বুলির আওতায় নিজস্বকে বিসর্জ্জন দিয়েছিল—সেও একদিন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠল—কিন্তু তখন তার অনেক দেরী হ'য়ে গিয়েছে। তারই ছোট বোন বুলি, যে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে ভরপুর হ'য়ে আছে তারই গড়া মন্দিরে বসে উপাসিকার মত বল্‌ছে—"কষ্ট করবে তুমি একা আর সুখের ভাগ নিতে ডাকবে বুঝি আমাকে?" বুলি তার জীবনকে অস্বীকার করেনি, তার প্রাণধর্ম্মকে অস্বীকার করেনি, স্নেহময় পিতার আশীর্ব্বাদে সে তার পথ চিনে নিয়েছে, দ্বিধা দ্বন্দ্ব তার মনকে নিষ্ক্রিয় করে তোলেনি। সংসারের কর্ত্রী হৈমন্তী, সংসার ছেড়ে মহামায়ার অনুরাগিণী হ'য়ে পড়েছে—স্বামী তার কাছে কেউ নয়—সংসার একটা পুতুল খেলার জায়গা—"Doll's House." এতদিন এই সংসারে থেকে নিজের জীবনকে সে ব্যর্থ করেছে—Ibsenismএর এই বিকৃত মনোভাব যে সমস্ত সংসারে প্রথম থেকেই একটা প্রকাণ্ড অশুভের ইঙ্গিত নিয়ে আসছিলো—নাট্যকার সে পরিণতিকে

"মায়া-মালঞ্চ"
ভূমিকা-লিপি
বাম থেকে দক্ষিণে
উমা দত্ত (উজ্জলা)
পরিতোষ সোম (অরুণ)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (নিরঞ্জন)
কল্যাণী মুখোপাধ্যায় (মহামায়া)
তপতী দেবী চট্টোপাধ্যায় (বুলি)
রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী (অরিন্দম)
প্রতিভা বসু (মিনি)
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (নীরদ ডাক্তার)
লীলা দাশগুপ্তা (হৈমন্তী)
শেখর সেন (মহাদেব)

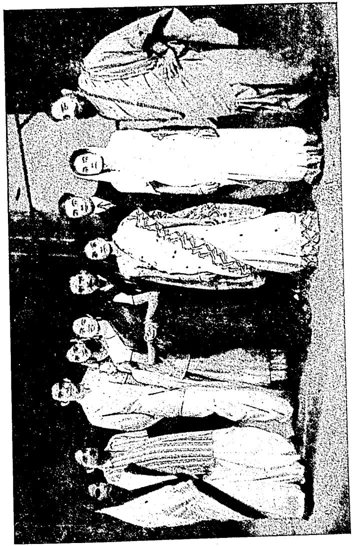

অবশ্যম্ভাবী দৃষ্টি দ্বারা প্রতিফলিত করেছেন। পুত্র অরুণ উচ্ছৃঙ্খল—অপরিণতবুদ্ধি, অব্যবস্থিতচিত্ত। হৈমন্তীর তাতে সুখ নেই—কিন্তু এর প্রতিবিধান করবার কোনও সক্রিয় চেষ্টাই সে করেনি। একটা অদ্ভুত কল্পনাবিলাসে সে অরুণকে মহামায়ার আশ্রয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। অক্টোপাসের মত মহামায়ার সজাগ দৃষ্টি চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যা কিছু সামনে আসে—তাকেই মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ করে ফেলে। নাট্যকার এটুকু বেশ ভাল করেই দেখিয়েছেন যে যারা প্রাণধর্ম্মী তাদের কাছে মহামায়ার মায়াজাল সূর্য্যালোকে কুজ্ঝটিকার মতই মুহূর্ত্তে বিলীন হ'য়ে যায়। তাই অরিন্দমের মুখে হয়ত কিছুটা বিদ্রূপ ফুটে ওঠে—বুলিকে মহামায়ার পরিমণ্ডলে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে পরধর্ম্মের আশ্রয়ে যারা জীবনের রূপ দেখতে চেয়েছে—নাট্যকার বলতে চেয়েছেন—তারাই জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। অরিন্দমের আকস্মিক ও শোচনীয় মৃত্যু না হ'লে হয়ত হৈমন্তীর ভিতরের আসল মানুষটিকে চেনা যেত না—সে যে নারী, সে যে স্ত্রী, সে যে মা, সব কিছুই ভুলে গিয়ে সে যে নিজেকে নিয়ে অপ্রাকৃতের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছিল—নাট্যকার সুকৌশলে তার উন্মত্ততার মাঝখান দিয়ে অতি করুণ ভাবে সে রূপটিকে অঙ্কিত করেছেন। উজ্জ্বলার দীর্ঘ একটানা হতাশা ও ক্রন্দনের ইতিহাস নাট্যকার এমনি ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন যে না পেয়ে সে জীবনকে মনে করলো অসার্থক শূন্যতায় ভরা। স্বামীকে যে কেবল কান্না দিয়ে ভোলানো যায় না, ক্ষেত্রানুযায়ী কর্ম্মপন্থা বেছে নিতে হয়, এই জ্ঞানটুকু না থাকায় উজ্জ্বলার সমস্ত জীবন নষ্ট হ'য়ে গেল। সে চাইল শান্তি মহামায়ার কাছে—কিন্তু তার অন্তরে যে চিরন্তন মাতৃত্ব জেগে রয়েছে, তাই পুত্রের কল্যাণের প্রার্থনাই সে কায়মনোবাক্যে করেছিল।

এই ছোট্ট নাটকীয় ঘটনাকেই অবলম্বন ক'রে নাট্যকার মঞ্চে তাকে রূপ দিয়েছেন। নিজের রচনা প্রযোজনায় শিল্পীমনের উৎকর্ষ ফুটে উঠেছে—ঠিক যা নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেছিলেন—তাই যাতে দৃশ্য ও সংলাপে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে এই সার্থক প্রয়াসে যাঁরা তাঁকে সহযোগিতা দিয়েছেন, তাঁদের কৃতিত্বও কম নয়। নাটক তখনই সার্থক, যখন নাট্যকারের বর্ণিত চরিত্রগুলি রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত, জাগ্রত ও পূর্ণ সার্থকতায় রূপায়িত হ'য়ে ওঠে। অরিন্দমের ভূমিকায় রামকৃষ্ণ চৌধুরীর সাবলীল গতি, উন্মাদিনী দৃশ্যে লীলা দাশগুপ্তার অভিনয়, মহামায়ার ভূমিকায় কল্যাণী মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রোপযোগী গাম্ভীর্য, উচ্ছৃঙ্খল অরুণের ভূমিকায় পরিতোষ সোম ও বুলির ভূমিকায় তপতী দেবী চট্টোপাধ্যায়ের সাহসিকতা এবং মিনির ভূমিকায় প্রতিভা [illegible]র অভিনয়নৈপুণ্যে ও প্রতিভায় আমরা বিস্মিত হ'য়েছি। সংযত অভিনয়ের মধ্য দিয়েই যে

আর্টের মুক্তি এ-কথাটা অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ ভুলে যান নি। নাটক দেখে একথা একবারও মনে হয়নি যে আমরা অভিনয় দেখছি। যেন একটা পরিপূর্ণ জীবনের মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি. নাটকের প্রতি চরিত্রের যতি ও ছন্দকে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রূপায়িত ক'রে তুলেছে। এটাই এঁদের বিশেষত্ব ও সর্ব্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব।

---

* কবিতাভবনের প্রযোজনায় ও গ্রন্থকারের পরিচালনায় 'মায়-মালঞ্চ' শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে গত ৩রা, ৪ঠা, ১৩ই ও ১৪ই মার্চ অভিনীত হয়েছে। অভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রতিভা বসু, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, তপতী দেবী চট্টোপাধ্যায়, লীলা দাশগুপ্তা, উমা দত্ত, রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পরিতোষ সোম, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শেখর সেন।

কবিতা

নবম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা আষাঢ় ১৩৫১ ক্রমিক সংখ্যা ৪২

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ও বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত)

৩৮

সংসারে যারা কেবলি হার মানে এবং হাল ছাড়ে তুমি তাদের দলে যেয়ো না। পৃথিবীর অধিকাংশ দুঃখই হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে। অন্ধকারে প্রত্যেক ছায়াটাকেই ভূত বলে মনে হয়—মনটা অন্ধকার করে থাকলে আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীকে অকারণে বা অল্পকারণেই অপদেবতা বলে কেবলি ভ্রম হতে থাকে। খুব জোরে হাসতে শিখলে তারই আলোয় অন্তত সংসারের মিথ্যে ভূতগুলো দৌড় মারে।

খুব গলা ছেড়ে ঐ হাসতে পারাটা পৌরুষ। রথীকে লিখে দিচ্ছি তোমার খাতাখানি প্রমথকে পাঠিয়ে দেবে। ইতি ৪ঠা ভাদ্র ১৩২৪

৩৯

Wellsকে যে চিঠি লিখেচ পড়ে দেখলুম। বেশ হয়েচে। আমার ইচ্ছা আছে একসময় তাঁকে নিমন্ত্রণ করব। সম্প্রতি আমাদের দেশের লোক বিদেশের লোকের প্রতি যেরকম বিমুখ হয়ে আছে ঠিক এইসময় কারো এসে কোনো ফল হবে বলে মনে করিনে। গান্ধি বলেন পৃথিবীর লোক scienceএর নাম করে অনেক পাপ করচে। কিন্তু ধর্ম্মের নাম করে তার চেয়ে অনেক বেশী পাপ করে। আমাদের দেশে যে untouchability নিয়ে তিনি কিছুদিন লড়েছিলেন সেও তো ধর্ম্মের উপরে টিঁকে আছে। আরও এমন হাজার হাজার পাপ আছে। সতীদাহও ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল, কিন্তু তাই বলে ধর্ম্মটাকে ত কেউ—অন্তত মহাত্মা—ঝাড়ে মূলে উপড়ে ফেলতে পরামর্শ দেন না। ইতি ১৯ ভাদ্র ১৩২৮

৪০

তুমি শান্তিনিকেতনে এসে আমার কাছে কিছুদিন থাক। নিজের
মনটাকে বেশী প্রশ্রয় দিয়ো না। সুখ দুঃখের খুব কঠিন ঘাত-প্রতিঘাতের
মধ্য দিয়েই এ পর্য্যন্ত চলে এসেচি—কতবার হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছ
হয়েচে। কিন্তু এইটেকেই আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি যে
বেদনার ভিতর দিয়েই জীবনটাকে নিবিড়ভাবে পেয়েচি। জীবনট
যদি নিতান্ত ছায়ায় লালিত, পেলব এবং সৌখীন হত তাহলে তা
কোনো মূল্য থাকত না। যদি তুমি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা কর তবে একদি
এই প্রাণপরিপূর্ণ পৃথিবীর রৌদ্রালোকিত কলধ্বনি-মুখর প্রভাতে জে
উঠে দেখ্‌বে তুমি যে অবসাদে আবিষ্ট হয়েছিলে সে দুঃস্বপ্নমাত্র, তা
মধ্যে সত্য নেই। জীবনে কত জ্ঞান, কত অভিজ্ঞতা, কত উদ্যোগ, কত
সৃষ্টি—জীবনের সেই বিচিত্ররূপী সত্যের দুর্লভ উপলব্ধি থেকে নিজেকে
বঞ্চিত কোরো না। বাঁচবার পথে যাত্রা কর কোমর বেঁধে—দুর্জ্জয় তেজে
অসীম আশায়, অটল বিশ্বাসে—অশ্রদ্ধা কোরো না নিজেকে, এবং এ
বিপুল সংসারকে—এই অপরিসীম রহস্যময় জীবলীলাকে। আপনা
দীর্ঘ ছায়াটাকে আপনার চেয়ে সত্য মনে করে তুমি ব্যাকুল হয়ে পড়ে
এই কুহেলিকা থেকে ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, এই আমি কাম
করি। ইতি ১৪ই কার্ত্তিক ১৩২৪

৪১

'চার অধ্যায়' প্রকাশ করে দিয়েছি। বিশ্বাস করিনে কর্ত্তারা ওটা
করে দেবে—বন্ধ করবার ন্যায্য কারণ কিছুমাত্র নেই। তৎসত্ত্বেও যদি উপ
করে তবে সেটা বোকামি হবে। বোকামির বিরুদ্ধে সতর্ক হবার দরক
বোধ করিনে। যাই হোক, বইখানা যখন প্রকাশিত হোলই তখন
তর্জ্জমা করবার কোনো হেতু রইল না। সাহিত্যের প্রাণধারা বয় ভাষ
নাড়ীতে, তাকে নাড়া দিলে মূল রচনার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। এর
সাহিত্যে বিষয়বস্তুটা নিশ্চল হয়ে যায়, যদি তার সজীবতা না থাকে
এবারে আমারই পুরানো তর্জ্জমা ঘাঁটতে গিয়ে একথা বার বার
হয়েছে। তুমি বোধ হয় জানো বাছুর ম'রে গেলে তার অভাবে গাভী
দুধ দিতে চায় না, তখন মরা বাছুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে
ভর্ত্তি ক'রে একটা কৃত্রিম মূর্ত্তি তৈরী করা হয়, তার গন্ধে, তার চেহারার সা
গাভীর স্তনে দুগ্ধ ক্ষরণ হতে থাকে। তর্জ্জমা সেইরকম মরা বাছুরের মূ
তার আহ্বান নেই, ছলনা আছে। এ নিয়ে আমার মনে লজ্জা ও অনু
জন্মায়। সাহিত্যে আমি যা কাজ করেছি তা যদি ক্ষণিক ও প্রাদেশিক
হয়, তবে যার গরজ সে যখন হোক আমার ভাষাতেই তার পরিচয়

করবে। পরিচয়ের অন্য কোনো পন্থা নেই। যথাপথে পরিচয়ের যদি বিলম্ব ঘটে, তবে যে বঞ্চিত হয় তারই ক্ষতি, রচয়িতার তাতে কোনো দায়িত্ব নেই।

প্রত্যেক বড়ো সাহিত্যে দিন ও রাত্রির মতো পর্য্যায়ক্রমে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের দশা ঘটে, মিলটনের পর ড্রাইডেন পোপের আবির্ভাব হয়। আমরা প্রথম যখন ইংরেজী সাহিত্যের সংশ্রবে আসি, তখন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। য়ুরোপে ফরাসী বিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে-নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া ভাঙবার নাড়া। এই জন্যে দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বজনীন রূপে। সে যেন রসসৃষ্টির সার্ব্বজনিক যজ্ঞ। তার মধ্যে সকল দেশেরই আগন্তুক অবাধে আনন্দ ভোগের অধিকার পায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ঠিক সেই সময়েই য়ুরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌঁছল—তার মধ্যে ছিল সর্ব্ব-মানবের মুক্তির বাণী। আমাদের তো সাড়া দিতে দেরী হয়নি। সেই আনন্দে আমাদেরও মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা এল। সেই প্রেরণা আমাদেরও জাগ্রত মনকে পথ নির্দ্দেশ করলে বিশ্বের দিকে। সহজেই মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে, কেবল বিজ্ঞান নয়, সাহিত্য-সম্পদও আপন উদ্ভবস্থানকে অতিক্রম করে সকল দেশ ও সকল কালের দিকে বিস্তারিত হয়; তার দাক্ষিণ্য যদি সীমাবদ্ধ হয়, যদি তাতে আতিথ্যধর্ম্ম না থাকে, তবে স্বদেশের লোকের পক্ষে সে যতই সৌভাগ্য হোক না কেন সে দরিদ্র। আমরা নিশ্চিত জানি যে, যে-ইংরেজি সাহিত্যকে আমরা পেয়েছি সে দরিদ্র নয়, তার সম্পত্তি স্বাজাতিক লোহার সিন্ধুকে দলিলবদ্ধ হয়ে নেই।

একদা ফরাসী বিপ্লবকে যাঁরা ক্রমে ক্রমে আগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন বিশ্ব-মানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ। ধর্ম্মই হোক, রাজশক্তিই হোক, যা কিছু ক্ষমতালুব্ধ, যা কিছু ছিল মানুষের মুক্তির অন্তরায় তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের অভিযান, সেই বিশ্বকল্যাণ-ইচ্ছার আবহাওয়ায় জেগে উঠেছিল যে সাহিত্য, সে মহৎ, সে মুক্তদ্বার সাহিত্য, সকল দেশ, সকল কালের মানুষের জন্য সে এনেছিল আলো, এনেছিল আশা। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে য়ুরোপের বিষয়বুদ্ধি বৈশ্যযুগের অবতারণা করলে। স্বজাতি ও পরজাতির মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করে ধনস্রোত নানা প্রণালী দিয়ে য়ুরোপের নবোদ্ভূত ধনিকমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল। বিষয়বুদ্ধি সর্ব্বত্র সর্ব্ববিভাগেই ভেদবুদ্ধি, তা ঈর্ষাপরায়ণ। স্বার্থসাধনার বাহন যারা তাদেরই ঈর্ষা, তাদের ভেদনীতি অনেকদিন থেকেই য়ুরোপের অন্তরে অন্তরে গুমরে উঠছিল, সেই বৈনাশিক শক্তি হঠাৎ সকল বাধা বিদীর্ণ করে আগ্নেয়-স্রাবে য়ুরোপকে ভাসিয়ে দিলে। এই যুদ্ধের মুলে ছিল সমাজ-ধ্বংসকারী রিপু, উদার মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাস। সেই জন্যে এই যুদ্ধের যে দান তা

দানবের দান, তার বিষ কিছুতেই মরতে চায় না, তা শান্তি আনলে না। তার পর থেকে য়ুরোপের চিত্ত কঠোরভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আসচে—প্রত্যেক দেশই আপন দরজার আগলের সংখ্যা বাড়াতে ব্যপৃত। পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সংশয়, যে নিষেধ প্রবল হয়ে উঠবে, তার চেয়ে অসভ্যতার লক্ষণ আমি তো আর কিছু দেখিনে। রাষ্ট্রতন্ত্রে একদিন আমরা য়ুরোপকে জনসাধারণের মুক্তিসাধনার তপোভূমি বলেই জানতুম—অকস্মাৎ দেখতে পাই সমস্ত যাচ্ছে বিপর্য্যস্ত হয়ে। সেখানে দেশে দেশে জনসাধারণের কণ্ঠে ও হাতে পায়ে শিকল দৃঢ় হয়ে উঠচে, হিংস্রতায় যাদের কোনো কুণ্ঠা নেই তারাই রাষ্ট্রনেতা। এর মূলে আছে ভীরুতা, যে ভীরুতা বিষয়বুদ্ধির। ভয়, পাছে ধনের প্রতিযোগিতায় বাধা পড়ে, পাছে অর্থভাণ্ডারে এমন ছিদ্র দেখা দেয় যার মধ্য দিয়ে ক্ষতির দুগ্রহ আপন প্রবেশপথ প্রশস্ত করতে পারে। এইজন্যে বড়ো বড়ো শক্তিমান পাহারাওয়ালাদের কাছে তারা আপন স্বাধীনতা, আপন আত্মসম্মান বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। এমন কি স্বজাতির চিরাগত সংস্কৃতিকে খর্ব্ব হতে দেখেও শাসনতন্ত্রের বর্ব্বরতাকে শিরোধার্য্য করে নিয়েছে। বৈশ্যযুগের এই ভীরুতায় মানুষের অভিজাত্য নষ্ট করে দেয়, তার ইতরতার লক্ষণ নিলর্জ্জভাবে প্রকাশ পেতে থাকে, পণ্যহাটের তীর্থযাত্রী অর্থলুব্ধ য়ুরোপ এই যে আপন মনুষ্যত্বের খর্ব্বতা মাথা হেঁট করে স্বীকার করচে, আত্মরক্ষার উপায় রূপে নির্ম্মাণ করচে আপন কারাগার, এর প্রভাব কি ক্রমে ক্রমে তার সাহিত্যকে অধিকার করচে না? ইংরেজি সাহিত্যে একদা আমরা বৈদেশীরা যে নিঃসঙ্কোচ আমন্ত্রণ পেয়েছিলুম, আজ কি তা আর আছে? একথা বলা বাহুল্য, প্রত্যেক দেশের সাহিত্য মুখ্যভাবে আপন পাঠকদের জন্য, কিন্তু তার মধ্যে সেই স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য আমরা প্রত্যাশা করি যাতে সে দূর নিকটের সকল অতিথিকেই আসন যোগাতে পারবে। যে সাহিত্যে সেই আসন প্রসারিত সেই সাহিত্যই মহৎ সাহিত্য। সকল কালেরই মানুষ সেই সাহিত্যের স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করে তোলে, তার প্রতিষ্ঠা-ভিত্তি সর্বমানবের চিত্তক্ষেত্র।

আমাদের সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্যকে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে বিচার করা নিরাপদ নয়। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেটুকু অনুভব করি সে আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, তার অনেকখানিই হয়তো অজ্ঞতা। এ সাহিত্যের অনেক অংশের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো যথেষ্ট আছে, কালে কালে তার যাচাই হতে থাকবে। আমি যা বলতে পারি তা আমারি ব্যক্তিগত বোধশক্তির সীমানা থেকে। আমি বিদেশী তরফ থেকে বলচি, অথবা তাও নয়—একজন মাত্র বিদেশী কবির তরফ থেকে বলচি—আধুনিক ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত। আমার এ কথার যদি কোনো ব্যাপক মূল্য থাকে তবে এই কথা বলতে হবে এই

সাহিত্যের অন্য নানা গুণ থাকতে পারে, কিন্তু একটা গুণের অভাব আছে যাকে বলা যায় সার্ব্বভৌমিকতা, যাতে করে বিদেশ থেকে আমিও একে অকুণ্ঠিত চিত্তে মেনে নিতে পারি। ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে কেবল যে রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয় নি। আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করচি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার বলে ঠেকে, বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি, তার মধ্যে এমন উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্ছে না, ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে, এর কাছে এমন বাণী পাইনে যা শুনে মনে করতে পারি যেন আমারি বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণীরূপে। দুই একটা ব্যতিক্রম যে নেই তা হতেই পারে না। মনে পড়চে রবার্ট ব্রিজেসের নাম। আরো আছে।

আমাদের দেশে তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয় সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্ত্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাতনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্য সত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময়ে একটা স্পর্দ্ধামাত্র। আমি এই বলি, বিজ্ঞানে মানুষের কাছে প্রাকৃতিক সত্য আপন নূতন নূতন জ্ঞানের ভিত্তি অবারিত করে, কিন্তু মানুষের আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে কিন্তু ভিত্তি বদল করে না। যে সৌন্দর্য্য যে প্রেম যে মহত্ত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতই উদ্বোধিত হয়েছে তার তো বয়সের সীমা নেই, কোনো আইনষ্টাইন এসে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারে না, বলতে পারে না বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসে যার অকৃত্রিম আনন্দ সে সেকেলে ফিলিষ্টাইন। যদি কোনো বিশেষ যুগের মানুষ এমন সৃষ্টিছাড়া কথা বলতে পারে, যদি সুন্দরকে বিদ্রূপ করতে তার ওষ্ঠাধর কুটিল হয়ে ওঠে, যদি পূজনীয়কে অপমান করতে তার উৎসাহ উগ্র হতে থাকে, তাহলে বলতেই হবে এই মনোভাব চিরন্তন মানবস্বভাবের বিরুদ্ধে। সাহিত্য সর্ব্বদেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসচে যে, মানুষের আনন্দ-নিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহ-বেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চিরপুরাতনের চিরনূতনত্ব বহন করচে মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা। এই জন্যেই মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা, সর্ব্ব-

মানবের। তাই বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে বর্ত্তমান ইংরাজি কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে নূতন, যে তরুণের মন কালাপাহাড়ী সে এর নব্যতার মদিররসে মত্ত, কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ। সে নবীনতাকে অভ্যর্থনা করে বলতে পারিনে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

তাকে যেন সত্যই নূতন বলে ভ্রম না করি, সে আপন জরা নিয়েই জন্মেছে, তার আয়ুস্থানে যে শনি সে যত উজ্জ্বলই হোক তবু সে শনিই বটে।

এতটা কথা কেন বললুম তা বলি। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত ইংরেজি কবিমণ্ডলীর প্রতি আমার আকর্ষণ যখন প্রবল ছিল, তখন সেই প্রীতির টানেই তাদের কাছে যাবার চেষ্টা করেচি। সেই প্রীতির প্রতিদানও পেয়েছিলেম। তখন কালের মধ্যে নমনীয়তা ছিল। এখন তার পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, এ যেন অনাবৃষ্টির যুগ। মরুতে যে গাছ ওঠে তার টেকনিক কাঁটার টেকনিক, সে কেবলি বলে দূরে থাকো, যে যার আপন আপন চণ্ডীমণ্ডপে। এখন ঐ মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করতে আমার সাহস হয় না—ওরা এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে যাতে ওদের আমরা বুঝিনে, ওরাও আমাদের বুঝতে চায় না।

আমার লেখাগুলোকে গুছিয়ে তুলতে তোমার যতটুকু উৎসাহ আমার তা নেই। ওখানকার মাটিতে আমাদের গাছ কিছুদিন তাজা থাকলেও তার পরে তার পাতা কুঁকড়ে মুষড়ে যায়। তাকে লুপ্ত হতে দেওয়াই তার প্রতি সদ্ব্যবহার। সে জন্যে ভয় 'তো নেই; এখানকার মাতৃভূমিতে হয়তো তার ফসল কোনোদিন নিঃশেষিত হবে না। অবশেষে একদা বিশ্বসাহিত্যে আমদানি-রপ্তানিতে কৃত্রিম মাশুলের পাহারা যখন ঘুচবে তখন এপারের ফসল পৌছবে ওপারে।

আমার পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে আমার অন্তরের অনুরাগ সব চেয়ে অক্ষুণ্ণ আছে Sturge Mooreএর প্রতি। তিনি জনতার ফরমাসে নব্যতার ভেক ধরেন নি, তাঁর মধ্যে সাহিত্যের আভিজাত্য অম্লান। আর আমি জানি আধুনিকতার কঠোর ঘর্ষণে তাঁর সহৃদয়তায় কড়া পড়ে যায়নি। একবার কোনো অবকাশে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানিয়ো আমি তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করি তেমনি ভালোবাসি। ইতি ৬ জানুয়ারী

৪২

অনেকদিন থেকে তোমার প্রতীক্ষা করে আসচি। মাঝে সাঝে জনরব শুনি—আজ আসচ, কাল আসচ, হপ্তাখানেকের মধ্যে আসচ। অসম্ভব ভিড়ের আক্রমণ নিরবচ্ছিন্ন চলেছে—বোধহয় স্থানাভাবের আশঙ্কায় আসনি। এলে কোনমতে জায়গা করে দিতুম। আমার মুস্কিল, আমার দেহ ক্লান্ত, তার চেয়ে ক্লান্ত আমার মন, কেননা মন স্থাণু হয়ে আছে চলা ফেরা বন্ধ—তুমি থাকলে মনের মধ্যে স্রোতের ধারা বয়—তার প্রয়োজন যে কত তা আশেপাশের লোকে বুঝতেই পারে না।

দুই রাজার অভ্যুদয় হয়েছে। এক রাজা কাল ভোরে চলে যাবেন। আওয়াগড় হয়তো আরো কয়েকদিন থাকবেন। উনি অত্যন্ত সাদা মানুষ, ওঁর থাকার কোনো ভার নেই। যাই হোক, তুমি যদি আসতে পার, খুসি হব। আমাকে তৈরী হতে হবে পয়লা বৈশাখের জন্যে, কিন্তু মন তৈরী হবার সময় পাচ্চে না।

এইরকম সময় সুদূরে কোথাও দৌড় মারতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সেই সুদূরও হয়তো তাড়া করবে। Yeatsএর সেই দ্বীপটা কোথায় জানো? স্বয়ং কবিও তাঁর সন্ধান পাননি। আকাশ-প্রদীপ আকাশকুসুম-বনের ইশারা করে কিন্তু পথ দেখায় না। আসল পথটা সেইখানেই যেখানে আজ শালের মঞ্জরী ধরেছে, আর অজয় নদীর ধারে নাগকেশরের বনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ইতি ৩১।৩।৪০

৪৩

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। ইংলণ্ডে এসে ইংলণ্ডের মহত্ত্ব যদি চোখে না পড়ে তবে সেটা দুর্ভাগ্য। ওখানে তোমার ভালো লাগচে তার চেয়ে ভালো খবর আর কিছু নেই। আমার প্রায় চারটে লেকচার হল। ড্রামণ্ডের চিঠি পেলুম। ১৯শে ও ২১শে এই দুদিন দুটো লেকচারের জন্যে রেখেচে, কিন্তু চারটের কমে জিনিষটা জোর পাবে না। ওকে লিখতে হবে। এখানে বেশ রোদ্দুর পড়েচে। কদিন বৃষ্টিবাদলের উৎপাত ছিল, সে কেটে গেছে। এখন থেকে এই রকমই চলবে আশা করচি।

—র চিঠি পেয়েছি। বড় উৎপাত করচে। আমার কতকগুলো চিঠির অতি বদ্ তর্জ্জমা করেচে। সেই তর্জ্জমা আলাপ প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে আমেরিকায় ছাপাবে, ওর অভিপ্রায় আমি সংশোধন করি। তাহলে আমার অন্য সব কাজ বন্ধ করতে হয়। অথচ এই লক্ষ্মীছাড়া লেখাগুলো লজ্জাকর। ওকে চিঠিপত্র লিখ্‌তে আর আমার সাহস হবে না।

বিজয়ার খবর এতদিনে পাওয়া গেল। বোধহয় আসবে এখানে। চেম্বারলেন এসেচেন, আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকেন। প্রথম দিন আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। ইতি ৯ এপ্রেল ১৯৩০

৪৪

কল্যাণীয়েষু

বিষম ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে কখনো শান্তিনিকেতনে কখনো কলকাতায়, কখনো এ ঘরে কখনো ও ঘরে চিঠিখানা যখন তখন লিখেছি, এক নক্ষত্রের সঙ্গে আর এক নক্ষত্রের তফাতের সঙ্গেই তুলনীয়—তবুও সবটা মিলে নেব্যুলা গোছের হয়েছে। শরীর ক্লান্ত ছিল বলেই লিখেছি—ওকে একেবারে ডোণ্টকেয়ার করে দিয়ে।

আজ তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম। পাতিয়ালার প্রস্তাবটা চিন্তনীয়। একটা কিছু করবার সংকল্প চল্‌চে। ওখানে বাঙালীর সংস্রব আছে শুনে সংশয় ঠেকচে। তবু বেড়া ডিঙিয়ে যদি কিছু করতে পারি চেষ্টা দেখব।

ভাষাপরিচয়টা পেয়েছ কি? এখন এখানে আছেন আওয়াগড়ের রাজা—সমস্ত মনোযোগটা আকর্ষণ করে আছেন—ইনি যেতে যেতেই বিদেশী সমাগমের সম্ভাবনা আছে। বানপ্রস্থের বয়সে এত ভিড় সয় না। ইতি ১৫।২।৩৯

৪৫

তুমি চলে যাওয়ার পর আমাদের এখানকার আসর মুষড়ে পড়েছে। তার পরে আবার আকাশ অত্যন্ত ভ্রূকুটিল ভঙ্গী ধারণ করেছিল। কী করা যায়, আমি খুচ্‌রো কবিতা লিখতে আরম্ভ করে দিলুম। তুমি জানো আমার অনেক কবিতা দুর্যোগের ফসল। দুর্দ্দিনের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ আমার কলমের স্বভাব, সে চেম্বারলেনের ছাতার বাঁটে তৈরী নয়। লক্ষ্মীর চেলারা দুঃসময়ের কাছে ভেবড়ে যায়, কিন্তু সরস্বতীর চেলা তাকে ডিঙিয়ে যায় কিম্বা তার ফুটোয় ফুটোয় বাঁশির আওয়াজ তুলে উদ্বিগ্ন হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস ডুবিয়ে দিতে থাকে। আজ এই খানিকক্ষণ হোলো সূর্য্যের আলো পরিণত শিমূলের তুলোর মতো ফেটে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশে আকাশে একটা দুশ্চিন্তার কালিমা লেগে গিয়েছিল সেটাকে মুছতে আরম্ভ করেছে। মনে আশা হচ্ছে, কাছে হোক দূরে হোক একটা সহজ পরিণাম আছেই যার মধ্যে ভাগ্যের প্রসন্নতা প্রকাশ পাবে। মানুষের **মন** হিসেবী, তাই সে ভীরু, তাই সে আশঙ্কার কারণ খতিয়ে খতিয়ে মাথা ধরিয়ে তোলে, মানুষের **আত্মা** বীর্যবান, সে নৈরাশ্যবাদী নয়, কেননা তার মাপকাঠি বহুদূরকে নিয়ে। তার মাপকাঠি রাজ্য সাম্রাজ্য পেরিয়ে যাবে, পৌছবে সেইখানে যেখানে সর্বমানবের চরম জয়পতাকা অভ্রভেদ করে আছে। সেই পতাকার বাহন কারা সে তকরার করে লাভ নেই, নিশ্চয়ই খুঁতখুঁতে ঝগড়াটে পরশ্রীকাতর

বাঙালী নয়। তবু বাঙালীও হয়তো সেখানকার তীর্থযাত্রীদের জন্যে কিছু একটা পাথেয়ের জোগান দেবে। কিন্তু হায়রে, জগজ্জয়ী বীরের অন্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব কীট লাগিয়ে দিয়ে বাঙালী প্রতিদিন তাতে বিকার ঘটিয়ে দিচ্ছে। ওর মনের মধ্যে উঁইয়ের বাসা, তৈরী জিনিষকে নষ্ট করতেই আছে। ওর কণ্ঠে সব চেয়ে যে স্বর অকৃত্রিম সে হচ্ছে দুয়ো দেবার স্বর।

তোমার প্রেরিত ‘মৃচ্ছকটিকম’ এইমাত্র পেলুম। এই নাটকে বাস্তবতা আছে, কিন্তু বিশ্বাসজনক নাট্যিক অভিব্যক্তি এবং বাঁধন নেই। লেখনী চাষ করবে না আঁচড় কাটবে। যাহোক, ভালো করে পড়ে দেখব। এই নাটক অনেকদিন আগে পড়ে দেখেছিলুম ভালো লেগেছিল, কিন্তু মনে হয়েছিল তখনকার পাঠকদের দাবী করবার স্বভাব পাকা নয়, বিষয়বস্তুকে যেমন তেমন করে আলগা করে গড়ে তুললেও লোকের অবকাশরঞ্জন হোত।

চেষ্টা করে দেখচি য়ুরোপের ইতিহাসে পরে পরে দুটো দারুণ যুদ্ধের তাৎপর্য্য বুঝে দেখতে। এই নিয়ে যারা উত্তেজিত উৎসাহ প্রকাশ করচে তারা কাপুরুষ। তারা নিজেরা অক্ষম বলেই সক্ষমদের সংকটে উল্লাস বোধ করচে। এটা হচ্ছে দূর থেকে নিরাপদে দুয়ো দেবার প্রবৃত্তি।

যখন গরম বোধ করবে এখানে এসে ঠাণ্ডা হয়ে নিয়ো। ইতি ২৪।৬।৪০

নববর্ষের জল্পনা

বুদ্ধদেব বসু

ভেবেছিলাম তুমি আমার কাছের মানুষ, সবার চেয়ে আপন,
তোমার চলা, তোমার ছলা, চোখের পাতার একটুখানি কাঁপন,
সব-কিছুরই মানে
লেখা আছে আমার মনের অভিধানে।
ভেবেছিলাম, তোমার আমার জীবন নিয়ে নিয়তি তার তাঁতে
বুনছে ব'সে আপন হাতে
চেনাশোনার চিহ্ন দিয়ে চিহ্নহারা চিরকালের ছবি,
রঙে-রেখায় এমন মেশা বেঁচে থাকায় দিনে-দিনে
কোনটা টানা, কোনটা পোড়েন তাও জানিনে।

হায়রে মূঢ়, হায়রে দৃষ্টিহীন!
এ-সব কথা একেবারেই ফাঁকা
আত্মপ্রেমের আতরটুকু মাখা।
তাইতে অত ভালো লাগে, কাব্য ক'রে মনের ঘরে সাজাই।
যদি হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে, বাইরে তাকে যাচাই
করতে গিয়ে দেখি,
বুকের রক্তে লালন-করা
এ-পসরা
মেকি, মেকি, মেকি।
বস্তুটাকে হাতের মুঠোয় শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধ'রে
যদি ভাবি মানুষটাকেও পাওয়া গেছে,
অত বড়ো লজ্জা কী আর আছে!
বস্তুটাকে পাওয়া পাওয়াই নয়,
অথচ এই জীবন-লীলায় বস্তু ছাড়া সকল পাওয়াই অনিশ্চিত।
আবার প্রাণের তৃষ্ণা যাচে যে-অমৃত
সে তো শুধু আমার জন্যে নয়,
বিশ্বলোকে সবার সঙ্গে তার-যে বিনিময়
ব'য়ে চলে গাছে-পাতায়, তারায়-তারায়, প্রাণে-প্রাণে,
অপরিমাণ রহস্য তার কেউ কি জানে!
যে-মুহূর্তে বাঁধতে তাকে চাই
আমার মলিন অভিমানের খুঁটে
সে-মুহূর্তে অমৃতরস বস্তু হ'য়ে ওঠে।

আজ ভেঙেছে ভুল।
অনেক দূরে ছড়িয়ে আছে তোমার আমার জীবনধারার মূল,
মাঝখানে তার বিশ্বব্যাপী অপরিচয়,
সে-শূন্যতা পেরিয়ে আসা কোনোমতেই সহজ তো নয়।
যত্নে যারে যায় না পাওয়া, চেষ্টারে যে কেবল ব্যর্থ করে
তারে মানুষ কেমন ক'রে ধরে!
তাই তো দেখি তোমার আমার চেনাশোনা
ফোটে কেবল শুভক্ষণের ফাঁকে-ফাঁকে,
তোমার যে-প্রাণ আমার প্রাণে তখন ডাকে
সে তো শুধু আমার মধ্যে আবদ্ধ নয়।

আরো অনেক প্রাণের মধ্যে জাগায় সে ডাক, ফিরিয়ে দেয় ডাকে,
আমার ইচ্ছা বাইরে প'ড়ে থাকে
অবাঞ্ছিত আগন্তুকের মতো।
ভালোবাসার গর্ব আমার হোক্ না যতই মর্মাহত
প্রাণের ধর্ম তাই ব'লে কি খর্ব হবে,
রুদ্ধ হবে অদম্য তার গতি?
ব্যাপ্তি সে চায়, মুক্তি সে চায়, বিশ্ব তাকে চায়,
আমার ক্ষুদ্র জীবন সীমামায়
বাঁধতে গেলে অলক্ষ্যে সে পালিয়ে যাবে,
বাঁধনগুলো দ্বিগুণ হয়ে আমার প্রাণেই জাল জড়াবে।

ছেড়ে দিলাম, আমি তোমায় ছেড়ে দিলাম, আমার ভালোবাসার
বাঁধন থেকে।
আমার ইচ্ছা আর যেন না বাঁধে তোমায়,
বেরিয়ে পড়ো বিশ্বলোকের অগম সীমায়,
পূর্ণ হ'য়ে পূর্ণ করো।
ভালোবাসা যত বড়োই হোক, ভালোবাসার চেয়ে মানুষ বড়ো।
মানুষেরে বন্দী করার পরম পাপের ক্ষমা
ভালোবাসার ভাণ্ডারেতেও নেই তা জমা।
আর যেন না এমন কথা ভাবি
আমার হাতেই তোমার প্রাণের চাবি।
দুঃখ পাওয়া অনেক ভালো লজ্জা পাওয়ার চেয়ে।
আত্মপ্রেমের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে দেখি চেয়ে,
বিপুল বিশ্বে দিকে-দিকে পড়ছে ঝ'রে
অকূল প্রাণের ধারা,
প্রাণের টানেই প্রাণের গতি, তোমার 'পরে বিশ্বপ্রাণের দাবি,
তোমার সঙ্গে বিশ্বলোকের নিত্য কানাকানি,
আমি তোমার কতটুকুই জানি!
করবো না লোভ, করবো না ভয়, ব্যগ্র হাতে চাইবো না সব নিতে,
গর্ব আমার লুটিয়ে দেবো, রাখবো জেলে ধৈর্য্য-দীপ-শিখা—
যদি কোনো শুভক্ষণে আমার 'পরেও ঝরে তোমার দান,
বিশ্বপ্রাণের বিচিত্রতায় আমিও এক প্রাণ।

২২শে জুন, ১৯৪৪

সমর সেন

১

আশ্চর্য ব্যাপার দেখি আজব সহরে
টম হাতে খায়, হরি কাঁটাচামচে ধরে
কবিকিশোরেরা নিল রকমারী ভেক।
সার্বিক সমরে তামাম্ পৃথিবী এক।

ভেল্কিতে সম্ভব হল প্রখর প্রগতি।
এতদিনে বদ্‌লালো ভারতের গতি।
শ্রাবণ সহরে দেখি সোনার বাঙালী
একাগ্র সন্ধানে ঘোরে, কঙ্কাল কাঙালী।

২

দু কোটি ক্ষুধার অভিশাপ
সংহত বাংলা দেশে।
চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই
নিবিড় মিতালি মহাজন ও শকুনে।
দুর্দিন, রপ্তানী কিছুদিন বন্ধ কর
এদেশে, হে দেব! ক্ষান্ত কর দাক্ষিণ্য দারুণ!
বিপুলা পৃথিবী! অন্য দেশে লেগেছে আগুন,
কালশিটে কালো মেঘ, সূর্যাস্তের রং যেন মানুষের খুন!
কিন্তু সে দেশে, হে দেব, আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গে
ধূমায়িত অরণ্য প্রান্তরে বিদীর্ণ পাহাড়ে
গুপ্তস্তরে পলিমাটি জমে। দিগ্বিজয়ী সৈন্যদল,
দর্পহর বর্বরবাহিনীর, সহজ সকাল আনে;
সেখানে ট্যাঙ্কের শব্দ স্তব্ধ হ'লে
বিধ্বস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন
জোসেফ্ ষ্টালিন।

৩

প্রেতলোকে যারা আনে প্রাণের স্বাক্ষর
কর্ম আর চিন্তা যাদের জীবনে হরিহর,
অমর নমস্য তারা। ঈগল চক্ষুতে
তারা দেখে বিচ্ছিন্ন সহর গ্রাম, ধোঁয়াটে প্রান্তর,
আরো দেখে অবিচ্ছিন্ন জীবনের একসূত্র, ঘনিষ্ঠ প্রান্তর,

নারকীয় অন্ধকার পার হয়ে তারা আসে পাহাড়চূড়ায়:
লেনিন, ষ্টালিন, জুখভ্ ও গোর্কি,
তাদের আমরা চিনি। কিন্তু বুঝিনা তাকে,
দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,
দু' নৌকার যাত্রী, এই বাঙালী কবিকে,
বুঝি না নিজেকে।

৪

কলনির দুর্বিপাকে ক্লীবের বিলাপ
ইতিহাস ক্ষমাহীন, ক্রন্দনে কী লাভ।
ময়দানের মাটিতে গোধূলির ছাপ,
স্তব্ধ চিল, থেমে গেছে চড়ুয়ের নাচ।
অনাত্মীয় ভিড়ে নগরের রাস্তা ভরে
কফির মলিন রং আমার অন্তরে।
কূপের মণ্ডুক আমি, ঘুমে শুনি কালের প্রপাত,
মহাদেশ আলোড়িত, রাত্রি ছেঁড়ে আলোর করাত।
রাত্রি আর সকালের গূঢ় সন্ধিক্ষণে
স্বপ্নে দেখি শূন্যে ওঠে সোনালি ঈগল,
মাত্রাবদ্ধ পদক্ষেপে অচেনা যাত্রীরা—
আমারি দেশের লোক—পার হয়ে যায়
আমার কুটির, কী গান তাদের মুখে;
জড়োয়া গয়না গায়ে ভ্রান্তির গণিকা
এখনো তোমাকে ডাকে রঙীন গলিতে!

আমরা এসেছি খোলা মাঠে,
বর্বর চোয়াড়ে মাঠে আমাদের যাত্রা,
প্রতিপদে মৃত্যু, মৃত্যু জীবনের মাত্রা
আশা রাখি একদিন এ কান্তার পার হয়ে পাবো
লোকের বসতি, হরিৎ প্রান্তরে শ্যামবর্ণ মানুষের
গ্রাম্য গানে গোধূলিতে মেঠো পথ ভরে,
পরিচ্ছন্ন খোশ্‌গল্পে মুখরিত ঘনিষ্ঠ নগর,
বাংলার লোহিত সকালে সকলের অক্লান্ত শফর।

উদয়গিরি-খণ্ডগিরি
(তোমার দেখা শেষ কবিতা)

মণীন্দ্র রায়

উপল বন্ধুর পোড়ো মাঠে
সহসা উচ্ছল হ'ল কঠিন আবেগ।
প্রাণের জঙ্গম লীলা শূন্যতার এ উষর হাটে
এনে দিল পাহাড়ের মেঘ!

দৃষ্টির অতীত বেয়ে ধাপে ধাপে করি আরোহণ
সে অনড় লিখনের দুর্গম চূড়ায়।
এক কামনার দেহে দ্বিধাগ্রস্ত যেন দুটি স্তন!
সহস্র স্বপ্নের বীজ কাঁপে তার নির্জন গুহায়।

স্তূপীকৃত পাষাণের স্পন্দিত শরীর
কী কথা রেখেছে মৌনে বন্ধ্যা ধরিত্রীর
উদ্ভিন্ন রেখায়, জানা নাহি যায়।
শুধু থাকে ধূ ধূ মাঠ ছড়ায়ে পথের মহিমায়
অতীতের ওঠাপড়া, শান্তি পাওয়া, অশান্ত ইসারা!
শতাব্দীর শূন্য বুকে ক্ষণতরে জীবনের সাড়া।

পৃথিবীর জড়তা ও দেহের চঞ্চল
রোমাঞ্চিত জন্মমৃত্যু অন্ধকারে ফেলে যাত্রীদল
উত্থানের সমাধিতে এখানে নির্বাণ পেল বুঝি?
রৌদ্রজলে অবিকল ভাস্করের ছেনি থেকে খুঁজি
তারই নানা সঙ্গতির সুর।
জনহীন পাহাড়ের পরিত্যক্ত গুহা আর বন
নেয় নি আশ্লেষ কেন অশ্লীল মৃত্যুর,
দ্বিধাগ্রস্ত দুটি স্তন আজো টানে সংহত জীবন
কোন্ সঞ্জীবনী রসে, কে দেবে উত্তর?
মোহ তবু জাগে মনে, স্বপ্ন হানে কঠিন পাথর!
মানুষ অতিথি যারা এইখানে ছিল একদিন
তারা তো নিশ্চিহ্ন আজ, সৃষ্টি অমলিন
আজো আছে! মানুষেরই আবেগে চিন্তায়
রূপায়িত গুহামূর্তি, শতাব্দীর মৌন তপোবন
মানুষেরই অনুষঙ্গে পরিপূর্ণ কানায়-কানায়।

এ অরণ্য এ পাহাড় জানে না জীবন,
চিরায়ু করেছে যারা তারা তো নশ্বর!
তাই কি এ মোহ জাগে, স্বপ্ন হানে কঠিন পাথর?
কে দেবে উত্তর?
দেখি শুধু মৃত্তিকার উর্ধ্বচারী আশা
তিমির-বিস্মৃতি ছিঁড়ে খোঁজে এক পাথরের নীলকণ্ঠ ভাষা॥

একটি বৈদিক স্তোত্র

প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১)

সদ্যোজাত তৃণের সবুজ অগ্নির উৎস-সন্ধানে কে যাবে আমার সঙ্গে!
যাবে না কেউ তারা জানি
সাজানো জীবন-দর্শনে যারা পরস্পরের চোখে কাজল পরাচ্ছে;
যাবে না জানি আধুনিক আধুনিকা আমার সঙ্গে,
চরিত্রহীন পলিটিক্স্ আর উপলব্ধিহীন সাহিত্য যাদের মন ভরাচ্ছে।
যাবে দু'চার জন, শান্ত উজ্জ্বলতার সুরকে যারা সামান্য ব'লে মানে না,
নাগরিকতা স্বর্ণমৃগ হ'য়ে যাদের টানে না।

(২)

জীবন-প্রসারণের কাহিনী অজস্র ইন্দ্রজালের মতো।
ফুল থেকে ফলে, ফল থেকে বীজে বাহিত হাওয়ার কাহিনী
তীব্র-জ্ঞানদ্যুতিময়;
গোলাপের কুঁকড়ে যাওয়া, মানুষের শিরার রক্ত চূর্ণ হ'য়ে যাওয়া,
কোন্ অদৃশ্য শত্রুর এক চুমুকে
হরিণাক্ষ যৌবনের ঠাণ্ডা মোম হ'য়ে জমে আসা,—
এ সবের পেছনে যে সংগ্রামশীল তত্ত্ব সূক্ষ্মোচ্চারিত,
এই সন্ধ্যায় তার সন্ধানে আমার চেতনার নৌকা ভাস্‌ল।

(৩)

মুহূর্ত্তগুলির আব্‌ছায়া-হাত থেকে কী যেন অমি কুড়িয়ে নিতে চাই ;
সময়ের কবরী থেকে আলেয়ার ফুল খ'সে পড়ে,
ভুল ক'রে ভাবি তারা,—আশা আনে অন্ধকার ;
মিথ্যা বসন্তজ্বরে দিনরাত্রি আমার কম্পমান,
ড্রয়িংরুমের খেলা রাখো।
এসো এবার ফিরি।
সেখান থেকে ফিরে এসে আবার ঠাণ্ডা মাটির ঘ্রাণ নিই,—
লক্ষকোটী জীবপ্রাণীর ভিজে মৃত্যুস্পন্দিত নরম শব
হাজার বছর ধরে যে মাটিকে ঠাণ্ডা ক'রে আস্‌ছে,
কবি, চিত্রকর মনীষীদের তনুচুম্বিত
সেই পুরানো বসুন্ধরার বিদ্যুতে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে নিই।
পাণ্ডিত্য আর সমাজকে অনেক দিয়েছি প্রশ্রয়,—
এবার বিদায় ;
তাদের তটরেখা মিলিয়ে এলে সমুদ্রে আবার চাঁদ উঠবে।

ফুলের মূল্য

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বললে এসে সোমেশ,
"আমার ঘরের আঙিনাতে ফুটেছে বেলফুল,
মনে হলো মানাবে বেশ তোমার চুলে,
তাই এনেছি তুলে।
গ্রহণ করে ধন্য করো, রানি,
ওরই মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার মনের বাণী।"
লাজুক ফুলের মতোই তারে লাগল আমার ভালো।
একটুখানি পরে
বললে আবার দ্বিধাভরে,
"সহজ সুরে এবার তোমার মনের কথা বলো,
ভয় লাগে যে দেখে তোমার নয়ন ছলোছলো।"
কইনু তখন ধরা গলায় একটু থামি' থামি',
"এ ফুল নেবার অধিকার যে হারিয়েছি আজ আমি।
দেখেছিলাম আরেক প্রাতে
ফুলের মালা আরেকজনের হাতে।

অস্ফুট সেই কুঁড়ির ভাষা,
আমার মনে জাগিয়েছিল না জানি কোন্ আশা।
বুঝিনি ত' সে-ফুল যে তার প্রাণের ভাষা নয়,
কেবলি তার চপল মনের ক্ষণিক পরিচয়।
আমার মনে আজও সে-ফুল বিঁধে আছে,
উপড়ে তাকে ফেলতে পারি না যে।'
স্তব্ধ হবার পালা আবার এলো।
খানিক পরে বললে সোমেশ, "তৃষ্ণা বড় পেলো;
যাও ত', রানি, এনে দাও ত' জল।"
উঠে গেলুম না বুঝে তার ছল।
ফিরে দেখি, কেউ কোথা নেই, শূন্য আমার ঘর,
ফুলগুলি সব ছড়িয়ে আছে কঠিন মাটির 'পর।
প্রভাত আলো রইল চেয়ে ঝরা ফুলের দিকে।
তাদের তুলে নিতে গেলেম, অশ্রুভরা চোখে।
থরথরিয়ে কাঁপল যে হাত উঠলো কেঁদে প্রাণ,
ফুলের অবহেলায় এ যে আপন অপমান।

নদী

সতী দেবী

বসেছি হেথায় বটের স্নিগ্ধ ছায়ে—
নিরিবিলি ঐ বহিয়া চলেছে নদী,
ছোট-ছোট ঢেউ বাঁধা নৌকোর গায়ে
চুপে-চুপে কী যে বলে।
ছিপের মাথায় বসিয়া রয়েছে কাক,
কালো ছায়া তার কালো জলে গেছে মিশে—
ছোট পাখি আসে কোন্ দূর থেকে উড়ে
ক্লান্ত দিনের অস্ফুট ভাষা ঠোঁটে—
সূর্যের ছায়া চিক্‌চিক্ করে জলে,
স্তব্ধ দ্বিপ্রহর,—
ফেনময় মুখে তটিনী রুদ্ধশ্বাস,
তবু সেথা কাঁপে স্বচ্ছ সূর্যছায়া
রমণী-নদীর হৃদয় পারে না সূর্যেরে ঠেলে দিতে—
দুর্বল সে যে, দুর্বল!
রমণী-নদীর হৃদয় জড়ায় দীপ্ত সূর্যছায়া,
তাই ছলছল, তাই ছলছল জল।

তিনটি কবিতা

অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী

একপশ্‌লা

ছিলে তুমি একটুকরো পথিক মেঘ।
মনের আকাশে কতবার করেচ আনাগোনা।
ধরা-ছোঁয়ার বাইরে জেনে ছিলেম উদাস হ'য়ে ;—
কাঙাল-চোখে চেয়ে ছিলেম তোমার দানের প্রত্যাশায়।

প্রাণের শিকড় নেমেছিল উষর মাটিতে—
না ছিল জল, না রস !
কি জানি, বোধ হয় দয়া হ'ল তোমার :
নেমে এলে মেদুর হ'য়ে
করুণায় গ'লে,—
একপশ্‌লায় ঢেলে দিলে বুকের সুধা।
তারপর দেখি, আমার শীর্ণ শাখা
ভ'রে উঠেচে কখন নতুন মঞ্জরীতে।

উজান

নদীর স্রোতে হেলে-দুলে ফুলগুলো চলেচে ভেসে ;
কতদূর যাবে ওরা।
ওদের গতি সমুখ পানে।
নতুন নতুন তীরের দৃশ্য দেখ্‌চে ওরা।
নদীর পাড়ে আর একটা ফুল প'ড়ে ;
ও দেখচে বেগবান্ ফুলগুলোকে,
নিতান্ত উদাস হ'য়ে।
ছিল যখন জোয়ার ;
ও তখন ভেসে চলেছিল ওদের মতন ;
এখন পড়েচে ভাটা ;
নির্মম স্রোতের বেগ ওকে ঠেলে রেখে গেছে তীরে।

চাঁদ

আঁকাবাঁকা
শালের কালো কালো শাখাগুলো :
তার ফাঁকে রাধিকা চাঁদের হাসি ;

সদ্য হাড়-ভাঙা খাটুনী খেটে এসেচি,
এখন অবসর ;
তুমি এসে বসেচ পাশে।
আমার অশ্রান্ত কর্মের মুহূর্তগুলো
শালের কালো কালো শাখার মতন জটিল, কুটিল ;
তার ফাঁকে তোমার মুখখানি আমার চাঁদ।

কনকচাঁপা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কনক চাঁপার গন্ধ পেয়েছ অন্ধকারে ?
মদিরগন্ধা কনক চাঁপা।
পাওনি ?
তবে এইখানে এস আলোটা নেবাও,
কনক চাঁপার গন্ধে উধাও
মন নিয়ে শুধু খেলা করে যাও
আপন মনে
আধ-তন্দ্রায় আবিষ্ট মন আলিংগনে।
এ তরু বিলায় ঘুমের শ্রাবণ
তারি সাথে তার কালোর প্লাবন
আশ্লেষে ভরে সারা দেহ মন
নিবিড় করে।
রাতের তরুণী কনক চাঁপার
অসীম আঁধারে চলে অভিসার
সারা রাত ধরে চলে শৃংগার
শরীর ভরে।
ঘন আনন্দে কনক চাঁপার ছন্দ ঝরে।
আমরাও তাই এস বসি এই অন্ধকারে
আলোটা নেবাও, দরজা ভেজাও, এস না কাছে,
শুধু মনে-মনে অনুভব করো মনের পারে
কত ফুল ফোটে কনকচাঁপার তন্বী গাছে।
হাল্‌কা হাওয়ায় এ তরু শিখর ঈষৎ কাঁপা,
তাতে আছে শত কবিতা-কুমারী কনক চাঁপা,
কনক চাঁপা॥

কালো পাহাড়

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বারবার শুধু এক কালো পাহাড়ের ছায়া
অনুভব করি ঃ
বোবা, কালো, মৃত সেই পাহাড়।
সেখানে কি কোনোদিন গিয়েছিলুম ?

ট্রামে ভিড়, উত্তরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে,
সিগারেটের ছাই চোখে এসে লাগলো,
কে যেন চাকরি পেয়েছে, খেলার মাঠ,
সেকেণ্ড ফ্রন্ট, যুদ্ধ শেষ হবে—
কিন্তু মনের মধ্যে বারবার সেই কালো পাহাড়
ফিরে ফিরে আসছে।

আমাদের মতো যে বাড়ে না, বাঁচে না, খুসি হয় না,
আমাদের মতো যে জাগে না, ঘুমোয় না, ভাবে না,
সেই রকম এক বিরাট কৃষ্ণ উপস্থিতি
মনের মধ্যে আসছে ঘুরে ঘুরে।
সেই পাহাড়ে কি কোনোদিন গিয়েছিলুম ?

মধ্য দিনে বাঁশবনের সবুজ জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়ছে
শুকনো পাতা আর ভিজে ফার্ন
আর ঝিঁঝির ডাক।
তুমি কথা কইলে।
এখানে একটু বসবে ?
কি গান গুনগুন করছো ?
পাহাড়ি হাওয়ায় তোমার শুকনো চুল উড়ছে।

এ কিন্তু সে-পাহাড়ের নয়
যার সৌখীন স্মৃতি মাঝে মাঝে ফিরে আসে।
এই কালো পাহাড় বিরাট অথচ স্তব্ধ,
এর চাপ অহরহ সহ্য করি অথচ মৃত,

এ-পাহাড় শুধু আমার।
বোবা আর কালো
বারবার অনুভব করি এর ছায়া—
সেখানে কি কোনোদিন গিয়েছিলুম ?

পরাজিতা

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

সুন্দরী আমি, সে-কথা ত প্রিয়, শুনেছি অনেকবার
আমার কোমল করপল্লবে নিহিত পুষ্পসার।
জীবনের শিখা নয়নে আমার, মরণ ঠোঁটের কোণে
ঘন কালো চুল জড়ায় তোমারে নিবিড় সম্মোহনে।
আমার পরশে মাটি ফুটে ওঠে ফুল হয়ে রাশি রাশি,
আমার স্তব্ধ কথাটি তোমার হৃদয়ে বাজায় বাঁশি।
সব জানি, প্রিয়, তবু এও জানি এ মোহের শেষ আছে,
স্বপ্ন ভাঙিবে, খেলা শেষ হবে, তখনো কি র'বে কাছে ?
আমারে তো তুমি ভালবাস নাই, এ-দেহে বেসেছ ভালো
দেহের তৃষ্ণা মিটিবে যখনি, সব আলো হবে কালো।
তবে তাই হোক ! ক্ষণিকের খেলা, সে-ও তা মিথ্যা নয়,
রঙিন ক্ষণিকে দেখি বসে-বসে অসীমের অভিনয়।
চিহ্ন না থাক তোমার প্রেমের শূন্য রাত্রিশেষে,
তবু বলো আজ ভালবাসিয়াছো, বলো, বলো কাছে এসে।
আমারে অন্ধ করে দাও তব বন্যার মত প্রেমে,
এ-দেহ ছাড়ায়ে অকূল আকাশ জীবনে আসুক নেমে।
দূর হোক যত দ্বিধা ভয় আর ঘুচে যাক্ সংশয়
তোমার প্রাণের পূর্ণ পরশে হোক মম পরাজয়।

ঘরমুখো

তাও ইউয়ানমিং

অনুবাদক—অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অনুবাদকের মন্তব্য : তাও ইউয়ানমিং চীনের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে একজন। এঁর লেখা খুব বেশী পাওয়া যায় না, তবে যা তিনি লিখে গেছেন তাতে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে গেছেন। নীচের কবিতাটি চীনা-কাব্যের একটি নির্খুত নিদর্শন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যে এরকম কবিতা লেখা হয়েছে এইটেই আশ্চর্য্যের বিষয়। মূল চীনা থেকে অনুবাদ করেছি।]

১। এবার আমি রওনা দেবো ঘরমুখো
শূন্য যে মোর মালঞ্চ মাঠ
এবার তবে চলি—
দেহের তরে অন্তর আজ কোথা ?
আজকে তবে কেন
এমন দীর্ঘশ্বাস
নিজের শোকে সঙ্গীহারা কাঁদা ॥

২। যা করেছি হয়নি সে তো ভাল
এটা তো ঠিক জানি—
ভবিষ্যতের উপর আমার দৃঢ় মুঠি।
হারিয়ে আমি যাইনি বেশী দূর।
এখন বুঝি—
আজকে আমি সত্য হলেম
কালকে পূর্ণ ত্রুটি আমার মনেই ছিল ॥

৩। উর্ম্মি কেটে নৌকা চলে
আস্তে ওঠে আস্তে নামে
লাগায় নাচন উত্তরীয়ে উতল হাওয়া।
সীমান্তের এই প্রহরীকে সমুখ পানের রাস্তা শুধোই
দুঃখী মনের সামনে উষা
আলোছায়ার মাতন জাগায় ॥

৪। ওই যে আমার ঘরের ছাদের
কোণ দেখা যায়
আনন্দেতে আত্মহারা ছুটে চলি
আমার ভৃত্য জানায় প্রণাম বেরিয়ে এসে
পুত্র আমার দাঁড়িয়ে দ্বারে প্রীতি জানায় ॥

৫। মালঞ্চে মোর পথগুলি আজ রুক্ষ ফাঁকা
ক্রিসান্থিমাম, আর ধূ ধূ ঝাউ
তবুও আছে জেগে।
পুত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকেই দেখি
সামনে আমার সুরাপাত্র পূর্ণ সুরা ॥

৬। পাত্র টেনে পেয়ালা ভরে
আড়চোখেতে দেখি চেয়ে
গাছের ডালে পাতা ঝরা।
আজকে আমি সুখী।
দক্ষিণের ওই জানলাটিতে হেলান দিয়ে
আজকে আমি সুখী।
কক্ষ আমার ক্ষুদ্র, তবু
আলস্যে আর আরামেতে পূর্ণ আমি ॥

৭। প্রতিদিনের পায়চারিতে
বাগান আমার নিত্য নতুন।
দরজা আছে বন্ধ তবু।
গাছের ডালের লাঠি নিয়ে
দ্বিধাবিহীন বেরিয়ে পড়ি
ক্লান্ত হলে বসি
চাউনিতে মোর নেইকো কোনও ঠিকঠিকানা ॥

৮। ঐ পাহাড়ের মাথা থেকে
মেঘ সরে যায় নিরুদ্দেশে।
ক্লান্ত পাখী বাসা খুঁজে উড়ে চলে ঝাপসা গোধূলিতে।
একলা ঝাউএর আশেপাশে
একলা আমি বেড়াই ঘুরে ॥

৯। এবার আমি রওনা হবো ঘরের দিকে
সঙ্গীহারা থাকবো আমি—
আমি, এবং আমার সমাজ—দুই আলাদা
এ দুয়ে মিল হবে না যে।
মিথ্যা-খোঁজা খুঁজবো না আর ॥

১০। পরিজনের স্নিগ্ধ কথা,
বই ও বীণা,
দুঃখ ভোলার এই তো উপায়
এই তো আমি ভালবাসি।
আমার প্রজা বলবে এসে
"বসন্ত যে এলো!"
তখন উঠে চলবো হেঁটে
পশ্চিমের ওই মাঠের দিকে ॥

১১। ঢাকা গাড়ির ভিতরে কেউ,
ধরবে বা কেউ নৌকোতে দাঁড়।
স্তব্ধ গভীর পাহাড়ী খাঁজ উঁচুনীচু,
পৌছবো ঠিক পাহাড়-চূড়ায় ॥

১২। গাছে গাছে পড়লো সাড়া,
প্রাণের আজি পরশ এলো
সবুজ হয়ে উঠলো ওরা—
জলের স্রোতে কল্‌কলানি।
সব কিছুরই সময় আছে;
আমার বুকে ঈর্ষা জাগায়।
দিন যে এবার ঘনিয়ে এলো
মন কি তারি দেয় ইশারা ॥

১৩। আর কিবা তোর করার আছে
শরীর নিয়ে মাটির উপর থাকবি কদিন?
ব্যস্ত স্বভাব ছেড়েছুড়ে
কাটিয়ে দে দিন হেলাফেলায় ॥

১৪। নাইবা গেলাম স্বর্গে আমি
অর্থ, খ্যাতি নাইবা পেলাম—
একটি উজল দিনের আশায়
থাকবো বসে।
একলা সেদিন মাঠে এসে
পাশে রেখে শক্ত লাঠি—

খুঁড়বো মাটি, তুলবো কাঁটা।
এই তো ভালবাসি ॥

১৫। পূবের দিকে ওই টিপিটার
উপর উঠে
শিষ দেবো একটানা।
নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলের ধারে বসে
আপন মনে লিখবো ছড়া।
জীবনের এই কয়েকটা দিন আনন্দেতে কাটিয়ে দিয়ে,
দেব পাড়ি কোন অজানার উজানস্রোতে
মনে আমার থাকবে না আর প্রশ্ন, দ্বিধা ॥

রূপলোকে

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

রূপ মোরে দিলো ডাক।
রূপ, রূপ, রূপ দিলো ডাক।
সন্ধ্যার আরক্ত মেঘে
রূপ দিলো ডাক। নীরব প্রশান্তি মাঝে রূপ দিলো ডাক
দুরন্ত ঝড়ের বেগে
রূপ জয় ক'রে নিলো মৌন দেশগুলি,
এ সন্ধ্যার বিজয়ী সম্রাট।
ঘুমে ঘুমে
আপনারে দিলো বিকীরিয়া;
ঘুম মোর উঠিল জ্বলিয়া!
অশোকে, কুঙ্কুমে
পার্বতীর মতো সেজে এল অরুণে অরুণে!
মণির কুসুম পরি' কেশে
নিশার সমুদ্র সম উজ্জ্বলি', উচ্ছ্বসি'
বিদ্যুৎ-অধীর-হাসি হেসে
রূপ এলো, রূপের ঝটিকা!
তিমির বসন দিয়ে নিয়ে এলো ঢেকে
সুতীব্র মধুর মৃত্যু, সুন্দর নিষ্ঠুর,
দুর্নিবার সম্মোহনে রূপ গেল ডেকে।

আমার নয়নে নেই
মহেশের দুর্জ্জয় পাবক।
সব রঙ্ মুছে মুছে সব দিক্ করি একাকার
আমারে ঘিরিয়া এল উন্মথিত আদিম রাত্রির অন্ধকার!
রমণীয় কত সুর তার
বেদনায় ছিঁড়ে গেল, পাখীর সুরের ডানা
দিকে দিকে উড়ে গেল
ছিঁড়ে, ছিঁড়ে, কুসুমের দলগুলি ছিঁড়ে,
গান ভেঙে, উর্ব্বশীর চরণ-মঞ্জীর ভেঙে ভেঙে,
সৃষ্টি হোল সুরহীন ভয়ংকর ঝড়!
ধীরে ধীরে
মোহ মুছে এল: রূপ নয়, রূপ নয়, তিক্ত কালকূট,
আমি পান করিয়াছি এই কালকূট,
রূপ নয়, রূপ নয়, মৃত্যু-গর্ভ সুচারু সম্পুট!

হৃদয় কাঁদিল চুপে চুপে
নিরাশ্বাস বালকের মতো!
কে মোরে বলিল স্নেহে ডেকে
জননীর সকরুণ চোখে: 'ঘুমাও, ঘুমাও।'
পরম নির্ভয়ে মোরে ঢেকে
এল তাঁর শুভ্র হাত, শেফালি-কোমল দুই বাহু।
অতি ধীরে, কানে-কানে,
মিনতি-করুণ-স্বরে: 'ঘুমাও, ঘুমাও',
প্রাণ মোর ভরে গেল ঘুমে, ঘুম-ঘুম গানে,
মহান্ শান্তির সুরে, সুষম রূপের সুরে সুরে,
অতল শান্তির মহাসমুদ্রের স্থির অন্ধকারে
অচঞ্চল ধ্যানে, দূরে দূরে..
সকল রূপের পরপারে।
রূপ যেথা ভাব হ'য়ে ফোটে, নামহীন সেই পরপারে।
আলো যেথা গান হ'য়ে, গান যেথা আলোর কুসুম হ'য়ে ফোটে,
সব রূপ, সব গন্ধ, সব গান যেথা এসে মেশে,
সুন্দরীর আঁখি যেথা সন্ধ্যার হ্রদের মতো,
সেই শান্ত সুন্দরের দেশে!

আর একবার দেখা

হরপ্রসাদ মিত্র

চিবুকের তিল
গলায় নতুন খাঁজ,
কপালে নতুন রেখা।
আর একবার দেখা।
সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত
লম্বা পা ফেলে,
শিষ দিয়ে
নৈঃশব্দ্যে ফুরোলো।
আবার
দেবদারুর সর্বাংগে
শিহরিত সবুজ।
রেশমের পর্দার নীচে
চেনা মুখ।
কে ও?—ফাল্গুন!
সরসীতে ষোড়শী,
পলাশে আগুন।
সেখানে নিমন্ত্রণের
চিঠি পাইনি
তুমি নেই, আমিও যাইনি
হঠাৎ ট্রামে
কে ওঠে, কে নামে—
এই যে সুলেখা!
চিবুকের তিল,
গলায় নতুন খাঁজ,
কপালে নতুন রেখা!
আর একবার দেখা।

কোনো এক তরুণ ও তরুণীদের জন্য

প্রতিভা বসু

সাতাশে আটাশে বলো কী তফাৎ ফলত,
বিয়েটাই বৃদ্ধ? এই কথা হ'লো তো?
তাই যদি হয় তবে তুমিও তো তাই ভাই,
তুমিও তো বৃদ্ধ! আমি যদি বৃদ্ধাই!
যুবতী সে কিসে হ'লে মল্লিকা চট্টো?
তার বুঝি স্বামী নেই? তাই হ'লো ছোট্টো?
স্বামীওলা মণিমালা টিপ নেই কপালে
কোমরে আঁচল গুঁজে খুকি হ'লো অকালে।
হাত পা ছড়িয়ে হাসে হীহী ক'রে বরুণা,
পঁয়তিরিশেও তাই সে-ও হ'লো তরুণা।
মাথার কাপড় খোলা, খাটো চুল ফাঁপানো,
ক্ষণে-ক্ষণে অকারণে কণ্ঠটি কাঁপানো,
সারাদেহে অঙ্কিত বিচিত্র প্রসাধন,
এমন তরুণীপনা নয় কিছু অসাধন।
তারো মোহে মজে কত নেই লেখাজোখা যে,
তোমারি মতন জেনো তারা অতি বোকা যে।
চেষ্টায় ছেঁড়া যায় প্রকৃতির পরদা
কখনো রেখো না মনে এতখানি স্পর্দ্ধা।
বৃদ্ধ কি বৃদ্ধা হয় নাকো বয়সে
সাজ আর সজ্জা তারুণ্য নয় সে।
আসল কথা কী, জানো, মনটাই মানুষের
সত্যি যা। আর সব লীলাখেলা ফানুষের।

সমালোচনা

জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। সপ্তম মুদ্রণ ও দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

দেশমান্য মহাপুরুষদের প্রতি কর্তব্যপালনের তথা শ্রদ্ধাপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তাঁদের বাণীরক্ষা ও চরিতরচনা। রবীন্দ্রনাথের বাণীরক্ষার দায়িত্ব প্রধানত বিশ্বভারতীর, এবং রবীন্দ্ররচনাবলী-প্রকাশের মধ্যেই ওই বাণীরক্ষার অভিপ্রায় পরিস্ফুট হয়েছে। লোকপ্রিয়তার তাড়নায় ও সত্বরতার প্রয়োজনে উক্ত রচনাবলী অভীষ্ট আদর্শানুরূপে প্রকাশিত হতে না পারলেও এগুলিই যে বাংলা দেশে গ্রন্থসম্পাদন ও প্রকাশের সুষ্ঠুতম দৃষ্টান্ত, একথা অবশ্যস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতরচনাও দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। ইহলোক থেকে তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ অতীতকালের পটভূমিকায় ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে দেশের চিত্তে পুনরাবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং এখন থেকেই তাঁকে ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে দেখা প্রয়োজন এবং সে দৃষ্টি হওয়া চাই তথ্যনিষ্ঠ ও স্বচ্ছ। কেননা, এখন থেকে যদি তাঁকে আমরা অনাবিল ও তথ্যগত দৃষ্টি নিয়ে দেখার প্রয়াস না করি তাহলে ভবিষ্যতে তাঁর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা রোধ করা কঠিন হবে। সুখের বিষয় এখন থেকেই দেশে রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতরচনার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য উপাদানের অভাবে এসব জীবন-চরিত ত্রুটিহীন হবার সম্ভাবনা কম। বস্তুত রবীন্দ্রজীবনীর প্রামাণিক উপাদানসংগ্রহই হচ্ছে প্রাথমিক কর্তব্য। পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত থাকতে পারে। কিন্তু উপাদানসংগ্রহের কাজ বর্তমানের কর্তব্য। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতরচনার অন্যতম প্রধান অবলম্বন হচ্ছে তাঁরই স্মৃতিকথা। জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয়, এই তিনখানি গ্রন্থ ছাড়াও বহু চিঠিপত্রে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা স্থানে উক্তপ্রকার আত্মস্মৃতি ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত স্মৃতিকথাকে যথোচিতভাবে সংকলন ও সম্পাদন করা প্রয়োজন।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে এই প্রাথমিক কাজের শুভসূচনা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর এই অত্যল্পকালের মধ্যেই যে তাঁর জীবনস্মৃতি এমন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হল, এটা বিশ্বভারতীর পক্ষে যেমন শ্লাঘার বিষয়, দেশের পক্ষেও তেমনি আনন্দের বিষয়। বস্তুত মুদ্রণাদি বাহ্য পারিপাট্য তথা সম্পাদনের উৎকর্ষের দিক্ থেকে এই গ্রন্থখানিকে নিঃসন্দেহে আদর্শস্থানীয় বলে স্বীকার করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'জীবনস্মৃতি' রচনা করেছিলেন তখন জীবনবৃত্তান্ত বা ইতিহাস লেখা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না—তিনি চেয়েছিলেন "নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে" ফুটিয়ে তুলে সাহিত্য রচনা করতে। তাই এই গ্রন্থে স্থানকালপাত্রবিষয়ক ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে কিছুমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে স্মৃতিচিত্রকে আশ্রয় করে সাহিত্যরচনার এই যে প্রয়াস, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। বস্তুত জীবনস্মৃতি গ্রন্থের সাহিত্যমর্যাদা একবাক্যে স্বীকৃত এবং এই স্বীকৃতি বহুকাল অব্যাহত থাকবে সন্দেহ নেই। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যবিচার আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। আমাদের বক্তব্য এই যে, সাহিত্যিক মূল্যই এ গ্রন্থের একমাত্র মূল্য নয়। জীবনবৃত্তান্ত হিসাবেও এর মর্যাদা উপেক্ষণীয় নয়, যদিও রবীন্দ্রনাথের নিজের মতে "সে হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক"। কালিদাস মেঘদূত লিখেছিলেন কাব্য হিসাবেই। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনার উপাদান হিসাবেও ওই গ্রন্থের মূল্য কম নয়, একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন।

জীবনস্মৃতির বর্তমান সংস্করণে তার জীবনবৃত্তান্তবিষয়ক অর্থাৎ ঐতিহাসিক দিকটাকে উপেক্ষা না করে তাকে যথোচিতভাবেই পরিস্ফুট করে তোলার প্রশংসনীয় প্রয়াস করা হয়েছে। তাই এই সংস্করণে গ্রন্থখানির উপযোগিতা বহুলপরিমাণে বর্ধিত হয়েছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। শুধু যে গ্রন্থোক্ত স্থানকালপাত্রের পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা নয়—'গ্রন্থপরিচয়' নামক সুবিস্তৃত পরিশিষ্টাংশে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন জীবনবৃত্তান্তের সমস্ত উপাদানগুলিকে সযত্নে সংকলন করা হয়েছে। বস্তুত এই গ্রন্থপরিচয় অংশটুকু 'গ্রন্থ'-পরিচয়মাত্রই নয়, এটিকে আসলে সংক্ষিপ্ত রবীন্দ্রপরিচয় অর্থাৎ রবীন্দ্রজীবনীর উপাদানগ্রন্থ বা source-book বলে অভিহিত করলেই সংগত হয়। ভবিষ্যতে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত রচনা করবেন তাঁদের পক্ষে এই সংস্করণটির উপর বহুলপরিমাণে নির্ভর করতে হবে। তা ছাড়া, জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রই এই সংস্করণ পাঠে উপকৃত হবেন; কেননা এতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমন বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংকলিত হয়েছে যা সহজলভ্য ছিল না। এই পরিচয় অংশটুকু ছাড়াও গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রায় প্রতিপৃষ্ঠাতেই বহু পাদটীকাতে অকৃপণভাবে নানা তথ্যের সমাবেশ করা হয়েছে, যা অনুসন্ধিৎসুদের জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করতে খুবই সহায়তা করবে। সর্বশেষে একটি পূর্ণাঙ্গ বংশলতিকা ও উল্লেখপঞ্জী দেওয়াতে এই গ্রন্থের ব্যবহারসৌকর্য বহুলাংশে বর্ধিত হয়েছে। বংশলতিকাটি এস্থানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা সন তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে এরকম নির্ভুল বংশলতিকা আজ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

সব দিক্ বিবেচনা করে একথা অসংশয়ে বলা যায় যে, আমাদের দেশে গ্রন্থসম্পাদনের এমন সৌষ্ঠব ও উচ্চ আদর্শ খুবই বিরল। গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই সংস্করণ প্রস্তুত করার ভার অর্পিত হয়েছিল শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপর। এই সংস্করণের দ্বারা সাধারণ পাঠক তথা জিজ্ঞাসুদের যে পরম সহায়তা করা হল এবং গবেষকদের পথ যেরূপ প্রশস্ত করা হল, তাতে নির্মলবাবু সাহিত্যজগতের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তথ্যসংকলনে তথা গ্রন্থসম্পাদনে তিনি যে কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা যে-কোনো প্রবীণ সম্পাদকের পক্ষেও কৃতিত্বের বিষয় বলে গণ্য হত।

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবনবৃত্তান্তের মূল ধারাটি বর্ণিত হয়েছে। এই অংশটুকু দুর্জ্ঞেয় অথচ এটুকুই রবীন্দ্রজীবনের ভিত্তি, তাই এই অংশের উপর আলোকপাতের মূল্য এত বেশি। কিন্তু তা হলেও রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনকাহিনীর প্রতিই সকলের আকর্ষণ বেশি। সুতরাং আশা করি নির্মলবাবু রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবন-বৃত্তান্তের উপাদান সংকলন করেও দেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন। জীবন-স্মৃতির সম্পাদনে তিনি যে শক্তি ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাতেই বিশ্বাস করি যে, আমাদের উক্ত আশা অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই সংস্করণটি আদর্শস্থানীয় বলে স্বীকার্য হলেও এটিতে কোথাও কোনো অপূর্ণতা নেই একথা বলা আমাদের অভিপ্রায় নয়। বস্তুত এরকম সংস্করণকে একেবারে নির্দোষ ও পূর্ণাঙ্গ করে তোলা অসম্ভব না হলেও খুবই দুঃসাধ্য। তা ছাড়া, সকলের মত ও আদর্শ সমান নয়। কাজেই ব্যক্তিগত মত ও আদর্শের বিচারে এখানে-সেখানে কিছু না কিছু ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা দেখানো কিছু কঠিন কাজ নয়। সুতরাং তালিকা করে ওরকম অপূর্ণতা দেখাবার প্রয়াস করা একান্তই অনাবশ্যক মনে করি। তথাপি দৃষ্টান্তস্বরূপ দুয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করলে আমার বক্তব্যটাও স্পষ্ট হতে পারে এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণ প্রকাশের সময়ে হয়তো সহায়তাও হতে পারে।

গ্রন্থপরিচয় অংশে বিষয়বিভাগ তথা মূল গ্রন্থের সঙ্গে এই অংশের বিষয়গুলির যোগাযোগ স্পষ্ট নয়। ভবিষ্যতে যদি গ্রন্থের অধ্যায়ভাগ অনুসারে এই অংশেও অধ্যায়ভাগ করে দেওয়া হয়, এবং গ্রন্থপরিচয়েরও একটি সূচী দেওয়া হয়, তাহলে এর উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত, উল্লেখপঞ্জীতে মূল গ্রন্থ তথা পাদটীকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ধরা হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত বিষয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা ধরা হয়নি। ধরলে খুবই ভালো হত। তৃতীয়ত, বংশলতিকার আগে কিংবা পরে যদি একটি কালানুক্রমিক

ঘটনার তালিকা থাকত তাহলে জীবনবৃত্তান্তের ধারা অনুসরণ করা আরও সহজ হত।

আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ৭৫ পৃষ্ঠায়—

ওকথা আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে ?

ইত্যাদি একটি গানের উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের আনুষঙ্গিক উক্তি থেকে ধারণা হয় গানটি বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের রচিত এবং তাঁরই "কী একটা কিম্ভূত কৌতুকনাট্য" বা Burlesque-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গানটি দ্বিজেন্দ্রনাথের নয় একথা মনে করার কারণ আছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) একাদশ শতকের কবি কৃষ্ণমিশ্রের "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নামক বিখ্যাত সংস্কৃত রূপক নাটকটিকে অবলম্বন করে একটি বাংলা নাটক রচনা করেন। নাম দেন "বোধেন্দুবিকাশ"। এটি প্রথমে প্রকাশিত হয় সংবাদপ্রভাকরে (১২৬৪ বৈশাখ-ভাদ্র)। পরে ঈশ্বরচন্দ্র এটিকে অনেক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপে গ্রন্থাকারে ছাপতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। ১২৭০ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত উক্ত নাটকের প্রথম তিন অঙ্ক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বোধেন্দুবিকাশ সর্বথা প্রবোধচন্দ্রোদয়ের বঙ্গানুবাদ নয়। ঈশ্বরগুপ্তের রচিত কতগুলি গান এবং কবিতাও এতে স্থান পেয়েছে। "ওকথা আর বোলো না, আর বোলো না" ইত্যাদি গানটিও এই নাটকেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং গানটি দ্বিজেন্দ্রনাথের নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায় তিনিই ঈশ্বরগুপ্তের এই গানটিকে একটি কৌতুকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। বস্তুত দ্বিজেন্দ্রনাথের এমন কোনো কৌতুকনাট্যের কথা জানা যায় না যাতে ও-গানটি আছে। এই গানটি যখন ঠাকুরবাড়িতে গাওয়া হত তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স অতি অল্প। কাজেই তখনকার স্মৃতিতে ভুলভ্রান্তি থাকার খুবই সম্ভাবনা। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে, এই গানটি লৌকিক ছন্দে রচিত এবং বাংলা সাহিত্যে লৌকিক ছন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক ঈশ্বরগুপ্তের বিশিষ্ট ভঙ্গিটিও এতে সুস্পষ্ট।

যা হোক, জীবনস্মৃতির আলোচ্যমান সংস্করণে গানটির রচয়িতা সম্পর্কে একটু উল্লেখ থাকলে ভালো হত।

আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাক। রবীন্দ্রনাথ "জল পড়ে, পাতা নড়ে" এই কথাদুটিকে স্মৃতিসুধায় অভিষিক্ত করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর করে গিয়েছেন। "আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা", তাঁর এই উক্তিই ওই কথাদুটিকে অমরত্ব দান করেছে। সুতরাং স্বভাবতই মনে কৌতূহল জাগে, আদিকবির এই প্রথম কবিতাটি তিনি পেলেন কোথায়। তাঁর উক্তি থেকেই জানা যায় "কর, খল প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল" পেয়েই তিনি ওই আদি

কবিতার সন্ধান পান। বোঝা যাচ্ছে এই কবিতাটি তাঁর প্রথম পাঠ্য-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঠ্যপুস্তক হবার এবং ওই চিরস্মরণীয় 'কবিতা'টির উৎসস্থল হবার গৌরবের অধিকারী কোন্ বই, তা অনুসন্ধানের বিষয় বই কি। জীবনস্মৃতির বর্তমান সংস্করণে সেই গৌরব দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরপ্রণীত 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগকে। এই পুস্তকখানির প্রকাশকাল ১৮৫৫ সাল। সুতরাং এখানির পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঠ্যপুস্তক হবার খুবই সম্ভাবনা ছিল সন্দেহ নেই। এই পুস্তকের বর্ণযোজনা অংশের প্রায় গোড়াতেই 'কর খল' শব্দ দুটিও আছে। কিন্তু এটিতে কোথাও "জল পড়ে, পাতা নড়ে" এই 'আদি কবিতা'টি নেই। অবশ্য অষ্টম পাঠে "কাক ডাকিতেছে। গরু চরিতেছে" ইত্যাদি গদ্য বাক্যের সঙ্গে "জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে" এই দুটি বাক্যও আছে। কিন্তু এ দুটিকে 'আদি কবির প্রথম কবিতা' আখ্যা দেওয়া চলে কি না সন্দেহ। বস্তুত এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে মিলের এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন উক্ত বর্ণপরিচয়ে সে মিলের লেশমাত্রও নেই। সমস্ত বইখানির আগাগোড়া নিছক গদ্য ভাষায় রচিত। যদি এই বই-খানিকেই উক্ত আদিকবিতার উৎস বলে ধরতে হয় তাহলে বলতে হবে উল্লিখিত গদ্য বাক্য দুটিকে উপলক্ষ্য করে ওই আদিকবিতা রবীন্দ্রনাথের শিশুমনেই প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল।

তৎকালীন আরেকখানি বহুপ্রচলিত প্রাথমিক পুস্তক হচ্ছে মদন-মোহন তর্কালংকারের 'শিশুশিক্ষা' প্রথমভাগ। প্রকাশকাল ১৮৪৯। মদনমোহন সেকালে ছন্দোবিলাসী কবি বলে খ্যাত ছিলেন। এই শিশু-শিক্ষাতেও ছন্দ এবং মিলের প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বস্তুত ছন্দ ও মিলের সাহায্যে প্রথম থেকেই শিশুমনে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়ে দেবার প্রয়াস এই পুস্তকখানির একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য তখনকার দিনে এতটা খ্যাতি লাভ করেছিল যে, লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁর সুখ্যাত 'কাব্যনির্ণয়' নামক পুস্তকের (১৮৬২) ছন্দ-প্রকরণে এই শিশুপাঠ্য পুস্তক থেকেও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শিশুচিত্ত এই বই থেকে ছন্দোমাধুর্যের প্রথম প্রেরণা লাভ করেছিল কি না ভেবে দেখা উচিত। এই পুস্তকের একেবারে গোড়াতেই 'কর খর, কল খল', ইত্যাদি বর্ণযোজনার ছন্দোবদ্ধ দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর কিছু পরেই আছে "জল পড়ে, ছাতি ধরে"। কিন্তু "পাতা নড়ে" নেই। এখান ছন্দোগত মিল আছে, কিন্তু তথ্যগত মিল নেই। পক্ষান্তরে বর্ণপরিচয়ে তথ্য ঠিক আছে, কিন্তু ছন্দ বা মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ হয়তো দুখানি বইই পড়েছিলেন এবং একটি থেকে ছন্দ ও মিল, আর অপরটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজের অজ্ঞাতসারেই ওই আদিকবিতাটি

৩

কল্পনা করে নিয়েছিলেন। যে ভাবেই ধরা যাক না কেন, এই আদি শ্লোকটি যে তিনি "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" রচনা করে নিয়েছিলেন সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। "আমার জীবনের আদিকবির প্রথম কবিতা"—এই আদিকবিটি রবীন্দ্রনাথের চিত্তেই বিরাজ করছিল, বাইরে তার অস্তিত্ব ছিল না,—এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য বলেই মনে করি। অবশ্য কোনো তৃতীয় পুস্তকের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করা যায় কি না, তাও ভেবে দেখা দরকার।

জীবনস্মৃতির বর্তমান সংস্করণে এই আদিকবিতাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনো সংশয় প্রকাশ না করে শুধু বর্ণপরিচয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে জিজ্ঞাসুদের সংশয় নিরস্ত হয় না।

এরকম ছোটোখাটো অপূর্ণতা বা মতপার্থক্যের আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে শুধু খুঁত ধরার প্রবৃত্তিই প্রমাণিত হবে, এই সংস্করণটির কিছুমাত্র মর্যাদালাঘব হবে না। কেননা, প্রথম প্রয়াসে যতদূর নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া সম্ভব' এই সংস্করণটি তাই হয়েছে। বস্তুত এই অল্প সময়ের মধ্যে জীবনস্মৃতির এমন একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত হতে পারবে, এটা সম্পূর্ণরূপেই আমাদের প্রত্যাশার বহির্ভূত ছিল। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুদের প্রত্যেকেরই এই পুস্তক একখণ্ড সংগ্রহ করে রাখা অত্যাবশ্যক বলে গণ্য হবে সন্দেহ নেই।

সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। পঞ্চম মুদ্রণ ও চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'র পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই সংস্করণের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যার পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে।

সঞ্চয়িতার প্রধান গৌরব এই যে, এর কবিতাগুলি সংকলনের ভার নিয়েছিলেন কবি নিজে। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলেছেন, কবিতা সংকলনের ভার "অন্যের উপরেই দিতাম। কেননা কবিতা যে লেখে কবিতাগুলির অন্তরের ইতিহাস তার কাছে সুস্পষ্ট। বাহিরের প্রকাশে কবিতাগুলি উজ্জ্বল হয়েছে কি না হয়তো সেটা তার পক্ষে নিশ্চিত বোঝা কোনো কোনো স্থলে সহজ হয় না।" তাঁর এই উক্তির মধ্যে অনেক-খানি বিনয় প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উক্তিকে সত্য বলে মেনে নিলেও এরূপ সংকলনের বিশেষ সার্থকতা আছে। কবি নিজে কোন্ কবিতাগুলিকে বিশেষভাবে স্বীকার করেন তা জানার মূল্য আছে। এই জন্যই বলেছি কবির স্বনির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ-গ্রন্থ বলেই সঞ্চয়িতার একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। শুধু তাই নয়।

সংকলনকালে বহু কবিতাই কবিকর্তৃক অল্পবিস্তর সংস্কৃত হয়েছে। ফলে অনেকগুলি কবিতার এই পরিমার্জিত রূপ গ্রন্থখানিকে কতক পরিমাণে নূতনত্ব দান করেছে। মূল গ্রন্থ থেকে এই নূতনত্বের স্বাদ পাওয়া যায় না।

সঞ্চয়িতা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালে। কবির জীবিতকালে আর দুটি সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় (১৩৪০) ও তৃতীয় (১৩৪৪) সংস্করণে কবি এক দিকে যেমন পরবর্তী কালে রচিত বহু কবিতা সংকলন করেন অপরদিকে তেমনি পূর্বসংকলিত অনেক কবিতাকে খণ্ডিত বা একেবারে বর্জন করেন। এই খণ্ডন বা বর্জনের হেতু গ্রন্থের আয়তনস্ফীতি। কিন্তু বর্তমান সংস্করণে আয়তনবৃদ্ধির ভয়ে নিরস্ত না হয়ে পূর্ববর্তী সংস্করণের কবিনির্বাচিত সব কবিতাই রক্ষা করা হয়েছে, খণ্ডিত অংশগুলিও যথাস্থানে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে কবির স্বনির্বাচনমর্যাদার গৌরবচিহ্নিত সমস্ত কবিতা এই সংস্করণেই সর্বপ্রথম সমগ্ররূপে প্রকাশিত হল।

১৩৪৩ সালের মাঘ মাস পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতাসংগ্রহ থেকে তিনশ পঞ্চান্নটিকে কবি এই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী করে গিয়েছেন। উক্ত তারিখের পূর্বে প্রকাশিত দুয়েকখানি গ্রন্থ (যেমন, 'লেখন') থেকে কবি কোনো কবিতা সংকলন করেননি, এবং উক্ত তারিখের পরে প্রকাশিত কোনো কবিতাও কবির স্বীয় নির্বাচনের অধিকারী হতে পারেনি। এই সংগ্রহগ্রন্থখানির পূর্ণতাবিধানের জন্য ঐরূপ ষোলোখানি পুস্তক থেকে বিরাশিটি কবিতা নির্বাচন করে গ্রন্থের শেষে সংযোজনবিভাগে স্থান দেওয়া হয়েছে।

তা ছাড়া, গীতবিতান থেকেও বত্রিশটি গান সংকলিত হয়ে এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান শুধু সুরমাধুর্যের জন্য নয় পরন্তু তার কাব্যমূল্যের জন্যও আমাদের অন্তরকে অভিভূত করে, একথা আজ সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও গীতবিতানকে 'গীতিকাব্য' বলে পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং গীতবিতান থেকে কতকগুলি গান নির্বাচন করা খুবই সংগত হয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাহন ত্রিবিধ। কতকগুলির বাহন বিচিত্র রকমের ছন্দ; কতকগুলির আশ্রয় 'অসংকুচিত' গদ্য; আর কতকগুলি সুরবিহারী, একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গীতিকবিতা। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গানের মূল রস কবিতারই রস, সুর তার বাহন মাত্র, সুরের আকাশে ছাড়া পেলেই তার মাধুর্য পূর্ণপ্রকাশিত হয়, এই তার বৈশিষ্ট্য। গদ্যকবিতার স্বরূপ প্রকাশ পায় পাঠে, পদ্যকবিতার প্রকাশ আবৃত্তিতে; আর গীতিকবিতার গানে, কিন্তু পাঠ বা আবৃত্তিতেও

তার রস সম্পূর্ণ মারা পড়ে না। সঞ্চয়িতায় পদ্যকবিতা ও গদ্যকবিতার পাশে গীতিকবিতাকেও স্থান দেওয়াতে পাঠকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ত্রিবিধ কবিতারই রসাস্বাদ করার সুযোগ হয়েছে।

সংযোজন বিভাগের এই গান ও কবিতাগুলি কবির স্বনির্বাচিত না হলেও সুনির্বাচিত হয়েছে। সূক্ষ্ম ব্যাপারে রুচি ও মতের পার্থক্য অনিবার্য। তাহলেও এক্ষেত্রে অধিকাংশ কবিতা সম্বন্ধে অধিকাংশ সমজদার পাঠকের রুচির সম্মতি পাওয়া যাবে বলে মনে করি। ফলে এই বিভাগের কবিতাগুলি পাঠকসমাজে যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পেল সেটা অনুচিত হয়নি, একথা অনায়াসেই বলা যায়।

যা হোক, রবীন্দ্রনাথের নিজের নির্বাচিত তিনশ পঞ্চান্নটি কবিতা এবং সংযোজনবিভাগের বত্রিশটি গান ও বিরাশিটি কবিতা, মোট প্রায় পৌনে পাঁচশ রচনা নিয়ে এই যে সঞ্চয়নগ্রন্থ এটি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রতিনিধিস্থানীয় একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলেই পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করবে সন্দেহ নেই, এবং এ গ্রন্থকে সে সমাদর দান করা কিছুমাত্র অন্যায় হবে না।

এরকম সংকলনগ্রন্থ প্রকাশের ভালো মন্দ দুই দিকই আছে। সঞ্চয়িতা ও চয়নিকা, এই দুখানি বই সহজপ্রাপ্য হওয়াতে পাঠকসমাজে রবীন্দ্রনাথের মূল গ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা অনেকখানি কমে গিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত বাহান্নখানি কাব্যের সবগুলির সঙ্গে দূরে থাকুক প্রধান প্রধান দশবারোখানি কাব্যের সঙ্গেও পরিচয় রাখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, যাঁরা উক্ত সবগুলি কাব্যের সঙ্গে পরিচয় রাখেন তাঁরাও অনেক সময় একখণ্ড অনায়াসবহনযোগ্য পুস্তকের মধ্যেই সবগুলির কিছু কিছু স্বাদ পাবার আবশ্যকতা বোধ করেন। সুতরাং রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত রূপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য এবং এই স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই সমর্থন পেয়েছে।

সঞ্চয়িতার বর্তমান সংস্করণেই এই প্রথম সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের সংহতরূপটি সুপরিস্ফুট হল। গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় এই সংস্করণ প্রস্তুত করার ভার অর্পিত হয়েছিল শ্রীকানাই সামন্তের উপর। কানাইবাবু যে তাঁর কর্তব্য অতি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করেছেন একথা সকলেই স্বীকার করবেন। গ্রন্থানুক্রম, রচনার কালানুক্রম ইত্যাদি বজায় রেখে কবিতাগুলিকে শুধু মনোরমভাবে সজ্জিত করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। অনেক কবিতার রচনা ও প্রকাশের স্থানকাল জানা ছিল না কিংবা অসম্পূর্ণরূপে জানা ছিল। এই পুস্তকে সেসব সংবাদ

যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থপরিচয় বিভাগে যে-সমস্ত মূল্যবান্ তথ্য ও টীকা সংকলিত হয়েছে কানাইবাবু তারই জন্য সব চেয়ে বেশী প্রশংসাভাজন হয়েছেন। ওই বিভাগে সঞ্চয়িতার পূর্বতন সব সংস্করণের কবিতাসমূহের গ্রহণ-বর্জন-খণ্ডনের সম্পূর্ণ বিবরণ তো আছেই। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি মূল গ্রন্থ এবং বহু কবিতা সম্বন্ধে নানা প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় এই বিভাগে স্থান পেয়েছে। তাতে এই গ্রন্থের অনেকখানি মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে এই বিভাগটির দ্বারা শুধু কাব্যপিপাসুরা নয় কাব্যজিজ্ঞাসুরাও নানাভাবে উপকৃত হবেন। কোনো কবিতার মূলগত তত্ত্ব, কোনো কবিতার রচনার উপলক্ষ্য কোনো কবিতার পাঠান্তর, কোনো কবিতার ছন্দোবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বহু বিষয়ের যোগে গ্রন্থপরিচয় বিভাগটি সমৃদ্ধ এবং সমজদার পাঠকের পক্ষে লোভনীয় হয়ে উঠেছে। বস্তুত সব দিক্ থেকে দেখলে এই গ্রন্থখানিকে একখানি সঞ্চয়নপুস্তকমাত্র বলেই নিরস্ত হওয়া যায় না, নানা বৈশিষ্ট্যের সংযোগে এখানি অনেক পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যমর্যাদারও অধিকারী হয়েছে।

কোনো কোনো ছোটোখাটো বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের একটু-আধটু অতৃপ্তি অবশ্যই থেকে যাবে। যেমন, আমার বিবেচনায় সূচীপত্রে সুস্পষ্টভাবে গ্রন্থবিভাগ দেখানো হয়েছে, অভ্যন্তরভাগেও তা দেখানো হলে ভালো হত। কিন্তু এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুচিভেদ বা মতভেদের কথা তুলে লাভ নেই। কেননা, 'ভালো হত আরো ভালো হলে' এ অনুভূতি কখনও নিরস্ত হবার নয়।

গ্রন্থমুখে রবীন্দ্রনাথের একখানি সুন্দর প্রতিকৃতি, তাঁর আঁকা দুখানি ছবি, এই গ্রন্থভুক্ত দুটি কবিতার কবির স্বহস্তলিপির প্রতিরূপ এবং সর্বোপরি মুদ্রণপরিপাট্য ও মনোরম গ্রন্থসজ্জা, এসকলের যোগাযোগে পুস্তকখানির লোভনীয়তা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দশ টাকা দাম হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণে রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকমাত্রই একখণ্ড পুস্তক সংগ্রহে প্রলুব্ধ হবেন সন্দেহ নেই। এরকম সর্ববিষয়ে অভীষ্ট উৎকর্ষযুক্ত একখানি চমৎকার বই প্রকাশ করে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ সাহিত্যামোদীদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

প্রবোধচন্দ্র সেন

চিঠিপত্র, চতুর্থ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, ২॥০

কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী, কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা দেবী ও পৌত্রী নন্দিনী দেবীকে লেখা চিঠিগুলি নিয়ে এই খণ্ডটি গ্রথিত। চিঠিগুলি সবই পারিবারিক, শুধু আত্মীয়কে লেখা ব'লেই নয়, ভাবের দিক থেকেও। এদের মেজাজ পুরো-পুরি ঘরোয়া, চলন আয়েসি, ভাষা আটপৌরে, নানা রকম খুঁটিনাটি খবর পাতায়-পাতায় ছড়ানো। পিতা ও পিতামহের স্নেহ, কল্যাণকামনা, উদ্বেগ ও আশঙ্কা—এ-সব অত্যন্ত মানুষী বৃত্তি এই চিঠিগুলির উৎস। সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুখ-শান্তি নিয়ে জগৎজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ জীবন ভ'রে কত যে ভেবেছেন, তার পরিচয় পেয়ে হঠাৎ একটু অবাক হ'তে হয়। কয়েক পাতা পর-পরই হোমিওপ্যাথি কিংবা বাইওকেমিক ওষুধের নাম পাওয়া যাচ্ছে, কেমন ক'রে সকলে ভালো থাকবে, কেমন ক'রে তাদের আরাম হবে, সুদূর বিদেশে কাজের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ব'সেও এ নিয়ে ভাবতে এবং লিখতে তিনি সময় পেয়েছেন। অথচ সব-কিছুর মধ্যে একটা নির্লিপ্ততাও প্রচ্ছন্ন আছে। মোটের উপর, চিঠিগুলি প'ড়ে এ-কথাই মনে হয় যে এত বড়ো কবিপ্রতিভার সঙ্গে সাংসারিক স্তরে এমন দায়িত্বচেতনা, এমন কর্তব্যনিষ্ঠা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। কবি ও শিল্পীরা প্রায়ই একটু পাগল হন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত বড়ো তাঁরা অত্যন্ত স্থিতধী, যেমন শেক্সপিয়র, গোয়টে, রবীন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যেই দেখা যায় বিরাট প্রতিভাকে সহজে বহন করবার বিরাট শক্তি, অন্যেরা প্রতিভার চাপে কোনো-না-কোনো দিকে একটু বেঁকে-চুরে যান।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা হয় যে সারা জীবনে তিনি ব্যক্তিগত চিঠি খুব কমই লিখেছেন, কিন্তু এ-চিঠিগুলি পুরোপুরি ব্যক্তিগত, এতে তাঁর জীবনের নিতান্ত মানবিক দিকই প্রকাশিত হয়েছে। জীবনচরিতের উপাদান হিসেবে এদের মূল্য অনস্বীকার্য, তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে এতে এমন চিঠি কমই আছে যা শুধু রবীন্দ্রনাথই লিখতে পারতেন। কবিত্ব এখানে ক্ষীণ, হাস্যরস—এমন কি নাৎনিদের কাছেও—ক্ষণিক। 'ছিন্নপত্র' বা 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র সঙ্গে তুলনীয় কিছুই নেই। মনে হয়, চিঠিতে তাঁর প্রতিভা সম্পূর্ণ জাগতে পেরেছে তখনই, যখন চিঠি নৈর্ব্যক্তিক, যার কাছে লেখা হচ্ছে সে ব্যক্তি নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁর শ্রেষ্ঠ চিঠিগুলি অনাত্মীয়দের কাছেই গেছে, কারণ অনাত্মীয়রা তাদের সুখদুঃখের সমস্যা নিয়ে তাঁর মনকে বিচলিত করতো না, তিনি পরিপূর্ণ শান্তিতে পরিপূর্ণ কবি হ'য়ে লিখতে পারতেন। এইসঙ্গে এ-কথাও বলতে হয় যে এর ব্যতিক্রম সহধর্মিণীকে লেখা তাঁর পত্রাবলী। যদিও ব্যক্তিগত, যদিও সাংসারিক, ওখানে এমন একটা সুর লেগেছে যা, সতি

বলতে, অন্য কোনোখানেই নেই। ও-চিঠি ক'খানাকেই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত বলা যায়, সেগুলি তিনি কবি হ'য়ে লেখেননি, মানুষ হ'য়ে লিখেছেন, এবং তার আলোচ্য মধ্যে নিজের মানুষিয়ানার বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছেন। এ-কথা চিঠিগুলি সম্বন্ধে বলা যায় না। এখানে যে-যে অংশ উদ্দীপিত, সেগুলি কবি রবীন্দ্রনাথের রচনা, আর ব্যক্তিগত অংশগুলিতে তিনি বিশেষ-একজন ব্যক্তি নন, সর্বজনীন পিতা ও পিতামহের সঙ্গে তিনি অভিন্ন। এরই মধ্যে নন্দিনী দেবীকে লেখা চিঠিগুলি একটু ভিন্ন জাতের, তাতে খবরের ভার নেই, কর্তব্যের চাপ নেই, শুধু খানিকটা লেখবার জন্যেই লেখা। তাই এই খণ্ডে এ-চিঠি ক'খানাই সবচেয়ে 'সাহিত্যিক', কবিত্বময়, এবং কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক। পৌত্রীকে লেখা শেষ চিঠি (তারিখ মে, ১৯৪১) তো প্রায় একটি গদ্যকবিতা :

> আঙুল যে চলে না কী করি বলো।
> তুমি আছ পাহাড়ে ঠাণ্ডায় আর আমাদের পোড়াকপাল কেবলি তেতে উঠচে—
> তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে মেঘ আসে জল আসে না।
> যদি আসে জল সে আসে চাষীদের চোখের কোণে। ভাবতে কষ্ট লিখতেও
> কষ্ট অতএব এই পর্যন্ত।

বুদ্ধদেব বসু

জুপিটার, বাণী রায়। মূল্য ১॥০

কোনও বিশিষ্ট ইংরেজ সমালোচক বলেছেন যে যদিও কাব্যের কোনও মাপকাঠি নেই, তবুও কাব্যজগতে সব পরশমণি আছে যাদের পাশে অন্য কবিতা দাঁড় করালেই তুলনায় সে সকলের গুণাগুণের যাথার্থ্য প্রকাশ পায়। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও ঐ সকল পরশমণির অভাব নেই; কিন্তু এ কথাও সত্য যে ঐ সকল সর্ববাদীসম্মত প্রথম শ্রেণীর কবিদের দলের বাইরে আরও বহু কবি আছেন, যাঁদেরকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। ভাবের গভীরতা, ভাষার সৌন্দর্য্য, উপমার মাধুরী, ছন্দের লালিত্য, চিন্তার নূতনত্ব, এই ধরনের গুণাবলীর মধ্যে যে কোনও একটি বা একাধিকের জন্য কবিতাকে আদরণীয় বলে মনে করা যেতে পারে।

বাণী রায়ের "জুপিটার" এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য। এই কবিতাগুলির মধ্যে অদ্ভুত প্রতিভার আলোক নেই, কিন্তু নূতনত্বের আকর্ষণ আছে, প্রাঞ্জল ভাষার আকর্ষণ আছে, অনাবিল তারুণ্যের আকর্ষণ আছে। এ সকল কথা শ্রদ্ধেয় অতুল গুপ্ত মহাশয় মোটামুটি তাঁর ভূমিকাতেই বলে দিয়েছেন।

লেখিকা intellectual সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁরা ইয়োরোপীয় পুরাণের কাহিনী বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁরা এর রসাস্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন না, যদিও পরিশেষে লেখিকা সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠাব্যপী শিশুপাঠ্য টীকা দিয়ে স্বীয় দায়িত্ব বহন করেছেন। শ্রীমতী বাণী রায়ের এই পুরাণতত্ত্ব ও তৎসঙ্গে জড়িত আমাদের পরিচিত ভগবান বেচারার তীক্ষ্ণ সমালোচনা ও বিদ্রোহ ইত্যাদিতে যেন একটু Swinburne এর প্রভাবও দৃষ্ট হয়। তিনি আধুনিক বাঙালী কবিদের কৃতজ্ঞতার পাত্রী হ'য়ে কাব্যের উপাদানের বিশাল এক ধনাগারের দরজা খুলে দিয়েছেন, যদিও আধুনিক বাংলা কাব্যে গ্রীক পুরাণের ব্যবহার এই প্রথম নয়, বিষ্ণু দে-র কবিতা স্মরণীয়।

বাণী রায় অভিনব হয়েছেন অথচ অদ্ভুত হননি সেজন্য তাঁকে অভিনন্দন করি। তাঁর হাত এখনও কাঁচা। "চরম বিচারের দিন" পড়ে সন্দেহ হয় বোধ হয় কলেজক্লাশে যত্ন ও চেষ্টা ক'রে লিখিত। কিন্তু স্থানে স্থানে সত্যিকারের কাব্য ফুটে উঠেছে, যথা গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা "দ্বিচারিণী"তে—

"অধরেতে যেন প্রবালের বন,
নয়নে ইন্দ্রনীল,
হাতীর দাঁতের ফলকেতে তনু,
অলক-কৃষ্ণ-চিল,
ললাটের বামে তিল।"

এবং

"তোমার কবিতা বাজে,
অন্তরে মম গোপন দুয়ারে,
তোমার কবিতা বাজে
অন্তরে মম গোলাপের বন

তাহার দেহলী কাছে
তাহারি কাঁটার মাঝে।

লীলা মজুমদার

দূরযানী, অমিয় চক্রবর্তী। সিগনেট প্রেস, ২৷০ ও ৩৷০

শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর রচনার পরিমাণ ক্ষীণ নয়, তাঁর মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা প্রবল। কয়েক মাস পর-পরই এক-একখানা নতুন কবিতার বই প্রকাশ ক'রে তিনি আমাদের চমক লাগিয়ে দিচ্ছেন। আরো একটু চমক লাগলো যখন 'দূরযানী'তে এমন একটি কবিতাও দেখলুম না, যা ইতিপূর্বে সাময়িকপত্রে লক্ষ্য করেছি। অথচ সাময়িক পত্রে তাঁর কবিতা নিয়মিতই প্রকাশিত হচ্ছে।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর অন্যান্য বই থেকে 'দূরযানী' একটু স্বতন্ত্র। ইতিপূর্বে এক-একটি বইতে তিনি বিশেষ এক-একটি স্বর লাগিয়েছেন, 'দূরযানী' মিশ্র-রাগিণীতে রচিত, নানা ভাবের কবিতা এ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হ'য়ে খানিকটা সংকলনগ্রন্থের রূপ এখানে দেখা গেলো। কোনো কবিতায় তত্ত্ব, কোনোটিতে নিছক বর্ণনা, কোনোটি বা হালকা হাওয়ায় ওড়ানো। অন্য এক কারণেও বইটি স্বতন্ত্র—এতে গদ্যকবিতা প্রায় নেই বললেই চলে, প্রায় সব কবিতাই পদ্যছন্দে বাঁধা। সে-ছন্দে বৈচিত্র্য আছে, দক্ষতাও আছে। কাব্যছন্দের সঙ্গে বাক্‌ছন্দ এমনভাবে মেলানো যে প্রথম দর্শনে মনে হয় বুঝি গদ্যকবিতাই। বাক্যবিন্যাস ও শব্দচয়ন যথাসম্ভব গদ্যেরই মতো, অথচ তারই সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে ছন্দের স্বর। এদিক থেকে কবিতাগুলি ছান্দসিকের ও অন্যান্য কবিদের প্রণিধানযোগ্য।

কখনো বা একই কবিতায় দু'রকমের ছন্দ এনেছেন, কখনো হঠাৎ এক-একটি পংক্তিকে ছন্দ-ছুট ক'রে দিয়েছেন। এগুলি কবির ইচ্ছাকৃত ব'লেই মনে করি। কিন্তু আমার মনে হয় যে এ-রকম না-হ'লেই যেন ভালো হ'তো। আমার এ-মতটা হয়তো সেকেলে; ছন্দের কবিতা এবং গদ্যকবিতা, এই দুটো স্পষ্ট বিভাগের আমি পক্ষপাতী। ইংরেজিতে আরো এক জাতের কবিতা আছে, তাতে বিভিন্ন ছন্দ ও গদ্যপংক্তি মেশানো থাকে, তাকে বলে ফ্রী ভর্স। আমার বিশ্বাস, অমিয়বাবু বাংলায় ফ্রী ভর্স আনবারই চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার স্বাভাবিক চাল-চলন ফ্রী ভর্স-এর পক্ষে অনুকূল কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বাংলাভাষা স্বভাবতই খুব বেশি সুরেলা, একবার ছন্দকে ডাকলে ছন্দই পেয়ে বসতে চায়, তাকে মুহূর্তের জন্যেও সরাতে গেলে কানের সম্মতি পাওয়া যায় না। বাংলা কবিতা পড়ার একটি সুর আছে, সে-সুর কেটে গেলে আমাদের উপভোগে ব্যাঘাত ঘটে। ইংরেজী কবিতা প্রায় গদ্যের মতো ক'রেই পড়া হয় ব'লে সেখানে ছন্দের মধ্যে ছন্দহারার স্থান সহজে হ'তে পারে ব'লে মনে হয়।

অবশ্য ভাষাও স্থাণু জিনিষ নয়, এবং কবিদের হাতেই তার ভাঙা-গড়া। আমার আজকের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ ক'রে একদিন হয়তো বাংলায় ফ্রী ভর্সের আসন অসংকুচিত হবে, অমিয়বাবু তার পরীক্ষায় সার্থক হবেন। সেদিন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আমার কণ্ঠ কুণ্ঠিত হবে না। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে রচনার আরো বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য আমাদের দাবি।

আমার এক-এক সময় মনে হয় যে অমিয়বাবুর কবিতা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছবার জন্য নয়, আসলে তিনি কবির কবি। আজ বছর পাঁচেক তিনি আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছেন, এরই মধ্যে তরুণতর

কবিদের 'পরে তাঁর প্রভাব পরিব্যাপ্ত। আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি এমন অভিনব যে তাঁকে অনুকরণ করবার একটা অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা তরুণ কবিদের মধ্যে হওয়া স্বাভাবিক। কবিরা তাঁর লেখা খুব পড়েন ও পড়বেন, বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলী তাঁর কাছে যেতে ধাক্কা খাবেই। অথচ তিনি যে ইচ্ছা করে বাধা রচনা করেন তা নয়, তাঁর মনের ভাষাই অত্যন্ত বেশি তাঁর নিজের, তাঁর ব্যক্তিক চিন্তাগুলি সর্বসাধরণের ভাষায় অনুবাদ না-ক'রেই তিনি উপস্থিত করেন। তাঁর চিন্তা গভীর, তাঁর দৃষ্টি সূক্ষ্ম, রং সম্বন্ধে তাঁর সংবেদনশীলতা বিস্ময়কর। যাঁরা তাঁর ভাষা শিখবেন, তাঁর চোখের সঙ্গে চোখ মেলাবেন, তাঁরা সে-খাটুনির মজুরি পুরোপুরিই পাবেন। এবং এ-রকম লোকের সংখ্যা যদি আস্তে-আস্তে বাড়তে থাকে, তাতে আমাদের সব দিক থেকেই লাভ।

পক্ষান্তরে অমিয়বাবু যদি সর্বসাধারণের দিকে একটু এগিয়ে আসেন, তাতেও আমাদের সাহিত্য নিঃসন্দেহে লাভবান হবে। 'দূরযানী'তে কয়েকটি কবিতায় ঐতিহ্যকে আশ্রয় ক'রেই কবি তাঁর স্বকীয়তা প্রকাশ করেছেন, যেমন 'বিয়াত্রিচে', 'খাণ্ডালার দেব-মন্দিরে', 'পৃথিবী'। 'মানুষের ঈশ্বর' বাংলা হালকা কবিতার ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল সম্পদ। এ-সব কবিতা প'ড়ে মনে হয় যে সাধারণ পাঠকের মনের রাস্তাটি তাঁর একেবারে অজানা নয়। কালক্রমে এই রাস্তা হয়তো প্রশস্ত হবে, অবারিত দানে ও আনন্দময় গ্রহণে হবে তাঁর কবিত্বশক্তির পূর্ণ সার্থকতা। সেই সার্থকতার দায়িত্ব কবি ও পাঠক উভয়েরই। পাঠক নতুনত্ব সম্বন্ধে নির্ভয় হবেন, এবং কবি আপন স্বকীয়তার সঙ্গে দেশের কাব্য-ঐতিহ্যকে মেলাবেন। এ দুয়ের সংযোগে রচিত হবে আধুনিক কাব্যের প্রতিষ্ঠার পটভূমি।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে 'দূরযানী'র বহিরঙ্গে বর্তমান দুর্দিনের চিহ্ন কোনোখানেই লাগেনি। এটা খুবই আশার কথা যে এই সার্বিক অভাবের মধ্যেই বাংলা বইয়ের দেহসৌষ্ঠবের আদর্শ ক্রমেই উঁচুতে উঠছে।

বুদ্ধদেব বসু

ভ্রমণ, হরপ্রসাদ মিত্র। কবিতাভবন। চার আনা—"এক পয়সায় একটি" গ্রন্থমালা।

হালকা কবিতা লেখবার রেওয়াজ আধুনিক বাংলায় আগে তেমন ছিল না। কবির আসক্তি দেখা যেত একটা কোনো মূল বক্তব্যের প্রতি। বুদ্ধদেব বসু "এক পয়সায় একটি" গ্রন্থমালা প্রচলন ক'রে কয়েকজন কবির মন হালকা কবিতার দিকে টেনেছেন।

হরপ্রসাদ মিত্র এ-কথার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁর "পৌত্তলিক", আর যাই হোক, হালকা কবিতার বই নয়। কিন্তু "ভ্রমণের" কবিতা খুচ্‌রো, খণ্ড, বিক্ষিপ্ত মনোভাবের প্রকাশ। এবং জোরটা পড়েছে প্রকাশ-ভঙ্গির উপরই। বলবার কথাটা বড় নয়, বলবার চালটাই আসল।

এই হালকা চালে তিনি বিশেষ ভাবে সাহায্য পেয়েছেন অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতা থেকে। বইটির সর্বত্র অমিয়বাবুর প্রভাব। এ প্রভাব সুরুর দিকে, এ প্রভাব শেষের দিকে, এ প্রভাব ঘুরে ফিরে বারবার এসেছে গানের ধুয়োর মত। আকস্মিক মিল দিয়ে হরপ্রসাদও মনকে একেবারে চম্‌কে দিতে চান—এখানে, ওখানে, যেখানে, সেখানে, খাপছাড়া, অপ্রত্যাশিত মিল! ভাঙা পংক্তি,—আপাতত এলোমেলো মনে হ'তে পারে,—ছড়াছড়ি যাচ্ছে যেন। এমন বিষয়ের পর এমন বিষয়ের উত্থাপন যে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় পাঠকের মনকে একটু অপ্রস্তুত ক'রে মজা দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

এ পৃথিবী আমার নয়: দিগন্ত সেন: নূতন কবিতা ভবন: দাম এক টাকা।

দিগন্ত সেন তাঁর কবিতাগুলোয় গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কবিতা লেখার হাত আছে, সোজা কথা স্বচ্ছন্দ সুরে তিনি বলতে জানেন। কবি নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে না পারলেও তাঁর মতে কবিতা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গম্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীতের প্রকাশ,

আমার অন্তহীন জিজ্ঞাসার অবোধ ক্রন্দন
চিরদিনের মতো শান্ত হ'য়ে যাবে;

আমি শান্ত হ'য়ে শুনবো
ওপারের আশ্চর্য রূপকথা;—

কবিতাগুলি সুখপাঠ্য, কিন্তু গদ্য-কবিতা লিখতে হ'লে আংগিকে যে পরিমাণ দখল থাকা দরকার, এ কবির তা নেই তাই শব্দ-চয়ন স্থানে-স্থানে দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। বইয়ের আগে দীর্ঘ ভূমিকাটা না দিলেই ভালো হতো।

ঝিলম্ ও অন্যান্য কবিতা: জগন্নাথ বিশ্বাস: একক সাহিত্য সম্প্রদায়: দাম বারো আনা।

জগন্নাথ বিশ্বাসের প্রায় সব কবিতাগুলোই সাময়িক সমস্যার ওপর লেখা। কবি এই আশু বিলীয়মান সভ্যতার মধ্যে উজ্জীবনের আগামী আলোক-রেখা লক্ষ্য করতে পেরেছেন,

> "আজ তাই ক্ষণস্থায়ী অপেক্ষাকে উজ্জীবিত করো কালো রাতে
> দৈন্যাহত মেরুদণ্ড সোজা হবে আঁকাবাঁকা ইস্পাতের পাতে।"

তবে, 'হাতিয়ার', 'লাল সূর্য', 'লাল মশাল' প্রভৃতি বাঁধাধরা বুলি ছাড়তে পারলে ভবিষ্যতে জগন্নাথ বিশ্বাস স্বাধীন পথের সন্ধান পাবেন।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বারোই বৈশাখ—অলকা মুখোপাধ্যায়। দাম চার আনা।

অলকা মুখোপাধ্যায় রচিত 'বারোই বৈশাখ' বারোটি কবিতার সমষ্টি এবং সব কটিই প্রেমের কবিতা। বইটিতে আগাগোড়াই এমন একটি বিষণ্নবিধুর ব্যর্থতার ছবি আছে যে পড়বার পরেও খানিকক্ষণ মনটা ব্যথিত হ'য়ে থাকে। আমি পাঠক হিসেবে এ-কথাই বলবো যে নিজের মনটাকে, গান দিয়েই বলুন, ছবি দিয়েই বলুন, কাব্য দিয়েই বলুন, অন্যের মনেও যদি সংক্রামিত করা যায় সৃষ্টি তো সেখানেই সার্থক। লেখক যা বলছেন সেটা যেন আমার কথা—তাঁর সুখ দুঃখে যেন আমারি সুখ দুঃখ। মনের অনুভূতির তন্ত্রীতে যদি ঘা দিতে পারি—তা হ'লেই সেটা গ্রহণযোগ্য হ'য়ে ওঠে। একটি কথা বলবার জন্য অনেক কথার প্রয়োজন। শুধু যদি এই কথাটি বলি যে 'ভালো লাগলো' তা হ'লে প্রশ্ন বর্ষণে বিধ্বস্ত হ'তে হবে। কেন লাগলো এই প্রশ্নের অবিশ্যি জবাব নেই কিন্তু তবুও কিছুটা কৈফিয়ৎ দিতেই হয়। তাই এতগুলো কথা বলতে হোলো। মোট কথা, বইটির কবিতাগুলোর মধ্যে সামান্য কিছু দোষ ত্রুটি থাকলেও তা মনকে আকর্ষণ করে—আর সেটাই তো আসল কথা।

প্রতিভা বসু

সম্পাদকীয়

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে শখ ক'রে এসে তারপর সেই শখের বৈরাট্যে অভিভূত হ'য়ে পড়েন, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন তাঁদের একজন। যাকে জাত-লিখিয়ে বলে তিনি তা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র এবং কর্ম-জীবনে সরকারি কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। কিন্তু কর্মের অন্তরালে তাঁর মনে সাহিত্যপ্রেমের যে-উচ্ছ্বাস ছিলো, তারই প্রেরণায় রচনাকার্যে হাত না-দিয়ে তিনি পারেননি। সুরেশ্বর শর্মা, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় ও অন্যান্য নামে অজস্র গদ্য-পদ্য তিনি সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই জোয়ার এসেছিলো পরিণত প্রৌঢ়ত্বে, শেষ জীবনে জোয়ার বন্যা হ'য়ে উঠেছিলো। সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনা থেকে তাঁর রচনার পরিমাণ অনুমান করা সম্ভবই নয়; গীতিকাব্য গদ্যকাব্য সনেট অনুবাদ—এমনি নানা জাতের রচনা তাঁর লেখনী থেকে নিরন্তর অজস্রতায় নির্গত হয়েছে। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবার পরেই বোধ হয় সেই অজস্রতা বিস্ময়কর চরমে গিয়ে ঠেকেছিলো। তাঁর সমগ্র রচনা থেকে বাছাই ক'রে একটি সু-সম্পাদিত সংকলনগ্রন্থ অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিত হ'লে ভালো হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে মৈত্র মহাশয়ের স্নেহ-লাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। কলেজে শিক্ষকরূপেই প্রথম তাঁকে দেখেছিলাম, তারপর তাঁর অগাধ সাহিত্যপ্রীতি আমাকে কাছে টেনেছিলো। তিনি ছিলেন আড্ডা-জমানে মানুষ, বয়সের বা মর্যাদার পার্থক্য উপেক্ষা করতে পারতেন, তাঁর কৌতুক-বিকীর্ণ আলাপ-আলোচনায় সকলেরই নিমন্ত্রণ ছিলো। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যায় স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় স্বাক্ষরিত তাঁর একটি কবিতা বেরিয়ে-ছিলো, তারপর তাঁর আরো অনেক রচনা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। কিছুকাল পূর্বে কলকাতা ছেড়ে তিনি লক্ষ্ণৌতে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেন, তাঁর দেহাবসান সেইখানেই ঘটেছে। তাঁর সহধর্মিণী, কন্যা ও তাঁর অনুজ স্বনামধন্য ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে আমাদের সমবেদনা জানাই।

অজিত চক্রবর্ত্তী

এমন কোনো-কোনো মানুষের দেখা পাওয়া যায় যাঁরা বিখ্যাত হন না, কিন্তু বিখ্যাত হবার যোগ্যতা যাঁদের থাকে। কবি অমিয় চক্রবর্ত্তীর অনুজ অজিত চক্রবর্ত্তীকে আমরা যাঁরা চিনতুম, আমরা তাঁকে গুণীর মর্যাদাই দিয়েছি, যদিও বৃহৎ জগতের জন্য তাঁর গুণের এক কণা পরিচয়ও তিনি রেখে যান নি। তিনি কখনো এক লাইন লেখেন নি, কিংবা লিখে থাকলেও কেউ জানে না।

কিন্তু সাহিত্যিক হবার অনেক উপাদানই তাঁর মধ্যে ছিলো। সাহিত্যকে এমন ক'রে ভালোবাসতে অনেক পেশাদার সাহিত্যিকও পারেন না। তাঁর এই সাহিত্যপ্রেম ছিলো বিশুদ্ধ, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যশোলিপ্সা ছিলো না, ইতিহাস-দর্শনের শাসন ছিলো না, কোনো দলীয় রাজনীতির প্রভাব ছিলো না। আজকের দিনে, যখন বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রেম আপাতত এ-দেশে রাহুগ্রস্ত, কোনো ইজ্‌ম্‌-এর রবার-ষ্ট্যাম্প না-মেরে কোনো লেখাকে ভালো বা মন্দ বলা যখন বিস্মৃতপ্রায়, তখন তাঁর মতো একজন পাঠক, যিনি সজ্ঞান ও মেধাবী, অথচ আনন্দে আত্মহারা হবার ক্ষমতা যাঁর শুকিয়ে যায়নি, এ-রকম একজন পাঠক আমাদের সামাজিক সম্পদ। সেই রকম একটি সম্পদ থেকে তাঁর আকস্মিক অকালমৃত্যু আমাদের বঞ্চিত করলো।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

এই গ্রন্থমালায় বিশ্বভারতী আরো পাঁচখানা বইয়ের সংযোজনা করেছেন: রায়তের কথা—প্রমথ চৌধুরী, জমির মালিক—অতুলচন্দ্র গুপ্ত; বাংলার চাষী—শান্তিপ্রিয় বসু; বাংলার রায়ত ও জমিদার—শচীন সেন; আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা—অনাথনাথ বসু। 'রায়তের কথা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ও চৌধুরী মহাশয়ের টীকা (দুটি 'সবুজপত্রে'র একই সংখ্যায় প্রকাশিত) বইখানায় সন্নিবেশিত হ'য়ে তার মূল্য বাড়িয়েছে। কৃষি ও কৃষক-সমস্যা নিয়ে এই গ্রন্থমালায় যে-বইগুলি প্রকাশিত হ'লো সেগুলি একাধারে সুখপাঠ্য ও সারবান, এবং স্বদেশের স্বরূপ-উপলব্ধির সহায়ক।

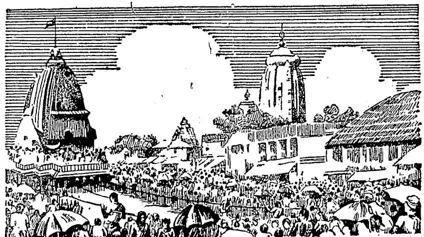

রথযাত্রা

রথযাত্রা উৎসবের উৎস মহাভারতের একটি উপাখ্যানে পাওয়া যায়। অন্ততঃ, আমাদের দেশে প্রচলিত বিশ্বাস তাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহুদিন পরে ভাই বোন বলরাম ও সুভদ্রার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করেন। সেই দিনই নন্দ, যশোদা, শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপিনীরাও সেখানে যান, ফলে, সেদিন তারা রথে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান। প্রবাদ, এই দর্শনের দরুন তাঁদের মুক্তি ঘটে। কৃষ্ণকে রথে দর্শন করলে তাই অনন্ত শান্তি। রথ যাত্রা হ'ল কৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র যাত্রা উপলক্ষে বাৎসরিক উৎসব! কিন্তু রথের উপর কৃষ্ণের মূর্ত্তি ত' দেখা যায় না; চোখে পড়ে জগন্নাথের মূর্ত্তি। কৃষ্ণমূর্ত্তি জগন্নাথে পরিণত হ'বার সূক্ষ্ম দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে কারণ কৃষ্ণ আসলে উপনিষদের ব্রহ্মই; এই ব্রহ্ম-যাবতীয় জাগতিক কর্ম্ম সম্পাদন করেন—অথচ জাগতিক রূপ তাঁর নেই। তাই ভারতীয় মন জগন্নাথরূপের প্রতীক খুঁজেছে। জগন্নাথের প্রধান মন্দির পুরীতে। কিন্তু এই উৎসব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যের অদ্ভুত উৎসাহ ছিল। তাই আজ সারা বাংলায় এ উৎসব ছড়িয়ে পড়েছে। এই আনন্দ দিনে নিশ্চয়ই এক পেয়ালা চা আপনার চাই। তা'হলে আধুনিক রুচির চা ভ্যালি ভিউকে ভুলবেন না।

KEEP YOUR PARTY GAY

ভ্যালি-ভিউ আধুনিক রুচির চা

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

'কবিতা'র এই আষাঢ় সংখ্যার সঙ্গে আপনাদের বাৎসরিক চাঁদা শেষ হ'লো। আগামী আশ্বিনে কবিতার দশম বর্ষ আরম্ভ হবে। আগামী বছরের চাঁদা (তিন টাকা) দয়া ক'রে **১৫ই ভাদ্রের মধ্যে** পাঠিয়ে দেবেন। যাঁদের চাঁদা কিংবা নিষেধাজ্ঞা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পাওয়া যাবে না তাঁদের সকলকেই ভি. পি. তে আশ্বিন সংখ্যা পাঠানো হবে। **ভি. পি. ফেরৎ দিয়ে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না, এই অনুরোধ।** চাঁদা পাঠাবার সময় **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করবেন।

বুদ্ধদেব বসু
সম্পাদক, 'কবিতা'
কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা